বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ সম্মেলন
ও
মালয়েশিয়া ভ্রমণ

পণ্ডিত শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের

ভিক্ষুকুল গৌরবরবী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, এশিয় বৌদ্ধ শান্তি সুবর্ণ পদকে ভূষিত, মায়ানমার সরকার কর্তৃক অগগমহাসদ্ধর্ম্মজ্যোতিকাধজ রাষ্ট্রিয় উপাধিতে ভূষিত, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বিশ্ব শান্তি প্যাগোডার স্থপতি, বিশ্ব নাগরিক দশম সংঘরাজ পন্ডিত শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথেরর পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে-

- রূপম কিশোর বড়ুয়া

বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ সম্মেলন ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের।

World Fellowship of Buddhists Conference
And
Tour in Malayasia

by

Ven. Jyotipal Mahathera.

প্রকাশনায় ঃ
রূপম কিশোর বড়ুয়া

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ
সাধনপ্রিয় ভিক্ষু
বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
মাল্টিসিস্টেম কম্পিউটার
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে ঃ
অনি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০১৮-৩১০৬১৫

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের কথা

আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন দেখেছি পাহাড়তলী মহানন্দ সংঘরাজ বিহারে চীর ব্রাহ্মচারী এক পুরুষকে। যাঁর চলনে-বলনে, কাজে-কর্মে, পঠন-পাঠনে, মৈত্রী করুণায়ভরা সম্প্রিতীতে যিনি আমাকে বেশী আকৃষ্ট করেছেন। যিনি সারাটা জীবন সমাজের সেবায়, দেশের সেবায়, 'দেশের সেবা' এজন্য বলছি যে, ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী জাতীর দুর্যোগময় মুহুর্তে এই বীর সন্ন্যাসী আন্তর্জাতিক মুক্তিযোদ্ধের সংগঠক হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বপক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। আমি শুনেছি বঙ্গবন্ধু ওনাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে ধরলে উনি বলেছিলেন "আমি কিছুই করতে পারিনি, আমি কিছুই করতে পারিনি, বিদেশে গিয়ে শুধু দেশের জন্য কেঁদেছি। এভাবে মানব কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গিত করেছেন। তিনি সেই মহামান্য মহারাজ জ্যোতিঃপাল মহাথের। তাঁর সেবায় কোন সীমানা ছিলনা। জগৎকে তিনি সংসার ভেবেছেন। যার প্রমাণ আজও ওনার গড়া প্রতিষ্ঠান বরইগাঁও বিশাল আশ্রমে আজো জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে। যেখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ছাত্র সবাই একসাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, একই গুরুর সত্য আদর্শে জীবন গড়ে নিচ্ছে। এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে আমি হত বিহ্বল হয়ে পড়েছি। ভন্তের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। চেষ্টা করে যাচ্ছি এই পরম পুরুষের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কিছুদিন আগে ওনার শেষ জীবনের শিষ্য-সেবক শ্রীমৎ সাধনপ্রিয় ভিক্ষু ভন্তের লেখা বই "বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ আমার হাতে দিয়ে বললেন, বড় ভন্তের ইচ্ছা পুরনার্থে আপনার হাতে দিলাম। আমি না করতে পারিনি। ভন্তের ব্যাপারে আমি বড় দুর্বল। তাঁর দেবতা কণ্ঠের দেশনা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় দেশনা আমি যেন আজও শুনতে পাই। এই মহা পুরুষের দিব্য চেহারা ক্ষনে ক্ষনে আমার অন্তরে ভেসে উঠে। মৃত্যুর নয় মাস পরও শশীরের বা মুখ মন্ডলের কোন পরিবর্তন নেই। দিব্য চেহারা, সেই চেহারায় এখনো জ্যোতিঃপালের জ্যোতি বর্তমান। আমি স্বয়ং নিজচক্ষে দেখে এসেছি ভন্তে এখনো ধ্যান করে যাচ্ছেন এবং আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছেন।

পবিত্র ধর্মপদে উল্লেখ আছে সব্বাদানং ধম্মদানং জিনাতি। ধর্মদান সকল দানকে জয় করে। ভন্তের এই বইটি শুধু ভ্রমণ বৃত্তান্তে নয়, এখানে তথাগতের বিরাট দর্শনও লুকিয়ে আছে। যাক এই পুস্তক প্রকাশের ফলে যদি জাতি, সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে বলে মনে করি।

-রূপম কিশোর বড়ুয়া

প্রথম সংস্করণে লেখকের কথা

'বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘ' একটি বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ সংগঠন। ইহা ১৯৫০ সনের মে মাসে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো মহানগরীতে গঠিত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক মহান সংগঠনের ৫৪ টি আঞ্চলিক শাখা রয়েছে, এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। থেরবাদ ও মহাযান এই উভয় মতাবলম্বী বৌদ্ধের মধ্যে সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রধান কার্যালয় ছিল প্রথমতঃ কলম্বোতে, পরে রেঙ্গুনে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তথাগত বুদ্ধের মহান আদর্শ অহিংসা ধর্মের প্রচার, বিশ্বের মানব সমাজে ঐক্য, অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি সুখের প্রতিষ্ঠা এবং নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন। প্রতি দুই বৎসর অন্তর এই মহান সংস্থার সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পর্যায়ক্রমে ১৯৬৯ সনের এপ্রিল মাসে এই বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের নবম সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল-মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর ও দ্বীপ-নগরী পিনাঙ্গে। সেই সম্মেলনে যোগদান কারার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৩ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত সঙ্ঘের প্রত্যেকটি অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সম্মেলন সমাপ্ত হলে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থান, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যাণ্ডের কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

মাত্র উনিশ দিন সময়ের মধ্যে তিনটি দেশ ঘুরে এলাম বটে, কিন্তু তাতে কতটুকুইবা দেখলাম, কিই বা শিখলাম? তবু আমার আগ্রহ-আমি একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখি। সাগর দেখে কুয়োর ব্যাঙ্গের লাফালাফির মত আমার এই উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা বলেও গণ্য হতে পারে। বস্তুতঃ একটি দেশের বাস্তব সত্য, প্রকৃত তথ্য ও নির্ভুল তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে তার প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আমার সেই ক্ষমতা কোথায়? তথাপি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা দেখেছি, যা শুনেছি ও যা উপলব্ধি করেছি, তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি। তাতে পাঠকের তৃপ্তি নাও মিটতে পারে। ইহা আমার অক্ষমতা।

বাংলাদেশ ও ভারতের বৌদ্ধ সমজে একটি অতীব জনপ্রিয় নাম-শ্রী হেমেন্দু বিকাশ বড়ুয়া। তাঁর মহান দানশীলতায় তিনি দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। বিভিন্ন ধর্ম-কর্মে, সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রকাশনে, রাস্তা-ঘাট ব্রীজ প্রভৃতি জনহিতকার প্রতিষ্ঠানে তাঁর অবদান অতীব প্রশংসনীয়।

তিনি আমার এই ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করেছেন। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘ তথা এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া ও যুগ্ম সম্পাদক মিঃ বিমলেন্দু বড়ুয়া এই কাহিনীর পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিয়েছেন। কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর উপ-পরিচালক মিঃ দেবব্রত দত্তগুপ্ত পাণ্ডুলিপিখানি দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন।

বহু বিলম্বে হলেও আজ এই পুস্তক প্রকাশিত দেখে সত্যিই আমার বড় আনন্দ ও গৌরব বোধ হচ্ছে। অবশেষে বক্তব্য হল-এই পুস্তকের প্রকাশনায় যাঁরা সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি আমার অশেষ ধন্যবাদ। যদি পুস্তকটি সমাজ ও দেশের সামান্য সমাদরও লাভ করে, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে, আমি ধন্য।

সব্বে সত্তা ভবন্ত সুখিত'ত্তা

বাংলাদেশ মাঘী পূর্ণিমা
২৫২০ বুদ্ধাব্দ, ১৯৭৭ ইং।

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের
বরইগাঁও পালি পরিবেণ
লাকসাম, কুমিল্লা
বাংলাদেশ।

এক

ঢাকা গিয়ে শুনলাম -এ বৎসর (১৯৬৯) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর বিশ্ব বৌদ্ধ সৌ-ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের দ্বি-বাৎসরিক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তাতে সমগ্র বিশ্বের ৫৪টি দেশ নিমন্ত্রিত। পাকিস্তান থেকে পাঁচজন প্রতিনিধির এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের নির্দেশ এসেছে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে। তন্মধ্যে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের পক্ষে মাননীয় শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া, বাবু বিজয়শ্রী বড়ুয়া, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের সহ-অধ্যক্ষ বাবু প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া এবং তাঁদের সাথে আমার নামও রয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণের বাসনা প্রবল থাকলেও পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থা অনুকুল ও সুপ্রসন্ন না হলে সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই, আমার নানা সমস্যার কথা ভেবে চিন্তে প্রথমতঃ আমার যাবার প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে আমি ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করি। বিদেশ গমন হবেনা -এ ধারণায় আমি নিত্য নৈমিত্তিক কাজে গা ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম।

৬ই এপ্রিল, রবিবার ১০ টায় চট্টগ্রাম থেকে তাগিদ এল। শুধু তাগিদ নয়, তাগিদের স্বয়ং বড় কর্তাই ছুটে এসে বরইগাঁও পালি পরিবেণে হাজির। আমার প্রতি তাঁর অন্তরে অফুরন্ত স্নেহ। আমার সঙ্গে যথারীতি প্রীত্যালাপ সেরে বাবু বিজয়শ্রী বড়ুয়া বলতে লাগলেন, "আপনাকে বিকেল চারটার গ্রীণ এ্যারো ধরে ঢাকা যেতে হবে। আপনার জন্য মালয়েশিয়া যাওয়ার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে, টিকেট ক্রয় করা হয়ে গেছে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের ভার সবই সাধারণ সম্পাদকের উপর নির্ভর। আপনি চারটার গাড়ীতে চাপবার জন্য প্রস্তুত হউন"। আমি তাঁর কথায় হতবাক হয়ে গেলাম। এদিকে বিদেশ গমনের ব্যাপার অত্যন্ত লোভনীয়। অন্যদিকে আমার নানা সমস্যা তো নিজেকে চারদিকে বেষ্টন করেই আছে। ভাবলাম-আমার সমস্যা তো সহজাত। সারা জিন্দেগী ভর লেগেই রয়েছে। বিদেশে না গেলে যে, সমস্যা থেকে আমি একেবারে মুক্ত হয়ে যাব, তাও তো নয়। সমস্যায় যার জীবন ঘেরা, তার অবাক সমস্যা কি? আমি সকল সমস্যার সম্মুখে চোখ বুঝে বিজয়শ্রী বাবুর প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। তিনি আশ্বস্ত হলেন বটে, কিন্তু নিশ্চিত হলেন না। হাতে মাত্র দু'ঘণ্টা সময়। আমার অন্তর গুর-গুর কম্পনে অস্থির। এর মধ্যে টুক্ টাক্ কাজ কিছুটা সেরে নিলাম। এদিকে মধ্যাহ্ন আহারের সময় অতীত হয়ে গেল। পরিবেণের ছেলেরা আহারের জন্য তাঁকে বারবার অনুরোধ জ্ঞাপন সত্ত্বেও চা ছাড়া তিনি অন্য কিছু খেলেন না। তিনি বললেন, "যে উদ্দেশ্য নিয়ে বরইগাঁও এসেছি তাতে যখন আমি সফল আজ আর আমার আহারের প্রয়োজন নেই। আমি খেয়ে এসেছি"। এভাবে তিনি আভাস্বরী দেবতার ন্যায় অন্তরের প্রীতি ভক্ষণেই সারাদিন কাটিয়ে দিলেন।

অতঃপর তিনি আমাকে সাথে করেই ষ্টেশনে নিয়ে চললেন। তিনি যেন স্বীকৃতি লাভের পরেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। ষ্টেশনে পৌঁছে নিজ হাতে টিকেট করে আমাকে যখন গাড়ীতে চাপিয়ে দিলেন এবং ত্বরিত বেগে যখন গাড়ী লাকসাম ছেড়ে ঢাকার দিকে ছুটল, তারপরই যেন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর চোখে মুখে তৃপ্তি ও সাফল্যের আনন্দোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ফুটে উঠল।

ঢাকা পৌঁছে জানতে পারলাম মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় একান্ত আসন্ন। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডি থেকে অনুমতি পত্র পৌঁছায়নি বলে পাসপোর্ট পেতে বিলম্ব হচ্ছে। কোন দিন যে অনুমতিপত্র এসে পৌঁছে, কিংবা আদৌ পৌঁছবে কিনা এ সম্পর্কে সকলের মনেই একটা গভীর সন্দেহের রেখাপাত হয়ে আছে। কারণ দেশে রাজনৈতিক রূপ নূতন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সম্প্রতি। ক্ষমতাসনে নবাভিষিক্ত রাজ-পুরুষেরা বিদেশ গমন সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা সাধারণের কল্পনার বাহিরে। যা হোক অবশেষে অতি বিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়া গেল। ফলে পাসপোর্ট তৈরী হতে, স্টেট ব্যাঙ্ক হতে বিদেশী মূদ্রার অনুমতি পেতে, উড়োজাহাজের টিকেট ক্রয় ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজগুলো সেরে নিতে দু-তিন দিন বিলম্ব হয়ে গেল। তাতে ১০ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার আর রওয়ানা হওয়া গেল না। দু'দিন পিছনে পড়ে গেলাম। এদিকে আবার পি, আই,এ,উড়োজাহাজের রোজ রীতিমত গমনাগমনে ব্যাঙ্ককের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। পরবর্তী তারিখ হচ্ছে ১২ই এপ্রিল শনিবার। দিবা একটার সময় উড়োজাহাজ তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে ছাড়বে।

অবশেষে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের পক্ষে মাননীয় শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া আর আমি এ তিনজন মালয়েশিয়া গমনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমার আরেক বড় সমস্যা হলো আমার হাতে নিজস্ব তহবিল বলতে কিছু নেই, যেখান থেকে আমি বিদেশ গমনের প্রাক্কালে কিছু টাকা নিয়ে যেতে পারি। একেবারে রিক্ত হস্তেই বা কি করে যাই? মানুষের আপদ-বিপদ কত কিছু থাকে। অন্ততঃ হাত খরচ স্বরূপ কিছু টাকা তো নেওয়া নিতান্ত দরকার। এ নিয়ে ভারী বিভ্রাটের উদ্ভব হয়। অবশেষে আমার দুইজন বন্ধু ভাবাপন্ন দায়ক এই আসন্ন সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তাঁদের সাময়িক সাহায্যে আমি বড় উপকৃত হই। তাঁদের একজন হলেন কুমিল্লার পরম সৌগত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ বড়ুয়া ও অপর জন হলেন ঢাকা আয়ুব হাসপাতালের সরকারী ডাক্তার বাবু প্রভাস চন্দ্র বড়ুয়া। বিদেশ গমনের সাথে তাঁদের এই সাহায্য আমার জীবনের স্মরণীয় হয়ে রইল।

১২ই এপ্রিল শনিবার ভোর পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করলাম এবং চা-পান পূর্বক নিত্য ব্যবহার্য একেক চীবরে মাননীয় মহাথের ও আমি ঢাকা বিহার থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মনে করেছিলাম, পাসপোর্ট, বিদেশী মূদ্রা ও টিকেট

সম্পর্কিত বাকী কাজগুলো সেরে বিহারে ফিরে আসব এবং স্নানাহার করে রওয়ানা হব তেজগাঁও বিমান বন্দরে। কিন্তু হায়! অফিসে অফিসে দৌড়াদৌড়ি কাজের ভীষণ হুড়াহুড়ি, সময় মত কাজ সারাই দায়। এদিকে বিমান বন্দরে যাওয়ার সময় একান্ত নিকটবর্তী। না হলো বিহারে গমন, না হলো স্নানাহার, না পেলাম বিদেশ গমনের প্রাক্কালে কোন বন্ধু- বান্ধবের সাক্ষাৎ। স্টেট ব্যাঙ্ক ও বি-ও-এ-সি কোম্পানীর অফিস থেকেই বিমান বন্দরের দিকে ছুটলাম। চৈত্রের নিদাঘ কাল, গরমে অস্থির আমাদের তো যা হোক, আমরা দু'জন বুড়ো লোক, রক্তের অতটা বাড়াবাড়ি নেই। কিন্তু পরিশ্রমের দাপটে আমাদের বড়ুয়া বাবুর মুখ-মণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠছে। গণ্ডদেশ থেকে রক্ত যেন পড়ে পড়ে। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বিমান বন্দরে গিয়ে দেখি বন্ধুবর উঃ জানিতা মহাথের ও স্নেহ-ভাজন ভিক্ষু শ্রী শুদ্ধানন্দ আমাদের বিদেশ ভ্রমণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য-হস্তে প্রকাণ্ড বিমান প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য বস্তুতে তাঁদের এতটুকু ভুলও লক্ষ্যে আসল না। তাঁরা বিদেশ ভ্রমণে একেকজন কত অভিজ্ঞ-কাজে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

পাসপোর্ট প্রদর্শনাদি টুকটাক কাজগুলো সেরে নেওয়ার পর ত্বরিত গতিতে গিয়ে বিমানে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বিমান-রাজ আলোড়িত হয়ে উঠল। তার ভৈরব নিনাদে কর্ণ কুহর বিদারিত করে তুলল। মহামানব তথাগতের পবিত্র নাম স্মরণ করে ও সকল প্রাণী সুখী হোক বলে অমি আসন গ্রহণ করলাম। আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন হচ্ছে লাইনের মাঝখানে। আসন থেকে বাহিরের দৃশ্য দেখতে পাব না বলে বাবু দেবপ্রিয় বড়ুয়ার অনুরোধে মাননীয় মহাথের আমাকে পাশের আসনে বসার সুযোগ দিলেন। আমি জানালার পাশে গিয়ে বসলাম। বড়ুয়া বাবু আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ভন্তে আমরা যে মালয়েশিয়া যাব এখন কিছুটা আশা করতে পারেন। এখন কতেক নিশ্চয়তার পাদপীঠে পা দিতে সমর্থ হয়েছি। দেখলেন তো কত ঝামেলা। এত ঝামেলা কাটিয়ে বিদেশ গমন অনেক সময় হয়ে উঠে না।" অমনি আমি একবার তার মুখ পানে নিরীক্ষণ করে সকৃতজ্ঞ চিত্তে ভাবলাম। তাঁর শুভেচ্ছায়ই তো আমার আজ বিদেশ গমন হচ্ছে। নচেৎ এ দীনহীনের যোগ্যতা কোথায়? অমনি কবি মাইকেলের একটি কৰিতা-চরণ মনে পড়ে গেল,-'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যায় যথা দূরতীর্থ দর্শনে'। তেমনি আমিও আজ চলছি বিদেশ ভ্রমণে।

পাশের আসনে বসে গবাক্ষ পথে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। জেট বিমান তার প্রসারিত দু'পাখায় ভর দিয়ে ক্রমশঃ আকাশে উঠতে লাগল। চোখে পড়ল মাতৃভূমির শ্যামল সুন্দর শস্যভূমি, চির বিচিত্র শহর-শহরতলী, কী অপূর্ব শোভায় শোভিত। আকাশ মণ্ডলে বিচ্ছিন্নভাবে শুভ্র নবনীতের ন্যায় সাদা সাদা মেঘমালার কী অপরূপ সমাবেশ! ক্ষণে ক্ষণে চোখ-জুড়ানো রূপে এদের পরিবর্তন। অনন্ত নীলিমার কোথাও তুষার শুভ্র আকার, কোথাও লোহিত রঙে রঙ্গীন আর কোথাও বা হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত।

ভূ-পৃষ্ঠ ত্যাগ করে গগন মণ্ডলে উড়বার সুযোগ ইতিঃপূর্বে এসে থাকলেও এরূপভাবে মাতৃভূমি আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু আজ আকাশ পরিচ্ছন্ন। কোথাও বিন্দু মাত্র কাল মেঘের কালিকা নেই। ধূম্রছায়ার মেঘলা নেই। আজ আকাশ নিতান্তই নির্মল, স্বচ্ছ। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই চির বৈশিষ্ট্য কত কত কাব্য-কবিত্বের সৃষ্টি করেছে, একে ভিত্তি করে কত সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, কত গায়কের মনকে ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেল করেছে তার কি সীমা সংখ্যা আছে? তাই পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলার খ্যাতি সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, ইতিহাসে, গানে, নাটকে চির সমুজ্জ্বল। মাতৃভূমির বক্ষ ত্যাগ করে আজ আকাশ বিচরণে মাতৃভূমিকে যেরূপ দেখছি এমনটি দেখার সৌভাগ্য তো জীবনে আর পাইনি। মাতৃভূমির আকর্ষণও আজ যেন অন্তরে জেগে উঠল অত্যধিক ভাবে। আমাদের স্বভাব, নিকট অপেক্ষা দূরের বস্তুকে যতখানি মর্যাদা দিয়ে থাকি, দূরের বস্তুকে যতখানি গৌরবের মনে করি, আদর-আপ্যায়ণ করি, নিকটবর্তীকে ততখানি করি না। তাই আজ দূর-দূরান্ত বিদেশ গমন করছি বলে মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ বুঝি অন্তরে এত নিগূঢ়! ভাব আজ এত গভীর কেন হলো? আমাদ্বারা সারা জীবন মাতৃভুমির কল্যাণ সাধিতই বা কি হলো? আবার মাতৃভূমির সাথে মাতৃস্মৃতিও ক্ষণেকের তরে ভেসে উঠল অন্তরের গভীর গহনে। বুদ্ধির উন্মেষ না হতেই মাকে হারায়েছি। মায়ের সেবায়ও বেশী দিন লাগিনি। এরূপে মায়ের প্রতি মধূর বাল্যস্মৃতি ও মাতৃভূমির প্রতি করুণ স্মৃতি জেগে অন্তরকে দ্রবিত ও নয়নকে সজল করে তুলল।

বিমান উড়ছে দৈত্য গতিতে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার প্রান্তভূমি অভিমুখে। বিমান যতবেগে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে মাতৃভূমি যেন তত বেগে পেছনে হাঁটছে। মানুষের বাড়ী-ঘর, দালান-কোঠা দেখাচ্ছে শিশুদের খেলনার মত। খান খান ভাবে ভূমিতে কতগুলো ইট বসিয়ে রেখে শিশুরা যেন কোথাও চলে গেছে। বড় বড় নদ-নদী তাদের স্বরূপ দেখাচ্ছে-শ্যামল প্রান্তরের ফাঁকে ফাঁকে যেন দুগ্ধপায়ী শ্বেতবর্ণ লম্বিত সর্প এঁকে বেঁকে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে দেখি বাংলার সেই মনোরম শোভা সৌন্দর্য দৃষ্টি-গোচরে আর নেই। সব অনন্তে বিলীণ হয়ে গেছে। উপরে নীলিমাময় অসীম অনন্ত অন্তরীক্ষ, নিম্নে সবুজ সুন্দর অনন্ত পারাবার, এ দুই অন্তরের অপরিসীম বক্ষ বিদীর্ণ করে আমাদের হাওয়াই হাওয়ার সাথে উড়ে চলছে তার গন্তব্যে। মনে প্রশ্ন জাগল-মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নাকি জগতের পদার্থ-নিচয়কে নিম্নে আকর্ষণ করে রাখে। এ বিমানটিকে কি ধরে রাখতে পারল না? বিমানটি কিরূপে সেই শক্তিকে জয় করল? মানবের প্রয়োগ কৌশল কি মধ্যাকর্ষণের সহিত বোঝাপড়া করে তাকে আপন করে নিয়েছে?

মনে পড়ল শাস্ত্রের কথা, -তথাগত বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র- মোদ্গল্যায়ন প্রভৃতি ছিলেন ঋদ্ধিশক্তি সম্পন্ন পুরুষ। তাঁরা ঋদ্ধি বলে আকাশে আকাশে বিচরণ

করতেন। একজন বহুলোকে এবং বহুলোক একজনে পরিণত হতে পারতেন। বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের শব্দ শুনতে পেতেন। তাঁরা যে কোন স্থানে যেমনি হঠাৎ তিরোহিত হতে সক্ষম ছিলেন, তেমনি সক্ষম ছিলেন হঠাৎ আবির্ভূত হতে। ঋদ্ধির চরম শক্তির অধিকারী মোদ্গল্যায়ন ত্রিলোকের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। কখন কখন তিনি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এমন কি চন্দ্রলোকে সূর্যলোকে গমন করতেন। কৌতুহল বশে চন্দ্র-সূর্য হাতে স্পর্শ করতেন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

আজকাল জগতের প্রতি দৃক্‌পাত করলে দেখা যায় জড় বিজ্ঞানের সাধনা এতদূর প্রগতির পথে চলছে যে, মানুষ প্রায় তার সবই করতে সক্ষম। যান্ত্রিক শক্তি মানুষের আজ্ঞাবহ রূপে অঘটন-ঘটন পটীয়সী। জড় বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ আকাশ-মার্গে উড়ছে। জলের উপর দিয়ে, নিম্ন দিয়ে চলছে, ভু-গর্ভে বাড়ী-ঘর তৈরী করে বসবাস করছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের বাক্যালাপ চলছে। গান-বাজনা শুনছে। অথচ তাতে সময় ব্যয়িত হয় না, কিংবা ভৌগোলিক ব্যবধান বাধা জন্মায় না। বর্তমান টেলিভিশন যন্ত্রটি অলৌকিক শক্তির সব রকম তাৎপর্যপুর্ণ আবিস্কার। ভবিষ্যতে জড় বিজ্ঞানের আরো কত যে অদ্ভুত উন্নতি ঘটবে- তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্ত কই? জগতের হাহাকার তো থামছে না। পরস্পরের আশঙ্খা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শান্তিকামী লোকের অন্তর বাদ বিসংবাদ হিংসা বিরোধের দৌরাত্মে গঞ্জনাময় হয়ে উঠছে। এক শক্তির সন্দেহ, যদি কমিউনিজম সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তাবে আমাদের উপায় কি? অপর শক্তির নিত্যশঙ্খা যদি ধন-প্রলোভনে জগতের রাষ্ট্রসমূহ সব একচেটিয়া হয়ে পড়ে তবে আমাদের গতি কোথায়? মানুষ পদে পদে প্রমাদ গুণছে।

বস্তুতঃ যান্ত্রিক প্রগতি মানুষের জীবনে মান ও জাগতিক বাহ্য সকল সম্পদ সমৃদ্ধি বাড়ায় মাত্র! কিন্ত জ্ঞান, অনন্ত সম্পদ কিংবা সার্বিক শক্তি আনয়ন করতে অক্ষম। জড় বিজ্ঞানের ইহকাল সমুজ্বল, পরকাল অন্ধ তমসাচ্ছন্ন আর মনোবিজ্ঞানীর ইহ-পর উভয় কালই সমুজ্জ্বল! মনোবিজ্ঞানের সাধনায় মানুষের ইহজীবনও দীপ্তিমান হয়। পরকালেও তাঁর সাম্য নিবৃত্তি।

হঠাৎ ঘোষিত হলো আমাদের উড়োজাহাজ এখন রেঙ্গুন অতিক্রম করছে। আমরা এখন ২৯ হাজার ফুট উপর দিয়ে চলছি। তচ্ছ্রবনে আমার অন্তর আতঙ্কে আঁৎকে উঠল। মনে মনে বললাম এসব কেন বলে? না বললেও তো পারত। নীচ থেকে আকাশে বিচরণকারী শকুন দেখে কত দিন কত কথা ভেবেছি ; কিন্তু আজ নিজেই আকাশচারী খেচর হয়ে গেছি। দেখতে দেখতে বিমান ক্রমশঃ নীচ হয়ে ব্যাঙ্কক মহানগরীর উপর গিয়ে পৌঁছল। দৃষ্টি পড়ল ব্যাঙ্ককের উপর খুবই গাম্ভীর্যময়, বৈচিত্র্যময় তার রূপ কী মনোরম দৃশ্য! কী গৌরবময় মহিমা তার! আমি তার লীলা-

নিকেতন অপূর্ব্ব সৌন্দর্যের অতলে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম। নিজকে হারিয়ে ফেললাম তার প্রাকৃতিক অপরিসীম রহস্যের মৌন মহিমায় মনে অফুরন্ত আনন্দ। বিদেশের ভূমিতে আজ আমার অবতরণ। ৫৭ বৎসরের জীবনে স্বর্গীয় সুষমাময় অনুভূতি জাগল এই-ই প্রথম। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুর পক্ষে বৌদ্ধ প্রধান দেশে আসছি বলে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

বিমান ক্রমশঃ মন্থর গতিতে ব্যাঙ্কক বিমান বন্দরে যখন অবতরণ করল তখন বেলা পৌণে চারটা। বিশাল সে মাঠ যেন দিগন্ত বিস্তৃত। সমগ্র এশিয়া খণ্ডে ইহাই বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। এশিয়ার সুবৃহৎ বিমান বন্দর হিসেবে ব্যাঙ্কক তার যথেষ্ট গৌরব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করছে। প্রতি পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযোগ রক্ষায় বিমান উঠানামা করছে। এ জন্য যাত্রীদের ঘাঁটি প্রাঙ্গনে ক্ষণেকের তরেও চলাচল নিষিদ্ধ। আমাদের বিমানখানি চত্বরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে একখানি প্রকাণ্ড বাস এসে ইহার গা ঘেঁসে থামল। আমরা বিমান থেকে নেমে বাসে চাপালাম। দু'মিনিট পরেই আমাদেরকে বিশ্রামাগারের দরজায় পৌছিয়ে দেওয়া হয়।

মাননীয় মহাথের আগে, আমি মাঝে, মিঃ বড়ুয়া আমার পিছনে। বিশ্রামাগারে প্রবেশ করতেই বৌদ্ধ রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যার সামনে পড়ছি, অমনি দণ্ডবৎ কায়দার প্রণতি পূর্ব্বক ঈষৎ দন্তবিকাশে মুখমণ্ডলে হাসি ফুটিয়ে তোলে। লক্ষ্য করলাম-অসংখ্য পুরুষ-মেয়ে সমান তালে স্ব-স্ব কর্তব্যে নিযুক্ত। প্রত্যেকের বিনয় নম্র সরল চেহারা, সর্ব্বত্র মধুর ব্যবহার। আমাদের প্রতি তাদের সশ্রদ্ধ অমায়িকতায় আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। আমি পম্পাসের গদি আঁটানো আরাম কেদারায় বসে বসে এদিক-ওদিক শুধু তাকাচ্ছি। যে দিকে তাকাই, সে দিক থেকে চোখ দু'টি আর ফিরতে চায় না। সৌন্দর্যের অমরাপুরী ব্যাঙ্কক বিমান বন্দর।

ইতোমধ্যে মিঃ বড়ুয়া পাসপোর্ট টিকেট সংক্রান্ত সব কাজ সেরে নিলেন এবং আমাদের সামনে এসে বললেন আমাদের আজ কুয়ালালামপুর যাওয়া হবে না। কারণ-এর সম্পর্কিত কোন বিমান এখান থেকে আজ কুয়ালালামপুর যাবে না। বিমান আগামীকল্য সন্ধ্যা ৬ টায়। আমাদের একদিন এখানে অপেক্ষা করতে হবে। আমরা পি-আই-এর দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে থাকব।

কিছুক্ষণ পরেই পি-আই এর একটা সুশোভন বাস এসে আমাদেরকে নিয়ে চলল এশিয়া হোটেলে। এশিয়া হোটেল বিমান বন্দর থেকে ১৫ মাইল ব্যবধানে ব্যাঙ্কক নগরী বক্ষে অবস্থিত। বাস ছুটল ৪০/৫০ মাইল বেগে। বিস্তীর্ণ রাজপথ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও সামান্য মালিন্যের লেশ নেই। রাজপথের দু'ধারে বিলম্বিত পরিখা। পরিখার দু'ইঞ্চি পরিমিত অথবা পরিত্যক্ত নালা-ডোবা নেই। তন্মধ্যে অসংখ্য পদ্ম প্রদুম পুণ্ডরিকের অপুর্ব সমাবেশ চোখের দৃষ্টিকে ঝলসে দেয়। তীরবর্ত্তী স্থানে

নানা রং এর মনোরম ফুল প্রস্ফুটিত। সুশোভিত পত্র-বাহার। দু'পাশে ঝাউ বৃক্ষসমূহ সমান সুন্দর ভাবে সজ্জিত। মলয় হিল্লোলে আন্দোলিত পত্র-পল্লব যেন বিদেশী অভ্যাগত পথিকগণকে সাদর সম্ভাষণ মনের আনন্দে জ্ঞাপন করছে।

বাস যতই শহরের অভ্যন্তরে ঢুকছে ততই দেখি দু'পাশে সারি সারি মনোমুগ্ধকর জাঁকাল দালান কোঠা। মাঝে মাঝে বৌদ্ধ বিহারের অপরূপ দৃশ্য! পিপড়ার মত অসংখ্য যানবাহনের চলাচল কর্মচঞ্চল মহানগরী। এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের বাস ১৫ মাইল পথ ধাবিত হয়ে এশিয়া হোটেলের বহি ফটকে এসে থামল। ২৯৬ নং ফ্য আই রোডে প্রতিষ্ঠিত সাততলা বিশিষ্ট সুবৃহৎ এই ইমারৎ। ইহা ব্যাঙ্ককের অভিজাত হোটেল সমুহের মধ্যে অন্যতম। ইহা দেখতে যেমনি অপূর্ব্ব তেমনি সমৃদ্ধ, গঠন প্রণালী ইহার নিতান্ত অভিনব।

হোটেলে ঢুকেই সসম্ভ্রমে মাননীয় মহাথের ও আমি আসন রক্ষা করে রইলাম। মিঃ বড়ুয়া বিদেশী আগন্তুকের সব করণীয় সেরে নিলেন। অবশেষে খাতায় স্বাক্ষর করার পর হোটেলের পরিচালক আমাদের নিয়ে চলল নির্দিষ্ট কামরায়। লিফটে করে হিড়হিড় করে গিয়ে উঠলাম পাঁচ তলার ২২ নম্বরের কামরায়। আমাদের পৌছার আগেই আমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজগুলো কামরায় পৌছে গেছে।

ঢুকে দেখি স্বপ্নপুরীর কারখানা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিরাট প্রকোষ্ঠ। তাতে রয়েছে মর্মর পাথরে বাঁধানো স্নানাগার, সংলগ্ন পায়খানা, ঠাণ্ডা ও গরম জলের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা, আলমারী, টেবিল, টেবিলের পাশে সোফাসেট, চিঠি লিখার খাম, কার্ড, খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ একখানি বাইবেল। স্প্রিংয়ের খাট, মোলায়েম বিছানা- কম্বল, টেলিফোন, ট্রানজিস্টার। যেখানে যা প্রয়োজন সবই ফিট্‌ফাট্ সাজানো রয়েছে। মাননীয় মহাথের আর আমি দু'জন এক কামরায়। মিঃ বড়ুয়া রইলেন পাঁচ-ছয় কামরার পর ১৬ নম্বরের কামরায় একক। প্রয়োজনবোধে আমি মাননীয় মহাথেরকে এবং প্রিয় মিঃ বড়ুয়াকে নানান বিষয় জিজ্ঞেস করে নেই। তাঁরা মাঝে মাঝে দয়া করে আমাকে নানান বিষয় বাতলে দেন। আমি যে বিদেশ একেবারে কাঁচা।

হোটেলে বসবাস আমার জীবনে এই প্রথম। আমার পক্ষে হোটেল তো নয়, যেন সাক্ষাৎ অমরাপুরী। আনন্দের তো আর অন্ত নেই। কিন্তু মাননীয় মহাথেরর মুখে একটি কথা শুনে আমার মনপ্রাণ শুকিয়ে যায়। অপরূপ রূপলাবণ্যময় প্রস্ফুটিত পুষ্প সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনিত্যে বিলীণ হয়ে ঝরে পড়ার ন্যায় আমার প্রাণ সঙ্কুচিত হয়ে যায়, ক্ষণেকের মধ্যে আনন্দের লহরী চিরতরে থেমে যায়।

বৌদ্ধ প্রধান দেশ। বৌদ্ধ ধর্ম ও বিনয়ের অনুসারী সমাজ। ভিক্ষুগণ সংসারী নহেন। সংসারের আচার পদ্ধতি ভিক্ষুদের নীতি-বিরুদ্ধ। ভিক্ষুদের পক্ষে ধর্ম বিনয়ে গৃহীসংসর্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকার নির্দেশ। হোটেলের পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

আদব-কায়দা নিছক সংসারমুখী। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক হোটেল। নিষ্ঠাপূর্ণ একটি সংসারের আবহাওয়ার চেয়ে নিতান্ত কদর্য্য। এমতাবস্থায় কোন একটি দেশের সমাজ কিংবা রাষ্ট্র-শাসন যদি ভিক্ষুদের হোটেলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন, তবে বলতে হবে সেই দেশে বুদ্ধের শাসন-ধর্ম বাস্তবিকই সুপ্রষ্ঠিত। যেহেতু ব্রহ্মচর্য জীবনের অনুকূল পরিবেশে অবস্থানই ভিক্ষুদের জীবন-নীতি, সুতরাং হোটেল ভিক্ষুদের অনধিগম্য। হোটেলে প্রবেশ বা বসবাস নিষিদ্ধকরণের অর্থ-ভিক্ষুদের প্রতি মৈত্রী করুণার সহিত ভিক্ষু জীবন যাপনের আনুকূল্য করা এবং ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। প্রথমতঃ ভয় ও সঙ্কোচে অভিভূত হলেও শেষ পর্যন্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমরা বিদেশী, পথযাত্রার বিভ্রাটে আজ হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। এই স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য আমরা ক্ষমার যোগ্য। নচেৎ হোটেলে অবস্থানের জন্য তদ্দেশীয় ভিক্ষুসংঘের তরফ থেকে যদি কোনরূপ দণ্ড আমাদের ভোগ করতে হতো তবে আমি তা আনন্দ ও গৌরবের সাথে শিরোধার্য করতাম।

পশ্চিমাকাশে সুর্যদেব অস্তমিত। অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে এলো। সারা ব্যাঙ্কক নগরী যেন আলোক সমুদ্রে সাঁতার কাটতে শুরু করেছে। সারি সারি কত বৈচিত্র্যময় আলোক-তরঙ্গ। তরঙ্গের দোলায় ঝলমল করছে। পাঁচ মহলের বহিরালিন্দে দাঁড়িয়ে নয়নভরে সুসজ্জিত মায়াপুরীর আলোকমালা উপভোগ করলাম।

সন্ধ্যার পরে মিঃ বড়ুয়া ব্যাংককে অবস্থানরত স্বদেশীয় শিক্ষাকামী ভিক্ষু বসুমিত্রকে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ মানসে ফোনযোগে ডেকে পাঠালেন। বসুমিত্র নাকি ভিক্ষুদের কর্তৃপক্ষ ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করে হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পান এবং রাত্রে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে যান। সারা দিনের পরিশ্রমে শরীর ভাল বোধ না হলেও অন্তরে অফুরন্ত আনন্দ। নূতন দেশে নবাগমন, দৈহিক ক্লান্তি থাকলেও অনুভূত হওয়ার কথা নয়। তথাপি অন্যদিন থেকে আজ অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল স্প্রিং-এর গতিতে "সব্বে সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা বলে শুয়ে পড়লাম।

দুই

১৩ই এপ্রিল রবিবার, আজ চৈত্রসংক্রান্তি। সমগ্র শ্যামদেশ আনন্দে মাতোয়ারা। আজ পুরাতন বছরকে বিদায়াভিনন্দন ও আগামীকল্য নূতন বছরকে বরণাভিনন্দন করার উৎসব।যত্র-তত্র জলকেলি। পথে মাঠে ঘাটে যানবাহনে যখন যাকে যেখানে পাওয়া যায় জল ছিটিয়ে গা ভিজিয়ে দেয় ও আনন্দ উপভোগ করে। তাতে তাদের কী আনন্দ! কী সমারোহ! এই ক্রীড়া-কৌতুকের হিল্লোলে হিল্লোলিত নিমজ্জিত সমগ্র জাতি। এটা তাদের জাতীয় উৎসব। এই উৎসব যে আমাদের পাক–ভারতে উদ্যাপিত

থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংকক মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ ইমারেল্ড প্যাগোডায় প্রতিষ্ঠিত "ইমারেল্ড বুদ্ধ বিগ্রহ"
Emerald Image of Lord Buddha, Established in the Famous city of Emerald Pagohda city of Bankoock, the Capital of Thailand.

না হয়, এমন নয়। বরং সত্যতঃ একথা বলা যায় যে, এই উৎসবের মূল উৎস পাক-ভারতে। ইহা সমগ্র বৌদ্ধ জগতের উৎসব। পুরাকালে প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ষ গণনার রেওয়াজ ছিল বৎসরের সর্বশেষ মাসটি কার্তিক আর প্রথম মাসটি অগ্রহায়ণ। তথাগত বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ জীবনের এই তিনটি বিশিষ্ট ঘটনা বৈশাখ মাসে সংঘটিত হওয়ায় বৈশাখকেই বৎসরের অগ্র শ্রেষ্ঠ মাসরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তদবধি বৌদ্ধ জগতে বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখ থেকে আরম্ভ করে সারা মাসটিই পবিত্র তিথিরূপে পালিত হয়ে আসছে। পাকিস্তানে বাঙ্গালি বৌদ্ধ অপেক্ষা বার্মিজ তথা চাকমা বৌদ্ধেরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা রক্ষার চেতনায় এই উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপন করে থাকেন। বাঙ্গালি বৌদ্ধ সমাজেও দেখতে পাই চৈত্র সংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে পবিত্র গন্ধোদকে কিংবা সদ্য দুহিত দুগ্ধে বুদ্ধ-প্রতিমা স্নান করান, পিতৃ-পিতামহের শ্মশানে জলতর্পন, ভিক্ষুদের পাদমূলে জল-সিঞ্চন, গুরুজনের গাত্রে জল ঢালা, বুদ্ধ পূজাদি আনুষ্ঠানিক কুশল কর্মের আয়োজন, পরস্পর পরস্পরকে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করা ইত্যাদি কাজে প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেরই সুষ্ঠু ধারা পরিস্ফুট। বৌদ্ধ অ-প্রধান দেশের বৌদ্ধ সমাজে উৎসবের আনুপাতিক ক্ষীণতা লক্ষিত হলেও ইহা প্রাচীনঐতিহ্যেরই ধারা।

থাইল্যাণ্ডে শিক্ষাকামী বাঙ্গালি ভিক্ষু বন্ধু বসুমিত্র সকাল ৯টায় এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে কথা হল মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে নিকটবর্তী কোন একটি দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। তিনি গাড়ী করে নিয়ে গেলেন ব্যাংককের অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ইমারেল্‌ড বুদ্ধ-দর্শনে। এই প্রতিষ্ঠান দর্শনের নির্দিষ্ট দিন হল রবিবার। অদ্য রবিবার তো বটেই, তাছাড়া চৈত্র-সংক্রান্তি এসে তার সঙ্গে সহযোগিতা করল। মহোৎসবে মুখরিত ইমারেল্‌ড বুদ্ধ আরাম-প্রাঙ্গণ। লোকে লোকারণ্য। দেশী-বিদেশী অগণিত ভক্তবৃন্দ। প্রত্যেকেরই হাতে ধূপ-ধুনা, পুষ্প-বাতি। নিবেদন করছে করুণাঘন তথাগতের উদ্দেশ্যে। ভক্তি ভরে স্মরণ করছে তথাগতের অনন্ত গুণাবলী। কামনা করছে জীবন-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দর্শনে আমার চোখে চমক লেগে গেল। শ্রদ্ধায় মন-প্রাণ আপ্লুত হয়ে ওঠে। অমনি ভূমিতে পঞ্চাঙ্গ প্রণতি করে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করলাম চতুর্দ্দশ শতকের বৌদ্ধ সাধক রামচন্দ্র কবি ভারতীর ভাষায় ঃ-

"দশবল কলিকাল দূর্বলো' হং
চির দুরিতার্নব তুঙ্গ ভঙ্গ মগ্নঃ
তব কথমনুযামি ধর্মনাবং
জিন মম দেহি কৃপা করাবলম্বং।

হে দশবল! এই মোহমলিন জগতে অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করে বাসনার মহানর্ণবে নিমগ্ন আমি শ্রদ্ধাদি গুণধর্মে বড় দুর্বল। সবকিছুর সাথে জীবন হারালেও

তোমাকে যেন না হারাই। তোমার অনন্ত গুণ-বিগ্রহ আমার অবলম্বন হোক। আমি জীবনে যেন অনির্বান শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। আমি কবে তোমার সে ধর্ম-তরীতে আরোহণ করব?

অতঃপর প্রতিষ্ঠানের প্রায় সমগ্র অংশই ঘুরে ফিরে দেখলাম। ইহার অদ্ভুত কারুকার্য ও গঠন প্রণালী দেখে আমি প্রথমতঃ হতভম্ব ও বিস্মিত হয়ে যাই। পরে যখন দু'হাজার বছর অতিতের দিকে ফিরে তাকালাম, অন্তরে তুলনামূলক চিন্তার উদ্রেক হওয়ায় তখন বুঝলাম প্রাচীন ভারতের গান্ধার, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, নালন্দা পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর ভগ্নাবশেষ বর্তমানে যা দেখতে পাওয়া যায়-সেগুলো জীবিতকালে যেরূপ ছিল তার তুলনায় ইহাতো কিছুই নয়। বরং বলা যেতে পারে প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলো ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে বেশী জাঁকজমকপূর্ন ও সমৃদ্ধ ছিল। ইহা প্রাচীনগুলোর ছায়াস্বরূপ। শুধু বহুকালের ব্যবধানে এবং আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে সামান্য তারতম্য লাভ করেছে মাত্র। একান্ত অভিনবত্বের বিশেষ কিছু নেই। ইমারেল্‌ড বুদ্ধ মন্দির ত্যাগ করার প্রাক্কালে আবার নিবেদন করলাম।

"মম তদিহ দিনং হি দুদ্দিনং স্যা
দসিতঘন স্থগিতং ন দুদ্দিনং মে।
যদমৃত সম বুদ্ধ রত্ন নাম
স্মৃতি রহিতং দিনমস্য মা তদন্ত"।।

যে দিন সমগ্র আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়, শিলা-বৃষ্টি, তুফান একসঙ্গে আরম্ভ হয়, যে দিন বায়ু-বিজ্ঞানী লোকেরা রাষ্ট্রে দশ নম্বর বিপদ সংকেত প্রদর্শন করে, মানুষ মনে করে সেইদিন বড় দুর্দিন। কিন্ত আমার পক্ষে সেদিন দুর্দিন নয়। আমার পক্ষে সে দিন দুর্দিন যে দিন আমি করুণার মঙ্গলাবতার অমৃত-সাগর বুদ্ধের নাম হৃদয়পটে না জাগাই। প্রার্থনা করি এহেন কাল-দিবস আমার জীবনে যেন একদিনের জন্যও না আসে।

ইমারেল্‌ড বুদ্ধ ও সংলগ্ন প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম দর্শন করে আমরা যথা সময় এশিয়া হোটেলে ফিরে এলাম এবং বন্ধু বসুমিত্রের সঙ্গে দু বছরের জমা কথাগুলো ভেঙ্গে প্রীতির সহিত ভোজনকৃত্য সমাপন করলাম। অতঃপর বসুমিত্রকে এই বলে বিদায় দিলাম যে এ সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে আর কোথাও যাওয়া যাবেনা। বিকাল ৫ টার সময় কুয়ালালামপুরের উদ্দেশ্যে বিমান বন্দরে যাত্রা করতে হবে। এ কথাও সিদ্ধান্ত হল যে বসুমিত্র আমাদের সঙ্গে কুয়ালালামপুর যাবেন।

আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম এবং হোটেলে বসে দেশের কয়েকজন বন্ধু ও ছাত্র-শিষ্যের কাছে কয়েকখানি পত্র লিখলাম।

পাঁচটা বাজতে আর বেশী বাকী নেই। আমরা জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলাম। দেখতে দেখতে পি-আই এর গাড়ী এসে হোটেলের আঙ্গিনায় হাজির। আমরা ঠিক পাঁচটায় এশিয়া হোটেল ত্যাগ করলাম।

বিমান বন্দরাভিমুখে গাড়ী আমাদেরকে বক্ষে নিয়ে ছুটল। পাশে বিলম্বিত রেলপথ। হঠাৎ একটি মনোরম রেলগাড়ী বিদ্যুৎ গতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। তুলনায় আমাদের দেশের গাড়ীর চেয়ে প্রার্থক্য কিছু চোখে পড়ল না। দু ধারে অসংখ্য প্রাসাদরাজি, তাদের কারুকার্য খচিত লাবণ্যময় রূপ নিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। এদের ফাঁকে ফাঁকে যতদুর চোখ যায় দেখতে পাই একেকটি বিরাটকায় বিহার মন্দির। অপূর্ব্ব শোভায় শোভা পাচ্ছে। বিহার মন্দিরগুলোর গঠন বৈশিষ্ট্য ও আপন মহিমায় প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সহিত পথিকের মন প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। আমার চোখে তো একেকটি স্বর্গীয় বিমানতুল্য প্রতিভাত হচ্ছে। মোহ জাগছে প্রত্যেকটি বিহার মন্দির সান্নিধ্যে গিয়ে প্রত্যক্ষ করে নয়নের তৃপ্তি সাধন করি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলাম। গাড়ী থেকে নেমে আমরা চলছি প্ল্যাটফরমের মাঝখান দিয়ে। যার সামনে পড়ি সে-ই অর্ধ নমিত দেহের স্বভাবসিদ্ধ নম্র ভঙ্গিমায় যুক্ত করে প্রণতি জানায়। আমিও অধরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিকশিত করে স্মিত হাস্যে তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। জানিনা বিদেশীর এ নির্বাক অকৃত্রিম হাস্যের মাধুর্য তাদের অন্তর স্পর্শ করল কিনা।

মাননীয় মহাথের ও আমি বিশ্রামাগারে গিয়ে আরাম কেদারার গদির কোমল দেহে বসে বসে অনুক্ষণ চলমান টেলিভিশন ও চারদিকের ঝলমলে দৃশ্য দেখছি। আরো দেখছি প্রাচ্য প্রতীচ্য বাসী প্রায় সকল দেশের লোককে এক নজরে। গুণ দর্শন পরের কথা নানা রংয়ের পোষাক পরিহিত দৈহিক সৌন্দর্য, অটুট স্বাস্থ্য সপ্রতিভ আকৃতি দর্শনে আমি শুধু মুগ্ধ হই নি, গৌরব বোধ করছি। ইত্যবসরে আমাদের সাধারণ সম্পাদক পাসপোর্ট, হেলথ সার্টিফিকেট ও টিকেটগুলো সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণকে দেখিয়ে নেন।

ইতোমধ্যে বন্ধু বসুমিত্র ভিক্ষু কুয়ালালামপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমান বন্দরে পৌঁছলেন। তিনি কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করেন নি। কিন্তু এক বিদেশ থেকে আরেক বিদেশে যাওয়া পরিচয় পত্রাদির ঝামেলাও কম নয়। সম্ভবতঃ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে কোনরূপ গোল বেঁধে গেছে। আফশোসের বিষয় আমাদের সঙ্গে আর তাঁর যাওয়া হল না।

বিমান বন্দরে কর্মে নিরত লোকদের মধ্যে অধিকাংশ মঙ্গোলিয়ান জাতীয় চেহারার পুরুষ মেয়ে সমান তালে কাজ করে যায়। আমাদের দেশের মেয়েদের লম্বা শাড়ী পরা, মাথার চুলগুলো লম্বা রাখা, মসৃন করা ইত্যাদি হচ্ছে নারী-সুলভ সৌন্দর্য

ও সভ্যতা। কিন্তু এখানকার মেয়েদের পরিহিত পোষাক পরিচ্ছেদগুলোর নমুনায় ও পরিধানের পদ্ধতিতে অনেকটা বিলাতের মেয়েদের অনুকরণ। তাদের পরিধানে গার্গি ও গায়ে অর্ধ আস্তিনের ব্লাউজ। মাথার চুলগুলো পুরুষের ন্যায় ছাটিয়ে ছোট করে ফেলা। ইহা বলা বড়ই শক্ত যে এই ফ্যাশনে ইউরোপ কি এশিয়াকে অনুকরণ করল, না এশিয়া ইউরোপকে করল? ইহা মানব সভ্যতার গবেষকরাই বিচার করতে সক্ষম। তবে এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে এশিয়া খণ্ডের লোকেরাই মানব সভ্যতায় অগ্রণী । তবে বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বহুকাল ধরে এশিয়া ইউরোপের উপর প্রভূত্ব করেছে। সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ের মতো এশিয়া থেকে মানুষের ঢেউ গিয়ে ইউরোপকে প্লাবিত করেছে। ইউরোপকে সভ্য করে তুলেছে। আর্য, সাইথীয়, হুন, আরব, মঙ্গোল, তুর্কি এশিয়ার এই সব বিভিন্ন জাতি ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল পঙ্গপালের মত। বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপ ছিল এশিয়ার একটি উপনিবেশের মত। আধুনিক ইউরোপের অনেক সুসভ্য জাতি এশিয়ার এইসব জাতির বংশ-সম্ভূত। আচার ব্যবহারে দেখলাম এদেশীয় মেয়েরা অতীব নম্রা, বিনীতা, মিতভাষিনী ও গম্ভীরা। বিনয় নম্রতাই তো মাতৃজাতির জীবনে পরম সৌন্দর্য, ইহাই তাদের প্রকৃত অলঙ্কার। বাহ্যালঙ্কার বিচারে কি লাভ? হ্রী যদি না থাকে তবে শ্রী কিসে হয়?

এ সব দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘোষণা এসে কর্ণকুহরে ধাক্কা খেল, "কুয়ালালামপুরগামী বিমান প্রস্তুত। বিমান ছাড়বার সময় হয়ে গেছে। যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন বিমানে আরোহণ করে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়েন"। আমরা গাত্রোত্থান পূর্বক পাঁচ মিনিটের বাসে বিমানে পৌছার ময়দানটুকু অতিক্রম করে বিমানে আরোহণ করলাম। আসন গ্রহণের কিছুক্ষণ পরেই বিমান জীমূথ যন্ত্রে আলোড়িত হয়ে উঠল এবং চলতে আরম্ভ করল।

তখন সূর্য পাটে বসেছে মাত্র। অস্তমিত হওয়ার সময় অতিশয় সন্নিকট। পশ্চিমাকাশে লোহিত বর্ণে ঢাকা। নীলাভ্র শোভিত অনন্ত আকাশ। শূন্য আকাশ মার্গে কোথাও শুভ্র মেঘমালার এলোমেলো দ্রুত বিচরণ, কোথাওবা নিথর মন্থর গতি। সমগ্র আকাশ পাতাল যেন চলন্ত বিমানের উন্মত্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। বিমান তার দু পাখায় ভর দিয়ে যত বেগে সামনে অগ্রসর হচ্ছে দুনিয়ার সব কিছু যেন তত বেগে পশ্চাদ্ধাবন করছে। অস্তগামী সূর্যের সোনালী রশ্মি ও মলয় হিল্লোলের সঙ্গে তরঙ্গায়িত বিমান শূন্যে আরোহণ করল। এদিকে দিবালোক নিষ্প্রভ হয়ে এলো। ক্রমশঃ সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন, তাতে আবৃত হয়ে গেল আকাশ আর আকাশতল। চোখের দৃষ্টিশক্তি সর্বদিকে ব্যাহত হয়ে এখন শুধু বিমানাভ্যন্তরে নিবদ্ধ।

থাই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট। পরিচালনায় নিরতা থাইল্যাণ্ড বাসিনী বিমান-বালারা আরোহিদের জন্য নানা খাদ্যের টিফিন নিয়ে আসল। এক দৃষ্টিতে আমি

তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সকলের টেবিলে খাদ্য রেখে গেল শুধু এড়িয়ে গেল আমাকে আর মাননীয় মহাথেরকে। এরা বৌদ্ধ প্রধান দেশের লোক। ভিক্ষুদের বিনয়-ধর্ম তাদের যথেষ্ট জানা আছে তারা আমাদের পাশেও এল না। এতে প্রতীয়মান হল যে ভিক্ষুদের প্রতি মাতৃজাতির আচরণ সম্পর্কে ও তারা অভিজ্ঞা। কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচালক এসে আমাদের দু'জনকে সাদা চা ও কপি পরিবেশন করে। এরা সকলেই ভিক্ষুদের আহার বিহার, আহারের কালাকাল, বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কারণ আমাদিগকে এমন কিছু দিতে চায় নিযা আমাদের পক্ষে রাত্রি বেলায় নিষিদ্ধ। আমি চা-কপি দু'ই পান করলাম। যেমন রাত্রি ৯ টায় করাচী যাওয়ার পথে আমার টেবিলে গোস্ত-পরোটা ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছিল।

বিমান তার দানব গতিতে আকাশেমার্গে শ্যাম উপসাগর উল্লঙ্ঘন ক'রে ২ ঘণ্টায় ৭৪৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর পৌঁছল। বিমান থেকে অবতরণ করে দেখি স্বপ্নরাজ্যের বিচিত্র বিধান এই কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয়। অনন্ত আকাশে অগণিত তারকা রাশি। আপন আপন স্বভাবৌজ্জ্বল্যে অসীম আকাশকে আলোকিত করে ফেলেছে। নিম্ন আকাশ তলে সবুজ, হলদে, নীল, লাল নানা রংয়ের রঙ্গিন বিজলী বক্তিকার বাল্‌ব শ্রেণীবদ্ধ আলোকে রাশি বিকিরণ করে অপরূপ রূপ লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে। লোকগুলো বিচিত্র সাজ-সজ্জা পরিহিত প্রসাধন-ম্রক্ষিত দেহে বিমান-মঞ্চে সমাগত। এসব বৈচিত্র্যময় দৃশ্য দেখে আমার চোখে চমক লেগে যায়।

আমরা অফিস প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হতেই পিছন থেকে বাংলা ভাষায় ডাক দিয়ে উঠলেন, পাকিস্তান এম্বেসীর লোক আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলকে অর্ভর্থনা করতে এসেছেন। পরিচয় জানতে পারলাম তিনি আমাদেরই এলাকার লোক। তাঁর বাড়ী নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী ধন্যপুর গ্রাম। নাম মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন।

পাকিস্তান এম্বেসীর অপর এক ভদ্রলোক আমাদেরকে বিশ্রামাগারে নিয়ে বসলেন এবং দেশের টুকটাক খবরাদি মূলক প্রীত্যালাপে মিনিটগুলো ব্যয় করছেন। এদিকে হোসেন সাহেব আমাদের পাসপোর্ট প্রভৃতি পরিচয় পত্রাদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণকে দেখিয়ে নিয়ে আসলেন। ইত্যবসরে চেয়ে দেখি প্রাঙ্গন গৃহগুলোর একেক অঙ্গ একেক রংয়ের। কোন অংশ রক্তের ন্যায় লাল, কোন অংশ বেগুনী, কোন অংশ জাফরানী রংয়ের, কোন অংশ দুধের চেয়েও সাদা, কোন অংশ ধূপ-ছায়া কোন অংশ যেন আলতা-মাখানো। কোন স্থানে আসমানী রং আর সমগ্র প্রাঙ্গণ-প্রদেশ আলকাতরার ন্যায় কালো। ঘর-দরজাগুলোর মাঝে একটা অপূর্ব মনোরম আভাষ লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ মানুষ বসতিযোগ্য ঘর-দরজা করে খড়ের, টিনের, না হয় ইট-

পাটকেল কিংবা পিচ বোর্ড দ্বারা। কিন্তু কুয়ালালামপুর বিমান বন্দরের ইমারতগুলো ঐ সব উপকরণ থেকে যেন স্বতন্ত্র ধরণের। একান্ত অভিনব বস্তু দ্বারা তৈরী। আমাদের বড়ুয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম-এ সব নাকি রাবার দ্বারা তৈরী। আমি শুনে তো অবাক, আস্তে নখ দিয়ে অনুভব করলাম-হ্যাঁ, রাবারইতো বটে।

কিছুক্ষণ পরে হোসেন সাহেব আমাদেরকে নিয়ে চললেন-পন্তাই ভেলীতে মালয়েশিয়া শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে যেখানে বিশ্বের বৌদ্ধ প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হয়েছেন এবং যেখানে ৫ দিন ব্যাপী বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

আমরা যখন পন্তাই ভেলী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে গিয়ে পৌছি, তখন রাত্রি ১০ টা। গাড়ী থেকে নেমে দ্বার-প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হতেই সিংহল দেশীয় জে, বি, ধর্ম্ম দাস নামে এক ভদ্রলোক আমাদেরকে অভ্যর্থনা করলেন এবং আমাদের নাম ধাম লিখে নিলেন, পরিচয় পত্রাদি দেখলেন, আহারাদির বিধি-নিষেধ জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন হোস্টেল প্রাসাদের পাঁচ তালায়।

মাননীয় মহাথের আর আমি রইলাম ৬ নং কক্ষে, বড়ুয়া বাবু থাকলেন ৯ নং কক্ষে।

স্বজাতি, স্বদেশী লোক মোশারেফ হোসেন সাহেব এতক্ষণ। আর পর কিংবা অপরিচিত বিদেশী রইলেন না, আপনত্ব-বোধে দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার জন ও বন্ধু ব'নে গেলেন।

বড়ুয়া বাবু তাঁকে টেনে একেবারে পাঁচ তলার উপরে তুললেন। দু'জনের বাক্ প্রবাহের বেগ বেশ দ্রুত হয়ে জমে উঠল। দীর্ঘ কয়েক বছর পর স্বদেশাগত উপযুক্ত বন্ধু পাওয়া গেল। স্বদেশাগত ও বিদেশ বিভূঁইয়ে প্রবাসী বন্ধুর নিকট নানা কাজে অনেক আশা পোষণ করেন। এদিকে বিদ্যাবুদ্ধি ও বয়সের প্রায় সৌসাদৃশ্য আছে। ক্ষণে ক্ষণে কেউ বক্তা কেউ শ্রোতা। সহসা থামল না তাঁদের অফুরন্ত বক্তৃতার স্ফুরণ। তাতে আবার রয়েছে আনন্দ ও প্রীতির লহড়ী। এভাবে মধ্য রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অবশেষে ৬ নং কামরার থেকে দু'জনই ৯ নং কামরায় চলে গেলেন। আর আমি বলতে পারি না যে বাকী রাত্র তাঁদের কিভাবে কাটল?

পর দিন ঘুম ভাঙ্গতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। আচমন কর্মাদি সেরে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল মালয়েশিয়া শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রাসাদগুলো। বিরাট প্রতিষ্ঠান, বিশাল তার আয়তন। অপরূপ রমণীয় শোভা ধারণ করে আছে এই প্রতিষ্ঠানটি। দুই ধারে ইহার অনুচ্চ শৈল শ্রেণী। শৈল শিখরে মাঝে মাঝে বাসগৃহ আর মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। একধারে সবুজ মসৃন ঘাসের আকর্ষণীয় বিছানার ন্যায় খেলার মাঠ। মাঠের চার ধারে নানা বর্ণের ছোট বড় পত্র-বাহার বৃক্ষ ও মনোরম পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত। মাধবী বিতানের ঝাড়। কী মনোমুগ্ধকর শোভা!

দেখলে চোখ ফেরান দায়। স্বতোত্থিত প্রাকৃতিক লতাপুঞ্জের সৌন্দর্যে পরিশোভিত পন্তাই উপত্যকা। তাতে আবার মনুষ্য বুদ্ধির নিপুণ রচনা। শৈল শ্রেণীর পাদদেশ থেকে শৈলশৃঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত দেহের কোথাও উঁচু করে বাঁধানো পাক্কা সিঁড়ি, কোথাওবা শৈল-দেহ নীচ করে কর্তিত। যে দিকে তাকানো যায় সে দিকেই সমান সুন্দর শৃঙ্খলা।

আমরা যে প্রাসাদে অবস্থান করছি তা হল সাত-তলা হোস্টেল। তিন শত লোক অনায়াসে থাকবার উপযোগী ইহা। প্রত্যেক তালায় দু'পংক্তিতে প্রকোষ্ঠ রাজি। দু'পাশেই মনোজ্ঞ বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালেই এক নজরে পন্তাই উপত্যকার মনোহারী সকল দৃশ্য চোখে ভে'সে উঠে। প্রতিষ্ঠানটির ওগলে-বোগলে সুবিন্যস্ত আসবাব পত্রের ক্লাশরুম। বিরাট-কায় গ্রন্থাগার, খেলাধূলার গৃহ। আরো কত কিছু যে দেখলাম-অত হিসেব কি আমি দিতে পারি?

তিন

১৪ই এপ্রিল সোমবার, সকাল ৭ টার সময় প্রাতরাশের টেবিলে গিয়ে দেখি, নানা প্রকার আহারের অপুর্ব সমাবেশ। পাউরুটির টোস্ট, মাখন, জেলি, সিদ্ধ ডিম এবং নানা প্রকার ফল-পাকরা, চা-কপি ইত্যাদি। আমি পেট ভরে খেয়ে নিলাম।

অতঃপর ৮ টা যখন বাজে বাজে বিশ্বের সকল প্রতিনিধি মিলনায়তন অভিমুখে রওয়ানা হলেন। আমি ও মাননীয় মহাথের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহ গমন করলাম। মিলনায়তনে গিয়ে দেখি, ইহা বড় চিত্তাকর্ষক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিরাট আয়তন। অদ্ভুত তার গঠন-প্রণালী। এক ধারে সুসজ্জিত উঁচু মর্মর পাতা সভা-মঞ্চ। মঞ্চের সম্মুখ থেকে সভাসদ দিকের আসন গ্যালারী ক্রমশঃ উঁচু হয়ে প্রকোষ্ঠের প্রান্ত সীমায় গিয়ে ঠেকেছে। শ্রেণীবদ্ধ কেদারাগুলোর গঠন প্রণালী অপূর্ব। দেখতে যেমন মনোহর বসতে ও তেমনি ভারী আরাম। তিন শতাধিক পরিষদের একত্র সন্নিবেশ অবাধে বিহিত হওয়ার যোগ্য এই মিলনায়তন। বক্তা মঞ্চোপর থেকে পরিষদের সকল লোককে এক নজরে সমভাবে দেখতে পাবেন।

আজ গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গৃহতলে উপবিষ্ট। তাতে পিন্ পিন্ করে কিরূপ অনির্বচনীয় আরাম যে অনুভব করছি, তাহা উপভোগী মানুষ ব্যতীত ভাষায় বোঝান দুঃসাধ্য। মুণ্ডিত মস্তকে স্বর্গীয় দূতেরা যেন সুষমা বর্ষণ করছেন।

অদ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের রিপোর্ট পাঠের শেষ সম্মেলন। আমরা বিলম্বে এসেছি। তাই আমাদের রিপোর্ট পাঠের অবশ্য প্রয়োজন। বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব,

সঙ্ঘের সভানেত্রী এইচ, এস, এইচ, রাজকুমারী পুন পিস্‌মাই দিসকূল আমাদের আগমন বার্তা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে অন্ত র-নির্ঝর হর্ষধ্বনিতে সভাগৃহ গুম্‌ গুম্‌ রবে মুখরিত হয়ে যায়। মাননীয় মহাথের ও আমি দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্ব ভ্রাতাদের প্রীতি সম্ভাষণ হৃদয়ঙ্গম করলাম। আমাদের রিপোর্ট তৈয়ারীর কাজে ব্যস্ত থাকায় মিঃ বড়ুয়া সভায় পৌছাতে সামান্য বিলম্ব হয়। ইত্যবসরে নেপাল, জাপান, সিকিম ও দক্ষিণ-কোরিয়ার রিপোর্ট পাঠ সমাপ্ত হয়ে গেল। ইতোমধ্যে আমাদের সাধারণ সম্পাদক মিঃ বড়ুয়া রিপোর্ট নিয়ে এসে পৌছলেন এবং সম্মেলনের সভাপতির নির্দেশক্রমে নবম বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি, পি, বড়ুয়া রিপোর্ট পাঠ করেন। এতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশের রেখাচিত্র বিশ্ব বৌদ্ধদের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করা হল,-

শ্রদ্ধেয়া সভানেত্রী, প্রতিনিধি বন্ধুবর্গ এবং সদ্ধর্মানুসারী ভ্রাতা-ভগ্নীগণ!

মালয়েশিয়ার রাজধানী নগরে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের যে নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে- পাকিস্তান থেকে আমাদের যোগদানের সক্ষমতাকে আমরা মহান সুযোগ বলে গণ্য করছি। এখানে এ সম্মেলনে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত সুপরিচিত ব্যক্তি ও বিশিষ্ট প্রতিনিধিমণ্ডলী এবং খ্যাতনামা বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠেছে। বন্ধু সাক্ষাতের চেয়ে প্রীতিদায়ক আর কিছু হতে পারে না। আর আমাদের সবার কাছে এ সম্মেলন যেন পারিবারিক পুনর্মিলনেরই উৎসব। এটা যেন দুঃস্থ মানবতার সুখ-শান্তির অন্বেষণায় নিরলস ও নিরবছিন্ন প্রয়াসে নিরত সদ্ধর্মানুসারী বন্ধুদেরই সুন্দর সমাগম। হিংসা-বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব কলহে ক্ষত-বিক্ষত জর্জরিত মানব সমাজে চলুন আমরা আজকে শোনাই নূতন একটা আশা ও বিশ্বাসের বাণী।

শান্তির আদর্শ ও আন্তর্জাতিক সমঝোতা বৃদ্ধির প্রতি সমভাবে উদ্বুদ্ধ পাঁচ লক্ষ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি প্রীতি ও সৌহার্দের বার্তা।

এ মহানগরীতে বর্তমান সম্মেলন আয়োজনে বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের ঐকান্তিক কর্ম-প্রচেষ্টাকে আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছি। আমরা বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘ এবং ইহার সভানেত্রীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা পোষণ করি।

মাননীয় সভানেত্রী এইচ, এস, প্রিন্সেস পুনপিস্‌মাই দিস্‌কুলের পবিত্র, মহান, মধুর ভ্রাতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব বিশ্বের বৌদ্ধদের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধিতে এবং তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মধারা জোরদার করে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ আন্দোলনের গতিকে করেছে তরান্বিত।

এ সম্মেলন উদ্‌যাপনে অশেষ কষ্ট স্বীকারের জন্য আমরা মালয়েশিয়া বাসী বন্ধুদের অভিনন্দন জানাই। এ দেশে এ সম্মেলিত অনুষ্ঠানকে আমরা এখানকার বৌদ্ধ ও মুসলমান দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যকার সহযোগিতা এবং সমঝোতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত বলে মনে করি। এটা আমাদের দেশের তুলনায়ও সমভাবে সত্য। শত শত বছর ধরে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আমাদের দেশে ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্ম শান্তিতে সহ-অবস্থান করে আসছে। মত ও পথ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বপ্রেম ও যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে উভয় ধর্মেরই এক অতুল ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর অসহনশীলতা ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে বাস্তবিকই এটা উৎসাহ-ব্যাঞ্জক সত্য।

এই পটভূমিকায় বৌদ্ধদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার উন্নতি-বিধানে আমাদের দেশে অগ্রগতির কাহিনীর প্রতি আলোকপাত করা উত্তম মনে করি। আপনারা হয়তো জানেন পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর বাঙ্গালি বৌদ্ধেরাই এর অম্লান ঐতিহ্যকে বহন করে আসছে।

আমাদের দেশ অনেক আগে থেকেই বৌদ্ধ প্রধান অঞ্চল। বৌদ্ধ যুগের অবস্থানের কয়েক শত বছর পর বৌদ্ধেরা হীনযান ও মহাযান মতবাদের বিভিন্ন শাখায় এখানে পুনরুত্থান লাভ করে। কুমিল্লা জেলার ময়নামতি, রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর এবং বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের বৃহদায়তন কক্ষ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক স্মৃতিসৌধ এবং বৌদ্ধ ঐশ্বর্যের প্রাচীন নিদর্শন সমূহ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন যাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষিত হচ্ছে।

সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থান ও স্মৃতি নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এসব সম্রাট অশোক ও কনিস্ক কর্তৃক স্থাপিত। পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে মানবাকৃতি নির্মাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্দর নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত বুদ্ধমূর্তি সমৃদ্ধ বিখ্যাত গান্ধারা শিল্পের জন্য আমরা গৌরবান্বিত। বিশ্ববিশ্রুত তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মরাজিক স্তুপ এবং গান্ধারা উপত্যকার মনোরম স্থান সমূহ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করছে। আমাদের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যাঁদের আমি এই উপমহাদেশের প্রকৃত মৌলিক বৌদ্ধদের অবিচ্ছিন্ন বংশ ধারারই প্রতিনিধিত্বকারী বলে উল্লেখ করছি তাঁরা আজ এই সমৃদ্ধি ও বিচিত্র ঐতিহ্যের সাথেই সম্পৃক্ত।

এই সুত্রে বৌদ্ধদের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মধারা আজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও সমঝোতাপূর্ণ পরিবেশে এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের দেশে এক সজীব ও সতেজ শক্তি হিসাবে গড়ে উঠছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় যখনই যে ক্ষেত্রে নিজেদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে আত্মনিয়োজিত রয়েছেন সে ক্ষেত্রে সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয়

সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করে আসছেন। রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহার একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধদের কর্মধারার উন্নয়নে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিহার যেখানে গড়ে উঠছে সরকার তাতে পাঁচ একর জমি দান করেছেন।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গত দু'বছরে আমাদের পরিকল্পনা অনেক দূর এগিয়েছে। আশা করি এই প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভ দেখার সময় আর দূরে নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় অতীতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করে তুলবে। বৌদ্ধ শিল্প-সম্পদের নিদর্শন সম্পুর্ণভাবে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঢাকা একটি সাংস্কৃতিক যাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন সামগ্রী-সমূহ সংগ্রহ করেছি এবং খুব শীগ্‌গীরই এটা একটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে বলে আমরা আশা করছি। ঢাকা নগরী থেকে বিশ মাইল দূরে মুন্সীগঞ্জ জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে বিশিষ্ট দার্শনিক ঋষি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পৈতৃক বাসভূমির উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণার্থেও আমরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

সম্প্রতি প্রচার সঙ্ঘের উদ্যোগে ঢাকা বৌদ্ধ বিহারে একটি সমাজ কল্যাণ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গরীব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিনা পয়সায় ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রাদি দান করার ব্যবস্থা রয়েছে। মহৎ মানবীয় আদর্শে এই সঙ্ঘ সব সময় পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৬৮ ইং সালের করালগ্রাসী বন্যায় চট্টগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিশেষ করে বৌদ্ধ গ্রাম সমূহে সাহায্য-দ্রব্য ও ঔষধ পত্রাদি বিতরণ করে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ একটি প্রকাশনা কেন্দ্র ও লাইব্রেরী স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। গত দু'বছরে সঙ্ঘ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের বিবিধ গ্রন্থ, দুটি পুস্তিকা, বৌদ্ধ ধর্মের অংশ বিশেষ (পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি) ঢাকা, চট্টগ্রাম থেকে বিবিধ কার্যাবলীর বিতরণ সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ করেছে। সরকার পরিচালিত বাংলা একাডেমী জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহায়তায় ব্যাখ্যাসহ 'ধম্মপদ' এবং 'জাতকের গল্প' বাংলায় প্রকাশ করেছে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ অবদান 'বোধিচর্যাবতার' প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে।

এসব ছাড়া আমরা দেশের বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধ ধর্ম সর্ম্পকে বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে আসছি এবং এ সব সভায় বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন শাস্ত্রের আদর্শ নিয়ে সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যক্তিরা বক্তৃতা ও আলোচনা করে আসছেন। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকার বৌদ্ধ ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ও স্টাইপেণ্ড্ বরাদ্দ এবং সমগ্র দেশের প্রায় তিন শতাধিক বিহার সংলগ্ন ধর্মীয় শিক্ষার স্কুলে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য করে চলেছেন। সরকারী সাহায্যপুষ্ট পালি ও সংস্কৃত বোর্ড ঢাকা বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে আমরা যে সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেছিলাম তাতে তদানীন্তন গভর্ণর সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা বিতরণ করেছিলেন।

চেংমাইতে অনুষ্ঠিত গত সম্মেলনে আমরা পাকিস্তানের বৃহত্তম নগরী করাচীতে একটি বিহার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছিলাম। আমরা সানন্দে আপনাদের জানাচ্ছি যে আমাদের সেই প্রচেষ্টা ১৯৬৭ সন থেকে সফল হয়ে আসছে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এতদুদ্দেশ্যে একখণ্ড বৃহৎ জমিন পাওয়া গিয়েছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম বৌদ্ধ পীঠস্থান তক্ষশীলাতে কেন্দ্র স্থাপন করাই হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা। আমাদের সরকার এই পরিকল্পনার প্রতি সহানুভূতি-শীল এবং এই আদশ প্রকল্প শ্রীঘ্রই বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করি।

১৯৬৭ সালে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের সভানেত্রী এইচ, এস, এইচ রাজ-কুমারী পুন পিস্মাই দিস্‌কুল এবং সাধারণ সম্পাদক মিঃ এইম সঙ্ঘবাসীকে আমাদের দেশ সফরকালে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁদের সফর সমগ্র বৌদ্ধদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

অন্য এক খ্যাতনামা সফরকারী হচ্ছেন-সিংহল থেকে আগত বিশ্ব বৌদ্ধ সঙ্ঘ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় পি সোরথ থের। তাঁকেও বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

ভিক্ষু সঙ্ঘের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায় অত্যন্ত সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত আছে এবং আমাদের দেশে সদ্ধর্মের উন্নয়নে ভবিষ্যতে বৃহত্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

এ সম্মেলন মানব জাতির জন্যে নূতন আশার বাণী প্রচার করুক।

"সব্বে সত্তা সুখীতা হোন্তু"

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও বর্তমান কর্ম তৎপরতার বর্ণনা সম্বলিত এই রিপোর্ট পড়া সমাপ্ত হলে সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে রিপোর্টকে অভিনন্দন জানান।

এই মহান সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের মোট ৫৪ টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মধ্যে ৩১টি কেন্দ্রের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধ সংখ্যাগরিস্ট এশিয়া মহাদেশ ব্যতীত ইউ,এস, এস, আর, (Union of Soviet Socialist Republic) ইউ, এস, এ, (United States of America) ইউ, কে, (United Kingdom) ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রভৃতি সুদূর বিদেশ থেকে নির্বাচিত যোগ্য প্রতিনিধিগণ দলে দলে উপনীত হন। ইহাতে অন্যান্য বিশিষ্ট আগন্তুক ছাড়া শুধু প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকগণের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০ জনের অধিক। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বহু বৌদ্ধ মনীষী। যেমন-সিংহলের ডক্টর জি, পি, মলল শেখর-তিনি এই বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-যিনি
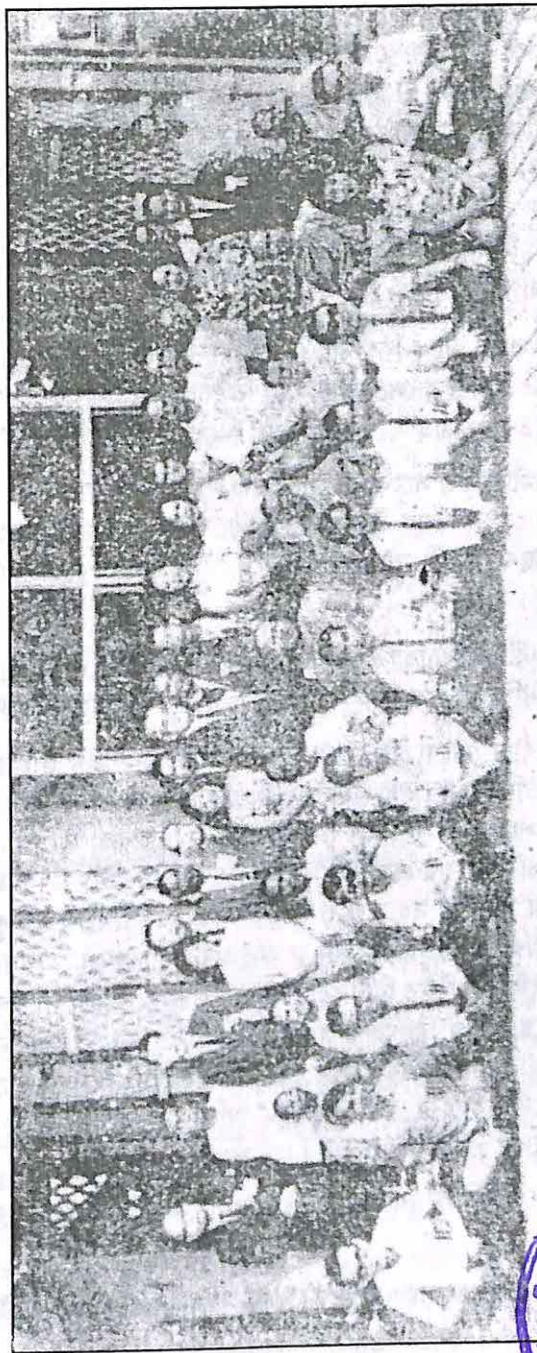
বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ সম্মেলনের প্রতিনিধি বর্গ - ১৯৬৯ সন, কুয়ালালামপুর।
Delegation of World Fellowship of Buddhists Kualalampur-1969

জাতিসংঘে সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং যুক্তরাজ্যে সিংহলের ভূতপুর্ব রাষ্ট্রদূত ছিলেন। থাইল্যাণ্ডের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, বর্তমান রাজার প্রিভি কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ও থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি, ভিয়েতনামের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ প্রধান পুরোহিত পূজনীয় ডক্টর থিচ মিন চৌ সায়গনের বনহন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ; জাপানের বিখ্যাত শান্তিবাদী পূজনীয় রি বি নাকায়ামা; মঙ্গোলিয়ার প্রধান লামা পূজনীয় সম্মসন গম্বোজব; থাইল্যাণ্ডের ধর্মাত্যের ডাইরেক্টর জেনারেল কর্ণেল মুটুকানন্ত এবং অন্যান্য দেশ হতে আগত বৌদ্ধ নামজাদা দিকপালগণ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

সম্মেলনের প্রথম দিকে বিশ্ব জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উঃ থান্ট তাঁর ব্যক্তিগত দূত এবং ইকাফের সেক্রেটারী- উঃ নিউনকে প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়েছিলেন। আর আমরা যে তিনজন এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছি, তা তো পুর্বেই বলেছি।

বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সজ্বের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি দেশ সম্মেলনে উপস্থিত হন নি। যেমন- লাল চীন, উত্তর ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কম্বোডিয়া, বার্মা ইত্যাদি। সম্ভবতঃ এই সব দেশের সাথে থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্ক ভাল নেই।

যা হোক, সর্বদিক বিচারান্তে বলতে হয় যে এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যাপক সমাগমে একটি অপূর্ব মিলন কেন্দ্র হয়েছে।

এই বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সজ্ঘ ১৯৫০ সনের ৬ই জুন সিংহলের রাজধানী কলম্বো নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা মহান আন্তর্জাতিক সংস্থা। এশিয়া মহাদেশ ব্যতীত সর্ব প্রথম কলম্বো সম্মেলনে সুদূর জাপান, হাওয়াই, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মান প্রভৃতি ২৯টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই মহান সংস্থা বৌদ্ধ ধর্মের উভয় মতবাদ মহাযান ও থেরবাদ মতাবলম্বী ভিক্ষু ও গৃহীর সমাগমে গঠিত। বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক মহান ও অভূতপূর্ব সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে বিশ্বের কোন বিভাগীয় বৌদ্ধের দ্বিধা বোধ হয়নি। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্যে বলা যেতে পারে যে এই মহান সংস্থা সমগ্র বিশ্বের একশত সাড়ে বত্রিশ কোটি বৌদ্ধের প্রতিনিধিত্ব মূলক। বর্তমান ইহার প্রধান দপ্তর থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক মহানগরীতে অবস্থিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহার মোট চুয়ান্নটি আঞ্চলিক শাখা রয়েছে। বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সজ্বের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে।,

১। তথাগত বুদ্ধের শিক্ষানুযায়ী চর্যা ও সাধনার মাধ্যমে প্রত্যেক সভ্যের জীবন গঠন।

২। বৌদ্ধ জনগণ মাঝে অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব, সমান সুখ-দুঃখানুভুতি ও ঐক্য স্থাপন।

৩। তথাগতের মহান আদর্শ-অহিংসা ধর্মের প্রচার করা।

৪। সামাজিক, শিক্ষানৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা ও মানবসেবার বিবিধ পন্থা উদ্ভাবন করা।

৫। বিশ্বের মানব সমাজ ও অন্যান্য প্রাণিগণ মধ্যে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে কাজ করে যাওয়া এবং সমান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পন্ন বিশ্বের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা পূর্বক কাজ করা।

বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আরম্ভ করে চলতি সন পর্যন্ত প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ যাবৎ এই মহান সঙ্ঘের অধিবেশন কোন্ কোন্ দেশে কোন্ কোন্ সালে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে- নিম্নে তা প্রদর্শিত হল ঃ-

প্রথম কলম্বো, সিংহল-১৯৫০

দ্বিতীয় টোকিও, জাপান ১৯৫২

তৃতীয় রেঙ্গুন, বার্মা-১৯৫৪

চতুর্থ কাঠমণ্ডু, নেপাল-১৯৫৬

পঞ্চম ব্যাঙ্কক, থাইল্যাণ্ড-১৯৫৮

ষষ্ঠ নমপেন, কম্বোডিয়া ১৯৬১

সপ্তম সারনাথ, ভারত-১৯৬৪

অষ্টম চেংমাই, থাইল্যাণ্ড-১৯৬৬

নবম কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া-১৯৬৯

দশম কলম্বো, সিংহল--১৯৭২

পাসপোর্ট সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা বিলম্বে পৌছাতে দুটি প্রারম্ভিক সভায় যোগ দিতে পারিনি। তথাপি এই প্রারম্ভিক সভার কার্য্যাবলী সম্পর্কে যা জেনেছি তা হচ্ছে এই-সেখানে স্বাভাবিকভাবে আচারানুষ্ঠানিক আড়ম্বর ও বৈশিষ্ট্য ছিল। যিনি প্রধান অতিথি হয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন, মালয়েশিয়ার আবাসিক মন্ত্রী এবং বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের সাংগঠনিক সমিতির প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান মিঃ খও কাহ বোহ্। তিনি এক সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। তাঁর ভাষণের সংক্ষিপ্ত সার হল এই-

মালয়েশিয়ায় বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য স্থান নির্বাচিত হওয়ায় মালয়েশিয়াবাসী সত্যই গৌরবান্বিত। আজ আপনারা তথাগত বুদ্ধের মহান শিক্ষা বিশ্বের মানব সমাজে প্রচার ও বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে

বিশ্বের সকল অংশ থেকে এখানে সমবেত হয়েছেন। তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যদিও মালয়েশিয়ার শাসনতন্ত্রে ইসলাম মালয়েশিয়ার জাতীয় বা রাজধর্ম রূপে স্বীকৃত তথাপি শাসনতন্ত্রে এরূপ বিধানও রয়েছে যে মালয়েশিয়ার অন্য ধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তির তার নিজ ধর্মনীতির অনুশীলন ও প্রচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে। এদেশে সকল ধর্মবলম্বীর পক্ষে নিজ ধর্মানুশীলনের সুযোগ-সুবিধা আগেও ছিল, এখনও আছে ও চিরকাল থাকবে।

ধর্মানুরাগ, ধর্ম-বোধ ও ধর্ম-বিশ্বাস জাগাবার জন্য মালয়েশিয়া সরকারী বেসরকারীভাবে যে তৎপরতা প্রকাশিত হয়েছে সমগ্র বিশ্বে তার তুলনা বিরল। মসজিদ, মাদ্রাসা, গির্জা বৌদ্ধ মন্দির ও হিন্দু মন্দির প্রভৃতি পবিত্র পীঠস্থান সমূহ সংরক্ষণ ও গঠনকল্পে মালয়েশিয়া সরকার স্বাধীনতার পর থেকে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন।

আমাদের মালয়েশিয়া সরকার মালয়েশিয়ার মত বহু গোত্র বহু বর্ণ ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত স্বাধীন দেশে ধর্মানুশাসনের মহান গুরুত্ব পুরপুরিভাবেই উপলি করেন, আমরা বিশ্বাস করি যে এই বহু বর্ণ, বহু বংশ বিশিষ্ট সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের ক্ষেত্রে একটা মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জীবকল্যাণ সাধনই প্রত্যেক ধর্মের আদর্শ ও উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ ধর্ম জগতে সর্ব প্রাচীন ও সর্ব প্রধান ধর্ম। ইহার মূলমন্ত্র হচ্ছে সর্ব্ব জীবে মৈত্রী-করুণা শান্তি-শৃঙ্খলা ও মহানুভবতা যাহা বর্তমান হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে সর্বজন-স্বীকৃত অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সজ্ঘের এই মহান সম্মেলন যুদ্ধোন্মত্ততার অতল স্পর্শে আবদ্ধ অন্তর্রাজ্যে গভীরভাবে আলোকপাত করবে।

মালয়েশিয়া বিশেষভাবে গৌরববোধ করছে যে-এই মালয়েশিয়ায় বৌদ্ধ বিহার-স্তূপ, হিন্দু মন্দিরের সুশোভন চূড়া, গির্জ্জা-মসজিদের অত্যুঙ্গ নয়নাভিরাম গম্বুজ ও মিনার পাশাপাশি বিরাজমান। ইহা মালয়েশিয়াবাসী জনগণের পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসা, পরমত সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধারই বিশিষ্ট নিদর্শন।

আমরা সকল পরমারাধ্য সজ্ঘ ও মহান নেতৃবৃন্দ-যাঁরা দেশ-বিদেশ হতে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ মানসে সমাগত হয়েছেন আমি তাঁদের সাদর সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আজকের পৃথিবীতে হৃদ্যতাপুর্ণ সদ্‌ভাব ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই সম্মেলন বিশেষ কার্যকরী ও সার্থক হবে।

আমি সরলতার সহিত আশা করি যে- আপনারা আমাদের দেশে অবস্থানকালীন অতীব আনন্দ উপভোগ করবেন এবং আজকের বহু সমস্যাজড়িত

পৃথিবীতে শান্তির জন্য আমাদের যে উৎসাহব্যঞ্জক প্রেরণা, -তা অনুধাবন করবেন। এই দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় নিজ নিজ দেশের জনগণের জন্য আমাদের প্রেম-প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী বহন করে নিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।

বৌদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে কয়েকটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত বক্তৃতা পাঠ করেন বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল। সঙ্ঘের কার্যাবলীর পটভূমিকায় যে সব উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিহিত আছে,- তার বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ নীতিমালার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানই ছিল এ সব বক্তৃতার মুল উদ্দেশ্য।

উদ্বোধনী আচারানুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই এক প্ল্যানারী বৈঠকে এক গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে এই,- বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের পরিচালনার ব্যাপারে থাই সরকার যে আর্থিক সমর্থন দিয়ে আসছেন, তার স্বীকৃতি-স্বরূপ চিরস্থায়ীভাবে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের কার্যকরী কমিটির সুপারিশক্রমে উত্থাপিত হয় ও সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করা হয়।

চার

১৪ই এপ্রিল, সোমবার সকালে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বের সকল প্রতিনিধির সঙ্গে আমাদের সেই সম্মিলনের দৃশ্য আমার দৃষ্টিতে যেমন অপূর্ব, জীবনে তেমনি একান্ত অভিনব। সভাসদের মধ্যে কেহ শ্বেতাঙ্গ, কেহ পীতাঙ্গ, কেহ লোহিতাঙ্গ, কেহ বা শ্যামবর্ণ। সুসজ্জিত তাঁদের পরিচ্ছেদ, অটুট তাঁদের স্বাস্থ্য, সুডৌল সুঠাম তাঁদের অবয়ব, প্রত্যেকের চেহারায় লাবণ্যময় ও মাধুর্য-মণ্ডিত হাসি, কমনীয় মুখমণ্ডল দর্শন করে আমার হৃদয় তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠল। প্রত্যেকটি মহিমাময় দেদীপ্যমান আকৃতি দেখে আমার দৃষ্টি এমন করে আকর্ষিত হয়ে গেল আমি যেন তাতে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। প্রত্যেকের চেহারায় রয়েছে আকর্ষণী শক্তি ও স্নিগ্ধরূপ। তাঁদের দেহ-ক্লান্তি ও মুখশ্রীতে সরলতার সহিত উজ্জ্বলতার অপূর্ব সম্মিলন। চক্ষে যেন ইন্দ্রজাল বিস্তার লাভ করছিল। লঙ্কা, লাওস, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশের গৌড়ীয় বসন পরিহিত স্থবিরবাদ পন্থী ভিক্ষুগণের এবং চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশের পীতবর্ণ দীর্ঘ আলকাল্লা পরিহিত মহাযানপন্থী লামাগণের দেবপ্রতিম দেহ-সৌষ্ঠবে আমি আভিভূত হয়ে যাই। স্বর্গীয় দেব-পরিষদের সুষমাময় মাধুর্য যেন এই মর্ত্য পরিষদে নেমে এসেছে। প্রেক্ষাগৃহ যেন দেবালয়ে পরিণত।

প্রেসিডেন্ট রাজকুমারী পুন পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের আগমন বার্তা ঘোষণা করলে মাননীয় মহাথের ও আমি যখন দাঁড়ালাম বিশ্ব ভ্রাতারা তখন হর্ষধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত করে তুললেন। আমার অদ্ভুত চেহারাটা নিয়ে এই মহান পরিষদের সম্মুখে দাঁড়াতে গিয়ে লজ্জা, ভয় ও সঙ্কোচে আমি তুষার খণ্ডের ন্যায় একেবারে

আড়ষ্ট হয়ে যাই। সেই স্মৃতি সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি এখনো আমার মানসপটে ভেসে উঠে।

শুধু বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্যে কিংবা ভব্যতা-সভ্যতায় মানুষের প্রকৃত পরিচয় হয় না। মানুষ স্বাস্থ্যে হীন বা উত্তম হতে পারে। দৈহিক গঠনে সুশ্রী কিংবা বিশ্রী হতে পারে, বর্ণে গৌর অথবা কৃষ্ণ হতে পারে তাতে মানুষের বিচার হয় না। পোষাক-পরিচ্ছেদ, বিলাস-ব্যসন বাহিরের শোভা বর্ধন করে মাত্র।

ধর্ম ও জ্ঞানের নিদর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্তর্নিহিত সাধনা ও চরিত্রের অব্যক্ত রূপটি মানুষের আকৃতিতে পরিষ্কারভবে ফুটে উঠে। উহা কখনও গোপন থাকার বস্তু নয়। ইহা অবয়বে নিত্য প্রকাশিত। যেহেতু মানুষ তার নিজ নিজ কর্ম সাধনার বাহ্য অভিব্যক্ত প্রতীক। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলনে লক্ষ্য করলাম উচ্চ শিক্ষা, অগাধ পাণ্ডিত্য, সহজাত প্রতিভা ও অধ্যাত্ম গরিমায় মণ্ডিত প্রত্যেকটি চেহারা, ধর্ম-জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল, ত্যাগ-সাধনায় কমনীয়, কান্তি তাঁদের সর্বাঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে।

মানুষ তথাগতের অনিন্দ্য-সুন্দর রূপে মোহিত, বিচিত্র সুমধুর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়েছে। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তথাগতকে বন উপবনে, শ্মশানে-মশানে বাস করতে দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়েছে। সুবর্ণ-পাত্রের পরিবর্তে নরমুণ্ডের খুলিতে আহার করতে দেখে চমকিত হয়েছে। কিন্তু শীল-সমাধি-প্রজ্ঞালোকে সন্দীপ্ত তথাগত বুদ্ধকে যারা লক্ষ্য করেছেন-তাঁদের সংখ্যা জগতে বিরল। তাঁদের দর্শনই প্রকৃত সন্দর্শন।

নানাকুলা পব্বজিতা নানা গাম পদেহি চ
অঞ্ঞমঞ্ঞং তে পিয়হন্তি তস্মা মে সমণা পিয়া।

বিশ্বের নানা গ্রাম, দেশ, নিকায়, কুল ও নানা জাতি থেকে সমাগত ভিক্ষুগণ তাঁরা একে অন্যের আপন, পারস্পরিক স্নেহ-মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। গঙ্গা, যমুনা, সরভূ, সরস্বতী প্রভৃতি নদ-নদী এসে যখন সাগর সঙ্গম করে, তখন আর তাদের নিজস্ব সত্তা থাকেনা। মহাসাগরে বিলীন হয়ে যায়। আমিও তাঁদের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির যোগসূত্রে, মৈত্রী-করুণার অনন্ত তরঙ্গে তলিয়ে গেছি। তাঁদের মহান সহচর্যে স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি।

১৪ই এপ্রিল সকাল বেলায় বিভিন্ন দেশের রিপোর্ট পাঠ সমাপ্তির পর প্ল্যানারী বৈঠক স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তী দুই দিন বিভিন্ন কমিটিগুলোর বৈঠক অনুষ্ঠানে ব্যয়িত করা হয়। ধর্মদুত (ধর্মের প্রচারণা), কলা, কৃষ্টি, সাহিত্য, শিক্ষা প্রকাশনা, যুব সম্প্রদায়, রাজস্ব, একতা ও সংহতিকে অবলম্বন করে কতকগুলো কমিটি গঠিত হয়। তম্মধ্যে শিল্পকলা,কৃষ্টি, সাহিত্য, শিক্ষা এবং প্রকাশনা কমিটিতে আমাদের সাধারণ সম্পাদক দেবপ্রিয় বড়ুয়াকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কমিটিগুলোর কাজ ছিল ইতোপূর্বে বিভিন্ন দেশ হতে যে সব প্রস্তাবাবলী পাওয়া গিয়েছিল সেগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং পরবর্তী প্ল্যানারী বৈঠকে আলোচনার যোগ্য বলে সুপারিশ করা।

মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া যে কমিটিতে সদস্য ছিলেন সেই কমিটি একটি সিংহলী প্রস্তাবনার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয় জাতিসংঘের ইউনেস্কো দপ্তর বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সজ্ঘকে স্বীকৃতির এমন এক পর্যায়ে অভিষিক্ত করুক যাতে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সজ্ঘ বিশ্বশান্তির জন্য বুদ্ধের শিক্ষাকে ইউনেস্কোর বিভিন্ন শিক্ষা ও কৃষ্টি প্রকল্পে প্রতিফলিত করতে পারে। এতে বিশ্বশান্তির পথ সুগম হবে। এই উদ্দেশ্যে এই কমিটি একটি বিশেষ কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন যা ইউনেস্কো দপ্তরের সাথে সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে কাজ করে যেতে পারবে।

ইত্যবসরে অন্যান্য কমিটিগুলো সম্মেলনে গৃহীত হওয়ার মানসে সুপারিশ পত্র সমূহ প্রস্তুতি কার্য সমাপ্ত করলেন। এপ্রিলের ১৮ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত অধিবেশনের স্থান নির্ধারিত হয় মালয়েশিয়ার দ্বীপনগরী পিনাঙ্গ।

অদ্য সন্ধ্যা ৭ টার সময় সকল প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলীকে বাস-যোগে নিয়ে গেল শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ থেকে সাড়ে তিন মাইল ব্যবধানে ইপো রোডের উপর অবস্থিত চৈনিক মন্দিরে। সেখানে প্রতিনিধিগণের সম্বর্ধনার্থ নৈশ-ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ইহার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে মালয়েশিয়া বৌদ্ধ সমিতির সিলঙ্গার শাখা। ইহা একটি প্রকাণ্ড বিহার। মহাযানপন্থী চৈনিক বৌদ্ধদের এই বিহার। এর গঠন প্রণালী বড় মনোজ্ঞ। বৈচিত্র্যময় দেউল-রাশি সারি সারিতে সুসজ্জিত। এই বিহারে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ-শ্রাবকগণের অসংখ্য মনোরম প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সকলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম-আচার্য শান্তিদেবের ভাষায় ঃ

"অপুণ্যবানস্মি মহা দরিদ্র ঃ পূজার্থ মন্যন্ মম নাস্তি কিঞ্চিত।

অতো মমার্থায় পরার্থ চিত্তা গৃহ্নন্তু নাথা ইদমাত্ম শক্ত্যা"।।

"হে পরার্থ-চিত্ত মহাজীবন! জীবন-দুঃখের অবসান ঘটাতে যে পুণ্য-সম্পদের প্রয়োজন, তা আমি অর্জন করিনি। শ্রদ্ধাদি গুণ-ধর্মে আমি বড় দুর্বল, বড় অপুণ্যবান। শীলাদি সর্ব সম্বিৎ শূন্য আমি মহাদরিদ্র। তোমাদের পাদ-পদ্ম পুজায় অর্পণ করার জন্য আমার কিছুই নেই । অতএব হে নিঃস্বার্থ-চিত্ত প্রভূগণ! আপন শক্তিতে আমার অন্তর-নির্ঝর এই হীন চিত্তের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন স্বীকার করো। বিষ্ঠালিপ্ত দেহে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত আমি যখন করুণ দৃষ্টিতে পরিত্রাণ আকাঙ্খা করব, যখন শত আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত থাকলেও আমার একমাত্র অবলম্বন যে পুণ্য আমি সেই পুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করিনি। আমি মহাদরিদ্র"।

বিহারে অসংখ্য ভক্ত-সমাগম। ভক্তগণের প্রাণঢালা ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখে আমার চিত্তেও অপূর্ব ভক্তির উন্মেষ হয়। আজ তাদের ব্যাকুল আকুতি, আকুল প্রাণে বিশ্বের বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণকে অভিনন্দিত করবেন। আপ্যায়িত করবেন নানা সুস্বাদু পরিপাটি খাদ্য-ভোজ্যে।

নীচের তালায় বিরাট হল গৃহ। হল গৃহটি আজ বিশ্ব প্রতিনিধিবৃন্দের ভোজনালয়। খাদ্য-ভোজ্যের প্রাচুর্য ও সমারোহ দেখে আমি অবাক হলেম। এই ভোজে আমিষের আভাষ নেই। আমরা যারা স্থবিরবাদী ভিক্ষু ছিলাম আমাদের জন্য অদূরবর্তী স্বতন্ত্র টেবিলে চা, কফি, কোকাকোলা ও অরেঞ্জ প্রভৃতি কত রকমের যে সুস্বাদু পানীয় দ্রব্য সাজিয়ে রেখেছে সবগুলোর নাম করা তো আমার পক্ষে দায়।

পান-ভোজনের কাজ সমাপন করে দ্বি-তল গৃহে আরোহণ করে দেখতে পাই- অভ্যর্থনার মহাসমারোহ। কুণ্ডলাকারে রাশি রাশি কেদারা সজ্জিত সভাতল। উপরে চিত্র-বিচিত্র আলোকসজ্জা। করুণাঘন তথাগতের উদ্দেশ্যে প্রতিমার সম্মুখে জ্বলছে অসংখ্য দেউল। ধূপ-ধুনার ধূম্র ধনু আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। গন্ধে ভরা সভাগৃহে উপনীত প্রতিনিধিদের কুঞ্চিত নাসিকা প্রসারিত হচ্ছে।

আমরা সকলে আসন গ্রহণ করলাম। শ্রীলংকার বৌদ্ধ সমিতির সম্পাদক সভ্যকে উপলক্ষ্য করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন পূর্বক এক মনোহারী বক্তৃতা করেন। অতঃপর প্রত্যেক প্রতিনিধি প্রধানকে স্মারক -চিহ্ন স্বরূপ রেশম বস্ত্র নির্মিত একেকটি পতাকা প্রদান করলেন। অতঃপর আমরা তা হস্তে নিয়ে ও মনোরম স্মারক চিহ্ন বুকে নিয়ে বিপুল আনন্দে কলেজ হোস্টেলে ফিরে এলাম। তখন রাত্রি ১০ টা।

পাঁচ

১৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ৭টায় মিঃ বড়ুয়া মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনারের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। হাই কমিশনার সাহেব আমাদেরকে আধ ঘণ্টা পরে তাঁর বাসভবনে যেতে অনুরোধ করলেন। হাই কমিশনার সাহেবের গাড়ী কিছুক্ষণ পরেই হোস্টেলের দরজায় এসে হাজির। আমরা তাড়াতাড়ি প্রক্ষালনাদি কর্ম সেরে প্রাতরাশ গ্রহণ করলাম এবং গাড়ীতে চাপলাম। গাড়ী আমাদেরকে বক্ষে নিয়ে ত্বরিত বেগে আঁকা বাঁকা মনোরম রাস্তা অতিক্রম করে তাঁর বাসভবনে পৌঁছল।

আমরা হাই কমিশনার সাহেবের বৈঠকখানায় আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্বি-তল থেকে নেমে আসলেন এবং আমাদের সঙ্গে গভীর আন্তরিকতা সহকারে প্রীত্যালাপ পুর্বক পাকিস্তান ও মালয়েশিয়া সম্পর্কে বাক্ বিনিময় করলেন। ইত্যবসরে আন্দর মহল থেকে চা, কফি, বিস্কুট ও মিঠাই-বাহক এক বিচিত্র বারকোষ এসে সম্মুখস্থ টেবিলে উপনীত হল। বাক্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে চা, বিস্কুট প্রভৃতি সব খাদ্যগুলো আরেক অন্দর মহলে চলে গেল।

অতঃপর হাই কমিশনার সাহেব কুয়ালালামপুর নগরী বক্ষে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিলেন। শুধু পরামর্শই নয়। তাঁর সহকর্মী আমাদের পরিচিত বন্ধু মোশারেফ হোসেন সাহেবকে পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে দিলেন। আর দিলেন যাতায়াতের জন্য তাঁর অতি মনোরম এম্বেসীর গাড়ী। গাড়ীর ড্রাইভার হচ্ছে মালয়েশিয়া নিবাসী, তার নাম মহম্মদ। গাড়ীতে চলছি। মিঃ বড়ুয়া ও হোসেন সাহেব পরস্পর বাক্যালাপ করছেন- মালয়েশিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন কর্মময় জীবন ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে। এই বাক্যালাপকে অতিশয় আশ্চর্য্যজনক বলে মনে করলাম এই জন্য যে দুইজন ঝুনা শিক্ষিতের সঙ্গে একজন গাড়ীর ড্রাইভার রীতিমত বাক্যালাপে যোগ দিল। প্রতিটি আলাপ তার পুরাদস্তুর যুক্তিসঙ্গত। কথায় কথায় তার বিনয় নম্র ভাব। তার প্রতি আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সারা জীবনই তো এ জাতীয় গাড়ী-ড্রাইভারকে দেখে আসছি। আমাদের দেশে গাড়ীর ড্রাইভারের নামে তো আমরা ভয় পাই। কিন্তু আজ মালয়েশিয়ার এই ড্রাইভারটিকে নূতন করে দেখলাম।
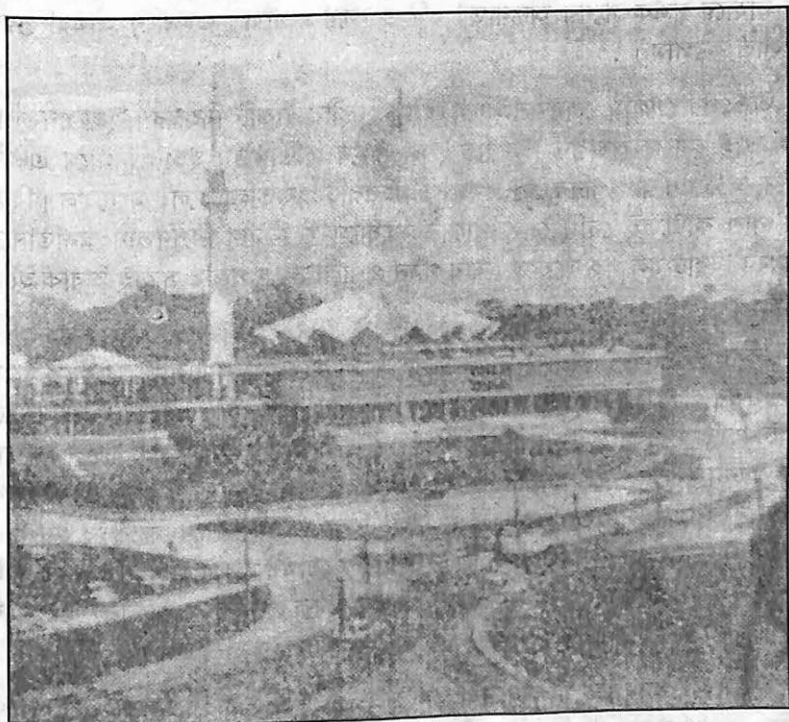
মসজিদ নাগারা, কুয়ালালামপুর
National Mosque, Kualalampur

প্রথমতঃ আমাদিগকে নিয়ে পৌছালেন এক বিরাটকায় অতি মনোরম মসজিদে। ইহা 'জাতীয় মসজিদ' নামে পরিচিত। ইহা নাকি মক্কার সমজিদের নমুনায় নির্মিত। আমরা তো মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রের অধিবাসী। মসজিদ আমাদের নিত্য পরিচিত বস্তু। কিন্ত এরূপ কারুকার্য-খচিত মনোজ্ঞ মসজিদে আমাদের চোখে আর পড়ে নি। ইহার গঠন প্রণালী একান্ত অপূর্ব। মসজিদখানি তের একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মহান গাম্ভীর্য ভরে দাঁড়িয়ে আছে। ৪৮টি বিচিত্র গম্বুজ ইহার ধারক। তন্মধ্যে প্রধান গম্বুজে ১৮টি তারকাচিহ্ন উৎকীর্ণ। জিঞ্জেস করে জানতে পারলাম এই ১৮টি তারকার মধ্যে ১৩টি তারকা মালয়েশিয়ার ১৩টি প্রদেশের প্রতীক। আর বাকী ৫টি ইসলামের পঞ্চনীতি-রোজা, নামাজ, হজ্ব, কলেমা ও জাকাতের প্রতীক। মিনারটি ২৫০ ফুট উচ্চ। মোয়াজ্জিন সাহেব নাকি লিফটে উঠে আজান কর্ম সম্পাদন করেন। অভ্যন্তরে চতুষ্কোণী উদ-পান চৌবাচ্চা। তন্মধ্যে কৃত্রিম প্রস্রবণ। নামাজিদের অজুর পানির উত্তম ব্যবস্থা। মসজিদের দুই পাশে রাজপথ। এক পাশে সুরম্য তোরণ ও অপর পাশে শ্যামল সবুজ ঘাসে ঘেরা প্রকাণ্ড ময়দান। তাতে গন্ধে ভরা অসংখ্য পুষ্পরাশি মাথায় নিয়ে সারি সারি পুষ্প বৃক্ষ দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং পত্র-বাহারের চমক বাহারে দর্শক গণের অন্তরাত্মা রঞ্জিত করে তোলে। তদ্দর্শনে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করলাম।

অতঃপর গেলাম জেতবন নামে শ্যাম দেশীয় একটি বিহারে। ইহা পেতলিং জয় পান্তাই রোডে অবস্থিত। অনুচ্চ শৈল পাদে প্রতিষ্ঠিত। ইহার নির্মাণে একটি বৈশিষ্ট্য, লক্ষণীয় রূপ পরিস্ফুট। প্রথমতঃ মন্দিরটি একতালা বলেই মনে হল। কিন্তু ইহার পাশ কাটতেই দেখি শৈল পাদের সুযোগে ও নির্মাণ-নিপুণতায় অনতিনিম্নে আরেকটা বিরাট হল গৃহ রয়েছে। যার গঠন প্রণালী চক্ষে পড়ায় সত্যই অবাক হতে হয়েছে।

বেলা ৯টার সময় আমরা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে ফিরে এলাম। এখানে এসে দেখি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন কমিটির বৈঠক আরম্ভ হয়ে গেছে। বৈঠক চলল সাড়ে এগারটা পর্যন্ত। বৈকালেও পুনরায় আড়াইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বৈঠক চলল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত এই এক ঘণ্টা লণ্ডনের একজন প্রাজ্ঞ ভিক্ষু মাননীয় বুদ্ধদাসের বক্তৃতা দিবার কথা ছিল; কিন্ত কোন কারণে সম্ভবপর হয় নি। এমন কি মাননীয় বুদ্ধদাস ভিক্ষুকে দর্শন করার সুযোগও পেলাম না। তিনি কি এই সম্মেলনে আদৌ আসেননি-না সম্মেলনের প্রথম দিকে এসে চলে গেলেন? অবশেষে দেখি ভিক্ষু বুদ্ধদাসের একটা টাইপ করা বক্তৃতা বিতরণ করা হল।

অতঃপর প্রেক্ষাগৃহে মালয়েশিয়ার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-বাহক কতেক পৌরাণিক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রথমতঃ আমি তা ধরতেই পারিনি যে এগুলো কি প্রদর্শিত হচ্ছে। আমার ধারণা নূতন দেশে এসেছি নূতন কিছু দেখব, নূতন কিছু শিখব। কিন্তু দৃশ্যমান বস্তু যে একান্ত পৌরাণিক, পরিচিত তা হঠাৎ বুঝে উঠতে পারিনি। অবশেষে

বুঝতে পারলাম-এসব রামায়ণ মহাভারতে সম্বলিত নানা কাহিনী সম্পর্কিত ছায়াচিত্র। এই মালয়েশিয়ায়এক সময়ে নাকি রামায়ণ ও মহাভারতের খুব প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে ইহাদের প্রভাব ম্লান হলেও একেবারে মুছে যায় নি। পৌরণিকতায় পর্যবসিত হয়েছে মাত্র।

এসব অনুষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আমরা হোস্টেলে গিয়ে যার যার কামরায় আশ্রয় নিলাম এবং 'সব্বে সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা' বলে শয্যা গ্রহণ করলাম।

১৬ তারিখ বুধবার ভোর ৫টায় উঠে যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করলাম। অদ্য ১০ টায় যেতে হবে পেতনিং পান্তাই রোডে প্রতিষ্ঠিত জেতবন বিহারে। তথায় আজ আন্তর্জাতিক ধর্মানুষ্ঠান। সমগ্র প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকবৃন্দের আমন্ত্রণ এসেছে।

যথা সময়ে বাস এসে হাজির হলো কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণে। আমরা প্রস্তুত হয়ে বাসে চাপলাম। বাসগুলো আমাদেরকে বক্ষে বহন করে শহরের আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে ঠিক ১০ টায় গিয়ে জেতবন বিহারে উপনীত হলো।

ঘণ্টা খানেকের অনুষ্ঠান। ভিতরে ঢুকেই বিশ্বের সকল প্রতিনিধি প্রনতঃশিরে বসে পড়লেন মন্দির চত্বরে। চত্বরের এক পার্শ্বে করুণাঘন তথাগতের অনুপম মর্মর প্রতিমা উত্তর দক্ষিণ পার্শ্বে ভিক্ষুদের উচ্চাসন। মাঝে প্রকাণ্ড চত্বর ব্যাপী স্থাপিত নীচাসনে নগ্ন পদে হাটু গেঁড়ে বসলেন ভক্তি-আপ্লুত অসংখ্য নর-নারী। আজ আসনোপবেশনে পাশ্চাত্য পদ্ধতির বালাই নেই। আছে বৌদ্ধ বিনয়-সম্মত নিয়ন।

ধর্মাসনে আসীন হলেন শ্যাম দেশীয় এক প্রাজ্ঞ প্রাচীন মহাস্থবির। তাঁর সম্মুখে পবিত্র মঙ্গল ঘট প্রতিষ্ঠিত। এই মঙ্গল ঘটকে কেন্দ্র করে ইহার চার দিক ধূপ-ধুনা, দীপ দেউলে, পত্র পল্লব ও ফল-ফুলে সুসজ্জিত হয়ে এক অপরূপ শোভা বর্ধন করছে। মঙ্গল ঘটের গল-বন্ধ একটি মাত্র অতি সরু কার্পাস সূত্রকে সমগ্র বিশ্বের কি ভিক্ষু, কি গৃহী, কি পুরুষ, কি মেয়ে সকলেই অঞ্জলি-বদ্ধ মুষ্ঠিতে ধারণ করেন। এই সূত্রের মহান আশ্রয়ে আজ সকলে সমান, এক ও অভিন্ন নানা জাতি, নানা দেশ বহুমুখী ভাষা ও বর্ণ সংস্থানে শতধা বিচ্ছিন্ন হলেও আজ এই সুচিক্কন সূত্রের যোগে এসে বিশ্ব বৌদ্ধদের মধ্যে কেউ পর, কেউ আপন রইলেন না। সবাই পরস্পর মিত্র, পরম বন্ধু, সমান সুখ, দুঃখ সহানুভূতি সম্পন্ন। এই সূত্র ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আদর্শ হচ্ছে কারো ব্যক্তিগত নয়, শুধু আজকের কথা নয় ইহ জীবনও নয় । এই পুণ্যানুষ্ঠান, এই পুন্য সংস্কার আনির্বাণ কাল ও জন্ম জন্মান্তরে তথাগতের ধর্মামৃত পান না করা অবধি এই সব কল্যাণ মিত্রেরা একই সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের আশ্রয়ে এসে সমাজ কল্যাণ তথা জনকল্যাণ সাধনে ও জীবন দুঃখের আত্যন্তিক অবসানে যেন হেতু সম্পদ লাভ করেন। প্রত্যয় শক্তি উপার্জন করেন।

লোকে লোকারণ্য, ভাবগম্ভীর পরিবেশ, নীরব নিস্তব্ধ বিহার প্রাঙ্গণ, এমন সময়

শ্যাম দেশীয় ধর্মীয় আমাত্যের অধিনায়ক কর্ণেল মুটুকানন্ত পরিত্রান প্রার্থনা করলেন। ধর্মাসনে উপবিষ্ট ভিক্ষু-কুল-শ্রেষ্ঠ মহাস্থবির পঞ্চশীল প্রদান করলেন। তাঁর কণ্ঠের বজ্র-নিঘোর্ষে শত শত ভক্তের ললিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠল ঃ

বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সজ্ঘং সরণং গচ্ছামি

সূত্র পাঠ আরম্ভ হল, সকলের কম্বু-কণ্ঠের স্বর লহরীর ঐক্য-তানে আকাশ পাতাল মুখরিত হয়ে উঠল। সূত্রের মধুর সুরটি ভারী অদ্ভুত। সূত্র পাঠে যাঁরা অংশ নিয়েছেন-তাঁরা হচ্ছেন অধিক সংখ্যক শ্যাম দেশীয় ভিক্ষু। সূত্র পাঠে দেখলাম, শ্যাম দেশীয় ভিক্ষুরাই জগতের প্রশংসনীয়। শত কণ্ঠের স্বর মনে হয় যেন এক কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত সূত্র পাঠে তাঁরা উচ্চাংগের শিক্ষায় শিক্ষিত বহু জনের সম্মিলিত সূত্র পাঠ ধর্ম শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু আমাদের দেশে চার জন ভিক্ষু যদি সূত্র পাঠে বসি, চার জন চার দিকে টেনে নিয়ে রওনা হই। না আছে সু-উচ্চারণ, না আছে মাধুর্য্য, না আছে ভাবাবেগের গরু গাম্ভীর্য্য। শ্রোতাদের প্রীতি কোথায়, কিংবা আপন জীবনেই বা সুত্রের মাহাত্ম্য প্রতিফলন কত দূর?

গুরু গম্ভীর মন্ত্র-ধ্বনি যেমন আকাশ স্তম্ভিত করে তোলে, মানুষের অন্তরে বিভীষিকার সৃষ্টি করে-তেমনি সূত্র পাঠের মত পাঠ হলে সূত্র-লহরীর মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে শ্রোতাদের অন্তরাকাশ ব্যাকুল করে তোলে। পাঠকগনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ-ধ্বনির সূত্র-মেঘ শ্রোতার কর্ণ কুহরে বর্ষিত হয়ে অন্তরে সিঞ্চিত ও সঞ্চিত হয়, তাতে হৃদয়ে জেগে উঠে শ্রদ্ধ একাগ্রতা ও মনসিকার প্রভৃতি যত সব কুশল মনোবৃত্তি। একমাত্র সূত্র-পাঠ ও সূত্র শ্রবণে কি পরিমান পুণ্য-সংস্কার যে বর্দ্ধিত হয়, তার কোন সীমাবদ্ধ মাপ কাঠি নেই। এ জন্য সকল শাস্ত্রেই আবৃত্তি বা স্বাধ্যায়ের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, দেশন-শ্রবণ অপেক্ষা আবৃত্তি বা স্বাধ্যায় অধিকতর গরীয়সী। অন্তরে নির্ম্মল আনন্দ ও নিরূপম পুন্য সংস্কার সঞ্চার করতে আবৃত্তি পটীয়সী। আবৃত্তির আলোকে শ্রোতা ও আবৃত্তি কারীর অন্তরে ধর্ম প্রবণতা মূর্ত্ত হয়ে উঠে।

সজ্ঘ স্থবির কিছুক্ষণ ব্যাখ্যা পরিবেশন করলেন অ-আন্তর্জাতিক ভাষায়। তা বিদেশীদের ভাগ্যে কিছু জুটল না। সোয়া ঘন্টার মধ্যে ধর্মানুষ্ঠান সমাপ্ত হল।

মন্দির থেকে বাহিরে এসে দেখি নানা-রংগে রঞ্জিত বেশ কয়েকটি উত্তোলিত পতাকা একই সারিতে উড্ডীয়মান। মৃদু মন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত। মধ্যাহ্ন আহারের পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্বের প্রতিনিধিদল পতাকা-তলে একত্রিত হলেন। পতাকাগুলো মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন চিহ্নে চিহ্নিত। সর্বোচ্চ উড্ডীয়মান বিশ্ব বৌদ্ধ

ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের ষড়-রশ্মি খচিত পতাকাটি। এই ষড়-বিধ রশ্মির রং হচ্ছে-নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠা এবং এই পঞ্চবিধ রংয়ে যুক্ত ভাবে রঞ্জিত - এই ষড় বিধ রংয়ে রঞ্জিত রশ্মি। তথাগত বুদ্ধ এই ছয় প্রকার রংয়ে রঙ্গীন ঋদ্ধি প্রদর্শন করতেন। পৃথক ভাবে ও যুক্ত ভাবে উভয় প্রকারেই প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন। তাঁর দেহ থেকে এই ষড় বিধ রশ্মি নির্গত হত। ইহাও বুদ্ধের একটি জীবন-বৈশিষ্ট। ইহারই প্রতীক হচ্ছে-এই ষড়-বিধ রশ্মি -সমন্বিত পতাকা।

বিশ্বের ৫৪টি রাষ্ট্রে ১৩২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫ হাজার লোক এই পতাকার তলে সম্মিলিত। একমাত্র তথাগত নির্দ্দেশিত মৈত্রী-করুণাকে কেন্দ্র করেই জগতের বৃহত্তম সংখ্যক মানব জাতি এই ছোট্ট পতাকাটির নীচে একত্রিত হয়েছে। এই পতাকাই নানা জাতিকে এক সূত্রে এক শরণাগতিতে সংযোগ করে রেখেছে এবং প্রেরণা যোগাচ্ছে অপরিসীম সাম্য করুণার উদ্বোধনে, বেঁধে রেখেছে ধর্ম বিশ্বাসে, পূর্ণ মানবত্ব বোধের শ্রেষ্ঠ প্রনিধানে।

ইহা বলাই বাহুল্য যে উত্তমর্ণের অধিকার ও অগ্রজের দাবী জগতে সব কালেই অগ্রনী ও যুক্তি যুক্ত অহিংস ধর্মে, পূর্ণত্ব-বিকাশে, নিটোল আদর্শে, নীতি বাদে কিংবা মানবতা বাদে এই ধর্মের মাহাত্ম্য বিশ্ব-কোষ ইতিহাসে অগ্রাধিকার লাভ করেছে।

হঠাৎ জানতে পারলাম ১৪ই এপ্রিল সোমবার পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা জিলার মূরাদনগর প্রভৃতি স্থানে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণি বাত্যার তাণ্ডব লীলা সাধিত হয়ে গেছে। তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে গেলাম। খবরে যতখানি জানা প্রয়োজন, বিদেশের বাড়ীতে থেকে ততখানি জানা গেল না। সহসা সঠিক খবর জানবার সুযোগও নেই। তাই মনে মনে বড় অস্বস্তির সহিত দিনগুলো কাটছে। মাননীয় মহাথের মহোদয় বিশেষ ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি প্রতি ঘুমেই স্বপ্নে দেখতে লাগলেন, ঢাকা বিহারের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত কাঁচ্চা ঘর গুলোর চিহ্ন নেই। বাসিন্দাদের কেউ বেঁচে নেই। হোয়ারা পাড়া একেবারে ধ্বংসী–ভূত ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর স্বপ্ন বিবরণ বার বার শুনে হাসিও পায়, দুঃখও লাগে। তাঁর কথা কি বলব? আমি নিজেও ভারী উৎকণ্ঠিত। তাঁর কথা শুনলে নিজের মনের শংকা আরো গাঢ় হয়ে যায়। আমাদের বিহার খানি বহু ভিক্ষু শ্রামন ও ছাত্রের আবাসিক প্রতিষ্ঠান। মজবুত ঘর-দরজা, দালান-কোটা একটিও নেই। এ উপলক্ষে কত কত দুঃস্বপ্ন দেখে যাচ্ছি। কিন্তু হাস্যস্পদ হব-আশঙ্কায় কারো কাছে কিছু প্রকাশ করিনি। অবশেষে একটা স্বস্থির নিঃশাস ফেললাম যে স্বপ্ন তো প্রায় সময়ই অলীক ও ভিত্তি-হীন হয়ে থাকে। তাই আমাদের বাংলা ভাষার কবি স্বপ্নের বর্ননায় বলেছেন-

অচেতনে চেতন ঘুমন্তে জাগা
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড
গোড়া নেই আগা।

তথাপি অন্তরের দুর্ভাবনা পরিস্কার ভাবে ছাড়া যাচ্ছে না। এভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। শাস্ত্রে দেখেছি-মানুষ স্বপ্ন দেখে চার কারণে। প্রথমতঃ বাত পিত্তাদি শারীরিক ধাতু যদি কোপিত হয়, তবে আবোল তাবোল স্বপ্ন দেখে থাকে। যেমন ভীষণ রৌদ্রে চলছে (পিত্ত চড়ায়)। জলে সাঁতার কাটছে (কফের প্রাধন্যে। হিংস্র প্রাণীর তাড়না খাচ্ছে (বায়ু কোপিত হলে)। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে দেখা শুনার বিষয় কিংবা চিন্তা ও কল্পনার আকর্ষণী বিষয় সম্পর্কে মানুষ স্বপ্ন দেখে থাকে। যেমন একটি লোক একদিন বোধি পূজার উদ্দেশ্যে বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিল। সে এই পূর্বে দেখা দৃশ্য স্বপ্নে দেখল। কেউ সু কিংবা কু বিষয় কল্পনা করল, সে তা স্বপ্নে দেখল। তৃতীয়তঃ অসচ্চরিত্র দেবতার কারসাজিতে মানুষ স্বপ্ন দেখে। যেমন-আসলে মারা গেছে রামের পিতা, কিন্তু কুদেবতা ঘুমন্ত লোকের সমীপে স্বয়ং গিয়ে অলক্ষ্যে বলতে থাকে আজ রাতে রহিমের পিতা মারা গেয়াছে চতুর্থতঃ পূর্বে নিমিত্ত অর্থাৎ কোন ঘটনার পূর্বাভাস স্বরূপ যে স্বপ্ন তা পূর্ব নিমিত্ত স্বপ্ন। তা ভবিষ্যতে ভবিতব্য। যেমন, কোশল রাজার ষোড়শ স্বপ্ন সবই পূর্ব নিমিত্ত। কোশর রাজ স্বপ্ন দেখলেন-একটি ঘোড়ার দুইটি মুখ। ঘোড়াটি উভয় মুখেই ঘাস খাচ্ছে। বুদ্ধ তথাগত তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন, সুদূর ভবিষ্যতে এ জগতে এমন সব সরকারী চাকুরে আসবে যারা সরকার থেকেও বেতন ভোগ করবে এবং জনগণের থেকেও ঘুষ নেবে। এই জাতীয় স্বপ্ন সাধারণ লোকে দেখে না। এরূপ স্বপ্নই সর্বতোভাবে সত্য ও সফল হয়।

জেতবন বিহারে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটার সময় আমরা কুয়ালালামপুরের অন্তর্গত অন্যন্য দর্শন-যোগ্য স্থান সমূহ দর্শনে বের হলেম। প্রথমতঃ গেলাম জাতীয় জাদুঘরে। এই জাদুঘরে যা দেখলাম তার মধ্যে নুতন কিছু দেখলাম না। মালয়েশিয়ার বর্তমান সামাজিক জীবন, গ্রাম্য জীবন, প্রাচীন ঐতিহ্যের সাধারণ নিদর্শন দর্শকগণের নয়ন গোচরে এল। প্রায়শঃ দেখা গেল রামায়ন মহাভারতে সম্বলিত কাহিনীর দৃশ্য। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ইসলামিক সংস্কৃতি সম্পর্কে যৎ কিঞ্চিত যা কিছু দেখলাম তাও পাক ভারত থেকে সংগৃহীত। পাক ভারতের যাদুঘরগুলো যেরূপ সমৃদ্ধ সেরূপ নহে। তার কারণ হচ্ছে যে দেশের অতীত যত বেশী গৌরব ও সমৃদ্ধি হয়, সে দেশ প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যে তত বেশী ভপপুর হয়ে উঠে এবং বর্তমান গুরুত্ব পুর্ন অতুল্য সম্পদে গড়ে উঠে। পাক-ভারতের বর্তমান অপেক্ষা অতীত ছিল বড় গৌরবময় ও সমৃদ্ধ। তাই যাদুঘর গুলো অতীত ও বর্তমানের নয়নাভিরাম ও গুরুত্ব পুর্ণ নিদর্শন, প্রাচীন তথ্যে পরিপূর্ণ। জাতীয় সরকার হাজার হাজার বছরের অতীত ধর্ম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এবং বর্তমান আশ্চর্য্য নিদর্শনকে পাক্কা গৃহে আবদ্ধ করে রেখেছেন।

যাদুঘর দর্শন করে আমরা গেলাম একটি হোটেল দর্শনে। ইহার নাম ফেডারেল হোটেল। প্রথমতঃ মনে হল-হোটেলে আর কি দেখব? না হয়, বড় লোকে থাকা খাওয়ার জাঁক জমক সমারোহ দেখব। তা দেখে কি লাভ হবে? কিন্ত ইহার ভিতরে

প্রবেশ করে দেখি এই হোটেল নানা দিক দিয়ে বড় বৈশিষ্ট পূর্ন। ইহা আকারে গোল। দেখতে অতি মনোরম। গঠন প্রণালী অতীব চমৎকার। হোটেল খানির দোতলায় উঠতেই চক্ষে পড়ল বিদ্যুৎ চালিত সোপান (Escalatar) পাশাপাশি দুইটি সোপান। দর্শকেরা একটায় উঠছে আর একটায় নামছে। সিঁড়ি দুইটি অবিরাম চলছে। আমার চক্ষে তো এ দৃশ্য অপুর্ব্ব। আনন্দে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়ে উঠল। হঠাৎ সিঁড়ির এক ধাপে পদার্পন করার আধা মিনিট পরেই দোতালায় গিয়ে পৌছলাম। অনেক্ষণ চলন্ত সিঁড়ির দিকে লুব্ধ নজরে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম বস্তু বিজ্ঞানের কি ছমৎকার নিদর্শন।

অতঃপর দোতলার থেকে পাঁচ তালায় গিয়ে উঠলাম লিপটে করে দেখলাম হোটেলটির নমুনা সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার মাঝখানে ভাণ্ডার খানা, বাবুর্চী খানা। পরিচারক-পরিচারিকাদের নানা বিধ কর্মস্থল। হোটেলের চার দিকে কুণ্ডলাকারের মনোরম বারান্দা। এই বারান্দাই হচ্ছে হোটেলের ভোজনালয়। অভ্যাগত অতিথিগণ আরাম করবেন, আহার করবেন- এই বারেন্দায়। বারান্দার বহিঃদেশে কোন পাঁচিল কিংবা আবদ্ধ আরক্ষা কিছু নেই। আগন্তুকদের জন্য গোলাকারে সজ্জিত চেয়ার টেবিল। টেবিলগুলো চা, কফি ও নানান আহার্য্যে ভর্ত্তি। প্রতিনিধিদল চারদিক ব্যাপী বসলেন। আমরাও পুর্ব পাশে এক টেবিলের সামনে আসন গ্রহণ করলাম। হঠাৎ চক্ষে পড়ল হোটেলের দেহখানি আমাদিগকে কাঁধে করে সম্বূক গতিতে ঘুরছে। এই ঘোরা অবিরাম। ইহার শেষ নেই। সিঁড়ি দেখলাম উপরে নীচে চললাম। আর এই পাঁচ তালায় দেখছি-হোটেল অবিরত ঘূর্ণয়মান। এ সব দেখে কেবল যে বিস্মিত হয়েছি তাও নয়, অন্তরে অপুরন্ত আনন্দ, শিক্ষা ও বিপুল ভাবের উন্মেষও সৃষ্টি হলো। অনন্ত র এক কাপ চা পানের সময়ের মধ্যে চারিদিক ঘুরে এলাম। ফলে এক নজরে চোখে আসল কুয়ালালামপুর মহানগরী সমগ্র দৃশ্য। চিত্র-বিচিত্র উচ্চ-নীচ শত শত সৌধ মালা আপন গাম্ভীর্য্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য রাজপথ। তার মধ্যে পিপড়ার মত চলমান যান বাহন। গমনাগমনে নিরত অসংখ্য জনতার ভিড়। নয়ন জুড়ানো শহর শহর তলী, পাহাড় পর্ব্বত, নদী নালা, খাল বিল সবই চোখে পড়ল। হোটেলটি যেমন অবিরাম গূর্ণায়মান, ভ্রাম্যমান তেমনি জগতের সব কিছুই তো চলন্ত ভ্রাম্যমান চলছে কর্মব্যস্ত মানব নিচয়। গাড়ী-ঘোড়া যান-বাহন, পশু-পক্ষী-পতঙ্গ প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি প্রাণী তার নিজ নিজ জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে নৈদন্দিন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন করে চলেছে। কর্ম প্রবাহ অফুরন্ত নিরবশেষ কর্ম প্রবাহের পরিসমাপ্তি বিদ্যমান নেই।

অনন্তাকাশে অফুরন্ত বায়ূ রাশি। কি মুক্তাকাশে, কি বদ্ধ বস্তুতে, কি দেহের অভ্যন্তরে বায়ুর অনুক্ষণ চলাচল জগতের সর্বত্র। শাস্ত্রে আছে-মুক্তাকাশ অপেক্ষা দেহের অভ্যন্তরীণ বায়ুর গতিশীলতা অধিকতর দ্রুত। বায়ু-শূন্য স্থান জগতে এক

বিন্দুও নেই। বায়ু ব্যতীত জীবের জীবন-সত্তা এক মুহুর্তের জন্য বেঁচে থাকা দায়। জগতের এই অপরিহার্য্য বস্তুটি নিত্য-চলন্ত।

এই অবিরত চলমান বায়ু প্রবাহের মত জল রাশিও জগতে বিদ্যমান। জল ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব থাকে না। জগতে এমন কোন স্থান বর্তমান নেই যেখানে জলীয় প্রবাহের অভাব। আমরা যে স্থানকে মনে করি-অতিশয় কঠিন, অতিশয় শুষ্ক; তাতে ও সুক্ষ ভাবে জল-প্রবাহ বিদ্যমান। শিলাময় পর্বতকে মনে হয় জল শূন্য। বস্তুতঃ তাতেও অতি সুক্ষভাবে বায়ু ও জলের অস্তিত্ব রয়েছে। জল প্রবাহ সদা সর্বত্র প্রবাহমান।

কাল হচ্ছে কাল্পনিক পদার্থ। কাল বলতে জগতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। মানুষের প্রয়োজন-বোধে মানুষ কালের কল্পনা করেছে-দিন, রাত, বার, মাস, বৎসর, যুগ, ঋতু, আয়ু ইত্যাদি কালকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন নামকরনে মানুষ আপন প্রয়োজন মিটাবার জন্য নির্বাচন করে নিয়েছে। আবার কালের প্রতি অতীত অনাগত-বর্তমান প্রকার ভেদে জগৎ শুদ্ধ সকলের সম্মতি আছে। সর্বজন বিদিত বিশ্বাস রয়েছে। সকলের তাতে প্রয়োজন। কাল বলতে বস্তুতঃ কিছু না থাকলেও মানুষের জীবন কাল প্রভাবে অহঃরহ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে কালকে মহান সর্বব্যাপী বলে মানতে হয়। স্বীকার করতে হয় কাল অনাদি অনন্ত। কালের অবিরত ঘুর্ণন এই হোটেলটির ঘুর্ণনের ন্যায় প্রত্যক্ষ নয়। প্রথমেই বলেছি-কাল প্রত্যক্ষ-গোচরী ভূত কোন পদার্থ নয়।

শাস্ত্রে আছে, কাল বিশ্ব চরাচরকে গ্রাস করে জরাজীর্ণ করে, খেয়ে ফেলে। অথচ নিজেও স্থির থাকে না। বিশ্ববাসীর সঙ্গে নিজেও অতিক্রান্ত হয়ে যায়। অবিশ্রান্ত চলে যায় অসীমের পানে। তার গতির ফাঁক নেই, বিরাম নেই কোন চিহ্ন থাকে না। এ জন্য ইহা মনুষ্য সমাজে কাল-প্রবাহ নামে আখ্যাত। প্রত্যেকটি জীবনের জীবন অনাদি-অনন্ত কাল প্রবাহে একটি সসীম সাতিশয় ক্ষুদ্র বিন্দু বিশেষ। তাতে আবার জন্ম-জরা মৃত্যু রয়েছে। আয়ু-ভোগ, আহার-বিহার, হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ-এই গুলোও জীবনের অপরিত্যাজ্য অঙ্গ। জীবন থাকলে এগুলো থাকবেই। জন্ম বলতে শুধু জন্মান্তরহীন এক জন্ম নয়। আর একবার মৃত্যু হলেই সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেল না। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার জন্ম। জীবন প্রবাহ জন্ম-মৃত্যুর আকারে 'ভাসিয়া', 'ডুবিয়া', ভাসিয়া, ডুবিয়া, নিত্য প্রবাহমান। জ্ঞানীগণ এই আদ্যন্ত-বিরহিত জীবন ধারাকে সংসার প্রবাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় আলোচনা না করলে আলোচ্য বিষয়টি যেন অপূর্ণ থেকে যায়।

বাহ্যিক দৃশ্যমান জগতের সকল পদার্থ যেমন চলমান, ভাসমান, লোক চক্ষুর অন্তরালে শব্দ-শ্রুতির অতীত তেমনি অন্তর জগৎ নামে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আছে যা আমরা এখন বুঝবার চেষ্টা করব।

এই ক্ষুদ্র পরিসর হোটেলটা যেমন নিত্য ভ্রাম্যমান, জড়-অজড় সমস্ত দৃশ্যমান জগতটা যেমন অহরহঃ ঘুর্ণায়মান, কোন পদার্থই যেমন অচল অটল নিত্য ধ্রুব শাশ্বত নহে, সবই নিত্য পরিবর্তন-শীল, প্রবাহমান তেমনি অন্তর্জগতে চিত্ত ও চিত্ত-বৃত্তি সকল কিরূপে সর্বক্ষণ ভ্রাম্যমান, চিত্তের ভ্রমণ-মণ্ডল বা কক্ষ-পথ কিরূপ, চিত্তের পরিক্রমার উৎসই বা কি, তা আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

সূর্য্য ও তার গ্রহ-উপগ্রহাদি বিরাট পরিবার নিয়েই সৌর-জগত। এই বিরাট পরিবার সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মহাশূণ্যে ছুটে চলছে নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দ্দিষ্ট গতিতে স্বাভাবিক বিধানে। গ্রহ-উপগ্রহাদি পরিবার সূর্য্যকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য্যের আকর্ষণে সবই আকর্ষিত, সূর্য্যের আলোকে সবই-আলোকিত। সূর্য্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহাদির এই পরিক্রমন, পরিভ্রমণ তা নিয়ত প্রতিনিয়ত। এই পরিভ্রমণের আদি অনির্ণেয় তাই উহা অনাদি। অন্ত বা পরিসমাপ্তি যে কখন ঘটে তাও মানব-বুদ্ধির অতীত-তাই ইহা অনন্ত। অনাদি অনন্ত-জড় জগতের পরিক্রমণ পরিভ্রমণই তার স্বরূপ, স্বাভাবিক বিধান।

অন্তর্জগৎ বলতে সাধারণতঃ চিত্ত ও চিত্ত-বৃত্তি বুঝায়। চিত্ত তার সহজাত বৃত্তিগুলোকে নিয়ে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও হৃদপিণ্ড-এই ষড়েন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপ, শব্দ, গন্ধ,রস, স্পর্শ ও ভাব্য বিষয়কে অবলম্বন করে ছুটে বেড়াচ্ছে। বন্য বানর যেমন বনের মধ্যে বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে লম্ফের পর লম্ফ দিয়ে চলতে থাকে, তার আহার অন্বেষণ করে বেড়ায়, চিত্তও তেমনি তার সঙ্গীগণকে সঙ্গে নিয়ে রূপ থেকে শব্দে, শব্দ থেকে গন্ধে, গন্ধ থেকে রসে, রস থেকে স্পর্শে, স্পর্শ থেকে ভাব্য বিষয়ে ঘুরতে থাকে। আমাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় চিত্তের আগমন-নির্গমন পথ। দুর্বল ব্যক্তির যষ্ঠির উপর ভর দিয়ে উঠার ন্যায় চিত্ত চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেই তার রূপাদি ইচ্ছিত বস্তুর সন্ধানে ভোগ-পিপাসার চরিতার্থ করার মানসে ভোগ্য-বস্তুতে ঝু'লে ঝু'লে বেড়াচ্ছে। রূপাদি বিষয় চিত্তের জীবিকা নির্বাহের ভোগ্য বস্তু। চক্ষুদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি বিষয় আর চিত্ত-এই তিনের সংযোগে যে চিত্ত-ক্রিয়া চলছে, ইহার বিরাম নেই, তৃপ্তি নেই, অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা নিয়েই চলছে। ইহাকে বলে চিত্ত-প্রবাহ। এই ইন্দ্রিয় ও বিষয় বস্তুই চিত্তের ভ্রমণ-মণ্ডল বা কক্ষ-পথ। নদীর স্রোতের ন্যায় অবিরাম গতিতে প্রবাহমান এই চিত্ত। জগতের যত সব প্রাণী-এই চিত্ত-ক্রিয়ারই দৃশ্যমান প্রতিমূর্ত্তি। আমরা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করি, যে সকল বাক্য প্রয়োগ করি,-সেই সব কার্য্যাবলী বা বাক্য-বিন্যাস অন্তর্নিহিত চিত্ত ক্রিয়ারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র। জীবনের সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, জীবন-মরণ-এক কথায় জীবন-সর্বস্ব এই চিত্ত ক্রিয়াটির উপরই নির্ভর। আমরা কোন একটি ঘটনাকে বিচার করি, তার কারণ উদ্ধার করি, ন্যায়-অন্যায়, নির্ধারণ করি-এ সব

ঘটনা বাহিরে প্রকাশ পাওয়ার আগেই চিত্ত-ক্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত হয়ে গেছে।

এই চিত্ত-ক্রিয়ার যে প্রবাহ-ইহাকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা কার্য্য-কারণ প্রবাহ নামেও আখ্যা দিয়েছেন। প্রবাহের পূর্বান্তে যে কারণ গঠিত হয় উত্তরান্তে তাই কার্য্য-রূপে প্রতিফলিত হয়। ইহা কর্ম ও ফলের আকারেও বর্ণনা করা হয়েছে। ইহাতে যে রূপ বীজ বপিত হয়, সেরূপ ফলই ফলে। আম্রে আম্র মাকালে মাকাল। এই কর্ম ও ফলের আদি অনির্ণেয়। বীজ বৃক্ষ কিংবা ডিম-মুরগীর আদি নির্ণয় যেমন অসম্ভব-এই চিত্ত প্রবাহের আদি নির্ণয় করাও তেমনি সম্ভবপর নহে। এ জন্য ইহা অনাদি। যত দিন আর্য্য নীতির সাধনায় ইহার মূল নির্ধারণ করা না যায়, মূলোচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে সাধিত না হয়, ততদিন এই প্রবাহ অনন্ত কালাবধি চলতে থাকবে। ইহার অন্ত বা বিরাম কখনও হবে না। তদ্ধেতু এই প্রবাহ অনন্ত। আমরা এই অনাদি-অনন্ত প্রবাহে কর্ম ও ফলের প্রভাবে জন্ম-মৃত্যুর আকারে সংসার সমুদ্রে ভাসিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া ডুবিয়া অসীমের পানে চলছি। আমরা চলমান দুনিয়ায় অসীম অনন্ত পথের চলমান পথিক।

গ্রহ উপগ্রহাদি অবিরত চলমান সৌর-জগতের যেমন একমাত্র উৎস-সূর্য্য, তেমনি ভ্রাম্যমান প্রাণী জগতের একমাত্র কারণ চিত্ত প্রবাহের মূল উৎস-অবিদ্যা মোহ। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে প্রাকৃতিক জগৎ স্বাভাবিক নীতিতে গতিশীল। এই নিয়ত গতির অন্তঃসাধন অসম্ভব। প্রাণী জগতের অবস্থাও কি তাই? তা হলে জীবের চির শান্তির অবকাশ কোথায়? কিন্তু প্রাণী জগতের কথা স্বতন্ত্র; যেহেতু প্রাণী জগতের নিজস্ব প্রয়োজন-বোধ আছে। ইচ্ছা-শক্তি আছে। নৈসর্গিক জগতের তা নেই এবং হতেও পারে না। মানুষ প্রয়োজন-বোধ করলে তার ইচ্ছা-শক্তি প্রভাবে জীবন-প্রবাহের অন্তঃসাধন করতে সক্ষম।

যাক, একটি হোটেলকে উপলক্ষ্য করে অনেক কিছু বললাম। ভ্রমণ বৃত্তান্তে তত্ত্ব কথার বুলি আওড়ালাম। ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে ফেললাম বলে ভয়ও পাচ্ছি। আশা করি সুধী পাঠক সমীপে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হোটেল দর্শনের পর আমরা গেলাম কুয়ালালামপুর নগরীর ইট খোলা বেরহলা রোডে অবস্থিত সিংহল দেশীয় বুদ্ধ-মন্দিরে। তখন বৈকাল ৫টা। মন্দিরের অধ্যক্ষ ও তাঁর সহ কর্মিগণ একটি হল-গৃহে সমগ্র প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা পূর্ব-বসতে দিলেন এবং চা পানে আপ্যায়িত করলেন। অতঃপর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলেন বোধি বৃক্ষ মুলে। বোধি-বৃক্ষটি এরূপ সুসজ্জিত ও সুগঠিত যে দেখতে ভ্রম লেগে যায়। ইহা কি মনুষ্য বুদ্ধির কারু কার্য্য-না স্বতঃ উত্থিত উদ্ভিদ? ইহার মূলে পিত্তলময় অনতি বৃহৎ একটি মনোরম বুদ্ধ মুর্তি দেখতে পেলাম। এই মুর্তি নাকি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর দান। একদা তিনি মালয়েশিয়ায় ভ্রমণে এসে এই মুর্তি দান করেছিলেন। বোধি-বৃক্ষের সম্মুখে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড

প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণোপরি সজ্জিত কুণ্ডলাকার আসনে আমরা সবাই আসন গ্রহণ করলাম। বৌদ্ধ ভক্তগণ পঞ্চশীল গ্রহণ করলেন। পঞ্চশীল প্রদানে ছিলেন-এই বিহারাধ্যক্ষ মাননীয় কেধর্ম্মানন্দ স্থবির। পণ্ডিত প্রবর কে, ধর্ম্মানন্দ স্থবিরের নাম যশ বহুদিন আগের থেকে শুনে এসেছি। তাঁর লিখিত বহু পুস্তক পাঠ করেছি; কিন্তু তাঁকে কিংবা তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করার সুযোগ সৌভাগ্য ইতি পূর্বে পাইনি। আজ সব কিছু দর্শন করে ধন্য হলেম। তাঁর পরিচালনায় এই বিহারে দুইটি প্রতিষ্ঠান গঠিত। শাসন অভিবর্দ্ধন সোসাইটি এবং বৌদ্ধ মিশনারী সোসাইটি। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় কে. ধর্ম্মানন্দ স্থবির মালয়েশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতি তিন মাস অন্তর The Voice of Buddhism নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করে আসছেন। প্রত্যেক সংখ্যায় বিশেষ প্রখ্যাত মনীষিবৃন্দ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা দিক আলোচনা করে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। ইংরেজী ভাষা ও চীনা ভাষায় শতাধিক পুস্তক ও প্রতিষ্ঠান থেকে এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। একটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী দর্শকের নয়ন-গোচরে আসে। তাছাড়া ধর্ম-শিক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা প্রভৃতি প্রচার মূলক কর্মের আয়োজন প্রায়শঃ করা হয়। সুতরাং এ কথা সর্বতো ভাবে স্বীকার্য্য যে মাননীয় কে. ধর্মানন্দ স্থবিরের বিহারটি মালয়েশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম-সাধনার ও প্রচারের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচালিত।

সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় আমরা পান্তাই উপত্যকায় শিক্ষক-শিক্ষন কলেজ হোষ্টেলে ফিরে এলাম। আজ সকাল ৭টার সময় নোটিশ বোর্ডে লিখিত ঘোষণা চোখে পড়েছিল যে অদ্য প্রেক্ষাগৃহে রাত্রি ৮-৯টার মধ্যে এক ঘন্টা সিংহল দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ জি, পি, মলল শেখর বক্তৃতা করবেন। বোর্ডে ঘোষণা দেখে-অন্তরে বড় উৎসাহ জাগল। শুধু একটা আশঙ্কা-এত বড় পণ্ডিতের ইংরেজী ভাষার বক্তৃতা আমি বুঝব কিনা। তথাপি অন্তরে এরূপ আশা-নিরাশার দ্বন্ধ নিয়ে যথাসময়ে সভা-গৃহে উপনীত হলেম। সভায় সদস্য-মণ্ডলী সবাই সমবেত। পণ্ডিত মহোদয় সভা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার বাক্যামৃত পরিবেশন করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। জগৎ যে দুঃখ-পূর্ণ, জগতের দুঃখ-রাশি যে প্রাণী-রূপে জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে নিত্য প্রবাহমান তারই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন প্রাণীগণের জীবন দুঃখের একটা মহাসমুদ্র বিশেষ। দুঃখ ভোগে মর্ম্মদাহে জীবন প্রতি-নিয়তই জ্বলমান। জ্বলন্ত জীবনে প্রতি মূহুর্তে সুখের সন্ধান। সুখের প্রত্যাশা করে সুখ-লাভের প্রকৃত পন্থা পায় না বলে আবার দুঃখে পতিত হয়। ফলে সুখের প্রত্যাশায় দুঃখ ভোগই চলতে থাকে। ক্ষণ-স্থায়ী জাগতিক সুখের একটা আপাতঃ মাধুর্য্য আছে। বস্তুতঃ উহা দুঃখের সুখোস মাত্র। যে বস্তুর দাহ আছে, জরা-ব্যাধি আছে, পচন-গলন-মরণ আছে তাতে যে সুখের সাময়িক অনুভূতি তা কিরূপ? মরুর মরীচিকায় যেমন তৃষ্ণার্ত জীবের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগায়। বড়শীতে আধার যেমন মৎস্য কুলের লুব্ধ রসনা আকর্ষণ করে, ক্ষুর ধারে লেপিত মধু যেমন অন্তরে লোভের উদ্রেক করে, তেমনি দুঃখ-পূর্ণ জগতে সুখের

কল্পনাটি দুঃখের অলীক স্বপ্ন স্বরূপ। তৃষ্ণার তাড়নায় দুঃখ-সুখ স্বপ্নরূপে প্রতিভাত হয়। যা অনিত্য, নিত্য পরিবর্তনশীল, নিঃসার ও দুঃখ ময়-তা ধ্রুব, শাশ্বত, অবিনশ্বর বলে মনে করা দিগ্‌ভ্রান্ত লোকের ন্যায় বিপরীত দিক দর্শন মাত্র।

জগতে অস্তিত্ব-সম্পন্ন বস্তু মাত্রেরই কারণ বিদ্যমান থাকবে। কারণ ছাড়া জগতে কোন কার্য্য হয় না। জগৎ কার্য্য-কারণ-সম্বন্বিত যৌগিক পদার্থ মাত্র। জীবন দুঃখের পিছনেও কারণ আছে। কারণ বশতঃই এ জীবন দুঃখের প্রবাহ। তৃষ্ণা বা কামনা-বাসনাই এই প্রবাহের মূল। রূপ-রস গন্ধাদি উপভোগ-এই তৃষ্ণার লক্ষণ। এই তৃষ্ণার ন্যায় আরেকটি মূল নিদান আছে-যাকে আমরা বলি অবিদ্যা। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বশতঃ মানুষ সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, অনিত্যকে নিত্য, নিত্যকে অনিত্য অর্থাৎ একটি পদার্থের প্রতি যথার্থ দর্শন না করে তার বিপরীত দর্শন করে। বিপরীত দর্শন করে বলেই কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয়। বাসনার তাগিদে লালসার চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে রূপে রসে আকৃষ্ট হয়। এভাবে পুনর্জ্জন্মের কারণ গড়ে উঠে। পুনরায় হলেই জীবনের সকল দুঃখকে আহরণ করা হল। কাজেই এক কথায় বলা যেতে পারে যে অবিদ্যা তৃষ্ণাই জীবন দুঃখের মূল কারণ।

যে কোন বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ নামে দুটো পিঠ থাকে। শুধু এপিঠ কিংবা ওপিঠ অর্থাৎ একপিঠ নিয়ে কোন বস্তু সত্তা বিদ্যমান নেই। জীবন থাকলে মরণ নিশ্চিত। অন্ধকার আছে বলে আলোক অবশ্যম্ভাবী। রাত-দিন, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিধানে বিপরীতার্থক বস্তুর অস্তিত্ব থাকবেই। নিত্য অশান্তি-কর জীবন-দুঃখের একটা সত্তা যখন রয়েছে-তার বিপরীত একটা শাশ্বত শান্তির প্রতি ছবি অবশ্যই থাকবে। হেতু বা কারণ নিরুদ্ধ হলেই কার্য্য নিরুদ্ধ হয়ে যায়। ঘুরন্ত চক্র যেমন পূর্ব-শক্তি ক্ষয়ে নব শক্তির প্রয়োগ না ঘটলে আপনা-আপনি ঘুর্ণন বন্ধ হয়ে যায়; তদ্রুপ পূর্বাগত তৃষ্ণা-ক্ষয়ে ও নূতন তৃষ্ণার উদ্ভব না ঘটলে জীবন-দুঃখ আপনা-আপনি নিরসিত হয়, ধ্বসে যায়।

জাগতিক (১) দুঃখ ও দুঃখের কারণ (২) অবিদ্যা-তৃষ্ণা, অবিদ্যা-তৃষ্ণার ধ্বংস-দুঃখের অবসান নামে (৩) যে নির্বান এই ত্রিবিধ সত্য জগতে চির-সত্য, স্বতঃসিদ্ধ। এগুলো যথারীতি পূর্বেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। চন্দ্র-সূর্য্য, অনিল-অনল ইত্যাদি জগতের নৈসর্গিক সংস্থানের ন্যায় পূর্বোক্ত দুঃখ, দুঃখের কারণ ও দুঃখ-নিরোধ-এই ত্রিবিধ সত্য আধ্যাত্মিক সংস্থান। এগুলো চির-বিদ্যমান। এই ত্রিবিধ সত্যকে সম্যক উপলদ্ধি করতে হলে যে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার প্রয়োজন, যে প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য্য কর্তব্য, যা দুঃখ-মুক্তির একমাত্র উপায় তা হচ্ছে-তথা গত আবিস্কৃত ও প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গ সমন্বিত ধর্ম। এই ধর্ম-সাধনায় মানুষ দুঃখের উপলদ্ধি, অবিদ্যা-তৃষ্ণার মূল উৎপাটন ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। বিশ্ব-মানব কল্যাণে ভগবান তথাগতেরই একমাত্র অবদান এই অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট ধর্ম। মানুষ যদি জীবন-দুঃখের অবসান ঘটাতে চায়, চির-শান্তি লাভ করতে চায়,-তবে বিশ্বে

ইহাই একমাত্র পন্থা। বিশ্বের মানব সমাজে ভগবান তথাগতের এই দান অতুল্য অদ্বিতীয়। তথাগতের ঐতিহাসিক জীবন-বিগ্রহ মহাকালে অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। কিন্তু গুণ-বিগ্রহে পরিপূর্ণ ভাসমান সোনার তরী মহাকাল স্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলছে। তার ক্ষয় নেই,ব্যয় নেই।

ডক্টর মলল শেখর দীর্ঘ বক্তৃতায় এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে দুঃখে পরিপূর্ণ জগতে মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজন কিরূপ? ধর্ম ক্ষেত্রে বিশ্ব মানবের জন্য তথাগত বুদ্ধের অবদান কতটুকু? তিনি চতুরার্য্য সত্যকে ভিত্তি করেই সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। এরূপ মনোমুগ্ধ-কর বক্তৃতা সাধারণতঃ হয় না। আমি অতীব মুগ্ধ হলেম। প্রথমতঃ বিখ্যাত পণ্ডিত বলে তাঁর বক্তৃতার প্রতি আমার আশঙ্কা ছিল যে আমি বুঝি কিনা। কিন্তু অবশেষে আমার এই প্রতীতি জন্মিল। যে তাঁর বক্তৃতা নবম-দশম মানের ভাল ছাত্রেরাও বুঝতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে এই বলে তিনি বক্তৃতা সমাধান করলেন - "আমি এ পর্য্যন্ত যথা সাধ্য বলবার চেষ্টা করেছি, এখন আপনারা তা বিচার করুন। আমার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস্য থাকলে জিজ্ঞাস করতে পারেন।" ডক্টর মলল শেখর বক্তৃতা মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করতে না করতেই ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ রাজ-ভোজ এক প্রশ্ন করলেন যে বুদ্ধকে অবতার মানা যায় কিনা? আত্মা শাশ্বত কি অশাশ্বত?

ডক্টর মলল শেখর আবার মঞ্চোপরি গিয়ে শুধু দু'টু কথায় জবাব দিয়ে দিলেন যে বুদ্ধকে অবতার মানা যায় না এবং আত্মা শাশ্বত নয়, অশাশ্বত। আমি আশা করতে পারিনি যে তিনি এত সংক্ষিপ্ত জবাবে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির বহু কালের গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্নের বিষয়টি শেষ করে দিবেন। মনে করলাম তিনি জবাবটা একটু বিচার বিশ্লেষণ করেই বলবেন। এই প্রশ্নটা শুধু যে মিঃ রাজ ভোজের প্রশ্ন-তাও তো নয়, ইহা ৬০ কোটি ভারতবাসীরই প্রশ্ন বৌদ্ধ ধর্মে নবাগত হলেও মিঃ রাজ ভোজ আজীবন যে সংস্কারে আবদ্ধ-এই প্রশ্ন তো সেই মজ্জাগত সংস্কারের। বিশেষতঃ মহাযানী বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে প্রায় অবতার পর্য্যায় ভুক্ত করে ফেলেছেন। সভায় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন মতবাদের লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও অবগত হতে পারতেন যে থেরবাদী বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে কেন অবতার রূপে মানেন না এর আত্মা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং জবাবটা এক্ষেত্রে অতিশয় গুরুত্ব সহকারে বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক দেওয়া উচিৎ ছিল। এখানে শুধু এটুকু বলা উচিৎ মনে করি যে অবতার বাদ ও আত্মা-বাদ একই অর্থ ও একই পর্য্যায়ের মতবাদ। একটিকে স্বীকার করলে অপরটিও এসে পড়ে এবং একটিকে অস্বীকার করলে উভয়েই অস্বীকৃত হয়। কাজেই বুদ্ধকে অবতার স্বীকার করলে আত্মাকে শাশ্বত অবিনশ্বর বলে মানতে হয়।

সভা ভঙ্গের পর হোষ্টেলে ফিরতে রাত্রি বেজে গেল ১০-৩০টা। সারা দিনের ছুটাছুটিতে খুব ক্লান্তি-বোধ হচ্ছিল। মনে করলাম হোষ্টেলে গিয়েই দেহখানি সযত্নে

পাতানো বিছানায় এলিয়ে দেব। কিন্তু তা আর হল না। হোষ্টেলে গিয়েই দেখি পাকিস্তান এম্বেসীর সেই বন্ধু মোশারেফ হোসেন সাহেব এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা সেরে নিতে এবং থাইল্যাণ্ড যাওয়ার ভিসা ফরম পূরণ করতে মধ্য রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে গেল। হোসেন সাহেব আমাদের তিনটি পাসপোর্ট সহ পূরণ-করা ফরমগুলো নিয়ে গেলেন। তিনি থাই-এম্বেসীতে এগুলো দুএক দিনের মধ্যে দাখিল করবেন। আমরা তাঁর থেকে এই আশ্বাস ও পেলাম যে পিনাঙ্গ থেকে ফিরে এসে থাইল্যাণ্ডের ভিসা শুদ্ধ পাসপোর্ট গুলো পেয়ে যাব অতঃপর শয্যা গ্রহণ করলাম অমনি পাশের কামরায় ঠাস্ ঠাস্ সজোর শব্দ শুরু হল। বিকট শব্দের দাপটে কেউ ঘুমোতে পারলাম না। শয্যা ছেড়ে গিয়ে এদিক ওদিক দেখি, কিছুই দেখতে পাই না শুলেই ভীষণ শব্দ শুরু হয়। পাশে কয়েকটি কামরা খালি ছিল। এ খালি কামরাগুলো একে একে সব দেখলাম, কোন হদিস পাওয়া গেল না। শুধু সভই চিত্তের ভাবনা, কোন অমনুষ্যের শব্দ নয় তো? দেখতে দেখতে হঠাৎ এক কামরায় ঢুকে দেখি, মিঃ রাজ ভোজের সহ ধর্মিনী দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছেন। স-সম্ভ্রমে চুপটি মেরে এসে পড়েছি। একজন ভদ্র মহিলার প্রকোষ্ঠে এত গভীর রাত্রে একজন ভিক্ষুর প্রবেশ যদি ভদ্র মহিলা আমাকে দেখতে পেতেন তবে কি যে গতি হত আমার। অবশ্য ভদ্র মহিলা বৃদ্ধ-বয়স্কা, বেশ মোটা সোটা, ভব্যা-সভ্যা। চেহারা দেখলে অন্তরে মাতৃ ভক্তির সঞ্চার হয়।

বিনিদ্রার বিরক্তি এতক্ষণ অন্তর গহনে তলিয়ে গিয়েছে এবার রীতিমত ভীতি ও আতঙ্কের ঘন ছায়া অন্তরে ভেসে উঠছে। এত রাত্রি, বারবার ভয়ঙ্কর শব্দ। কিসের এ শব্দ? কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আমি আর মাননীয় মহাথের একই কামরায় ছিলাম বলে বিশেষ অভিভূত হই নি। আমাদের বাবু ডি, পি, বড়ুয়া ৯নং কামরায় একক ছিলেন। এত দিন তো দিব্যি আরামে ছিলেন; কিন্তু আজ তিনি এ সব উপদ্রবে ৯নং কামরা ছেড়ে ১১ নং কামরায় চলে গেলেন। সম্ভবতঃ সেই কামরায় দোসরা কেউ ছিলেন।

এ ভাবে রাত্রি আর আমাদের ভাল কাটিল না। শেষ রাত্রির দিকে কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রিত হয়ে পড়েছিলাম মাত্র, ভোরে শয্যা-ত্যাগে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

কুয়ালালামপুর আমাদের অবস্থান পুরোপুরি চার দিন হয় নি। কুয়ালালামপুর-মালয়েশিয়ার রাজধানী। আয়তন ও লোক সংখ্যায় বুঝা গেল করাচি থেকে বড়। দালান কোঠা ঘর-বাড়ীতে বোঝাই। এখানে বহু ধর্ম বহু জাতি, বহু গোত্রের লোক বাস করেন। আমরা এখানকার ছোট বড় বহু লোকের সাহচর্য্য লাভ করেছি। প্রত্যেকটি লোকের ব্যবহার বড় অমায়িক। তাঁদের আচরণে রয়েছে কোমলতা, নমনীয়তা। তাতে আমরা মুগ্ধ হয়েছি তাঁদের সেবা যত্নে ও অতিথি সৎকারে আমাদিগকে এত আপ্যায়িত করেছে-যা জীবনে ভুলবার কথা নয়। পুরুষ মেয়ে ভেদ নেই, সকলেই

কর্ম প্রবন। তাঁদের সৌজন্য দেখলে রীতিমত অবাক হতে হয়। আমরা যে তাঁদের তুলনায় বহু দুরে এ সব অবস্থা দর্শনে আমাকে একটা বাজে ভাবনায় পেয়ে বসল। প্রশ্ন জাগল বিদেশাগত মহান অতিথিদের প্রতিই মালয়েশিয়ানদের এরূপ আচরণ? না এটা তাঁদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য? এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেল সর্বত্রই। তাঁরা শুধু-বিদেশীর প্রতি ভদ্র নয়, নম্র নয়-নিজেদের মধ্যেও একে অন্যের প্রতি অমায়িক ব্যবহার করে থাকেন হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্বত্রই লক্ষ্য কলাম-তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ঠ্যই এরূপ। তাঁদের স্বভাবগত ও মজ্জাগত চরিত্রেই বিনম্র ব্যবহার। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলো যখন সান্নিধ্যে আসে, তাদের আদব-কায়দায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এ সব কঁচি প্রাণের শিশুগুলোই তো তাদের মাতা-পিতা, পরিবার ও সমাজের প্রকৃত পরিচয়। প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ে যে একেকটি আদর্শ পরিবারের প্রতীক তাতে সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

তাই বলে তাঁদের দেশে যে হীন-নীচ প্রকৃতির লোক কিংবা মিথ্যা, চুরি, অত্যাচার, ব্যভিচার যে একেবারে নেই তাও নয়। তবে এ সব দুর্নীতি কম, খুব ক্বচিৎ। মানুষ অনেক সময় মাতৃ-ভূমির আনুগত্য রক্ষা ও স্বজাতির মর্যাদা অক্ষুন্ন ভাবে রক্ষা করতে গিয়ে অতিশয় উক্তি করে থাকে। আমরা ধর্ম-প্রাণ মালয়েশিয়াবাসীর নিকট যেমনি শুনেছি, মালয়েশিয়া প্রবাসী বন্ধু-বান্ধবের কাছে তেমনি নির্ভরযোগ্য খবরে জানতে পারলাম যে বিরল দুর্নীতির খবরটা অসত্য বা অতিশয় উক্তি নহে। তা না হলে তাঁরা এত উন্নতি করত না। তাদের অগ্রগতিই নিয়ম শৃঙ্খলা ও সততার পরিচায়ক। আকাশে ধুম-কেতুর অগ্রভাগ দেখে ধুম্রের গোড়ার আগুনের অস্তিত্ব কল্পনা যেমন একান্ত ও যুক্তি-সঙ্গত তেমনি মালয়েশিয়ানদের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে তাঁদের জাতীয় চরিত্র ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যায়। এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ যে দুর্নীতিপরায়ন কোন জাতির উন্নতি তো দুরের কথা, দুনিয়ায় বেঁচে থাকাও তাদের পক্ষে দায়। অধিকন্তু ভূ-চিত্রের থেকে তাদের চিহ্ন চিরতরে মুছে যায়। মালয়েশিয়ান লোকেরা বলেন, "কুয়ালালামপুর না কি আমেরিকার নিউ ইয়র্কের দ্বিতীয় সংস্করণ"। কার্যতঃ তাই দেখলাম। গাড়ীর গ্যারেজ ছাড়া বাড়ী খুব কমই দেখলাম। পথচারী লোকের সংখ্যা একেবারে কম। যাদের দেখলাম তাদের চেহারাতে কেমন যেন দারিদ্রের ছাপ। আর অগনিত গাড়ী-ঘোড়া পিপড়ার মত চলছে। তাতে ফাঁক নেই, বিরাম নেই, তাতে আবার অনুক্ষণ ব্যস্ত রাস্তা অতিক্রমের উত্তম ব্যবস্থা। রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। যে দিকে তাকাই, সে দিকেই সমান সুন্দর শৃঙ্খলা, চোখ লেগে থাকে। রাস্তাঘাটের কোথাও এক টুকরা কাগজ কিংবা বিড়ি সিগারেটের নিক্ষিপ্ত অংশ পাওয়া ভার। রাস্তার আড়ে মোড়ে সুট কোট-টাই পরিহিত হাতে ঘড়ি ঝাড়ু ওয়ালারা নিজ নিজ কর্তব্যে নিরত। তারা নাকি স্কুলের বুনিয়াদী শিক্ষায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। তারা এখন উচ্চ বেতনের সরকারী কর্মচারী।

অবশ্য একটা দেশের তথ্য সংগ্রহ করতে হলে, একটা দেশের সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে, কিছু বলতে গেলে প্রচুর অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। প্রচুর সময় সাপেক্ষ। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যে একটা দেশের কী-ই বা জানা যায়। তথাপি আমি যা কিছু জান্তে পেরেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই -

মালয় উপদ্বীপের প্রধান অংশ, বোর্নিওর কতেকাংশ ও নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে মালয়েশিয়া রাজ্য গঠিত। বর্তমানে মালয়েশিয়া রাজ্যটি ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত। যথা ঃ সিলঙ্গার, ট্রেঙ্গসু, সাবহ্, সরবক, পিনাঙ্গ, পেহঙ্গ, নেগ্রি, মালাক্কা, কেলন্তন, পার্লিস, কেদহ্ জোহর। ইহা আবার পূর্ব মালয়েশিয়া ও পশ্চিম মালয়েশিয়া নামে দুই ভাগে বিভক্ত। মাঝে দক্ষিণ চীন সাগর। দেশটির আয়তন ১৩০,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৯৩৫৫০৪৩ জন। ইহার রাজধানী কুয়ালালামপুর। ছোট হলেও মালয়েশিয়া অতীব সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেশ। সকল প্রকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই রয়েছে এই রাজ্যে। সমভূমি, মালভূমি, ঘন বন বনান্ত, পর্বত মালা ও সাগর-উপসাগর এ সব প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেশটি খুব মনোরম। মনুষ্য জীবনের জীবন ধারনোপযোগী সব রকমের সুখ সুবিধা আছে। বিশেষ অসুবিধা-জনক কোন অবস্থাই এই রাজ্যে নেই। জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তাপমাত্রা স্বাভাবিক। মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে সাধারণ আর্দ্রতা বাড়ে মাত্র।

অর্থনীতিতে সমগ্র এশিয়া খণ্ডে উন্নত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে মালয়েশিয়া অন্যতম। এই উন্নত মানের অর্থনীতির প্রধান প্রধান কারন হলো এই-রাজ্যের সর্বত্র বিস্তৃত ও সুন্দর রাস্তা ঘাট, রেলওয়ে, সুগঠিত ডাক-বিভাগ, সামুদ্রিক পরিবহণ, যোগাযোগের সুব্যবস্থা, উত্তম বিদ্যুৎ সরবরাহ, আয়ের অনুপাতে জন-সংখ্যার সুবিধাজনক হার, উৎপাদনের অনুকূলে প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং অন্যান্য মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। সর্বোপরী কারণ হলো-দেশের মৌলিক আইন কানুন নিয়ম শৃঙ্খলার বাধ্যতা, মান্যতা, যোগ্য শাসন ব্যবস্থা ও তার স্থায়িত্বই দেশটিকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিচ্ছে। এই রাজ্যে টিন ও রবার উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানীয়। সমগ্র পৃথিবীতে যত টিন ও রবার উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে এক তৃতীয়াংশ টিন ও রবার উৎপাদিত হয় এই রাজ্যে। তা ছাড়া ধান, মসলা, সাগু, চা, কফি, ইক্ষু, তামাক, কলা, আনারস ইত্যাদি উপাদেয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

মালয়েশিয়ার ব্যবহৃত মুদ্রা মালয়েশিয়ান ডলার নামে অভিহিত। ইহা আমেরিকান ডলারের তুলনায় অনেক কম। আমাদের পাকিস্তানী মুদ্রা-মানে প্রায় দুই টাকা তাদের এক ডলার। আমাদের একশত পয়সায় এক টাকা। তাদের একশত সেন্ট এক ডলারের সমান। বিদেশী পর্যটকেরা ৫০০ ডলারের ট্রাভেলার চেক নিয়ে মালয়েশিয়ায় যাতায়াত করতে সক্ষম হন।

মালয়েশিয়া নানা বর্ণ, নানা গোত্র ও নানা ধর্মের লোকের অধ্যুষিত দেশ। মলয়, বাদজান, মরুত, দয়ক, মিলনা, চীনা, ভারতীয়, পাকিস্তানী ও বহু অন্য দেশজাত লোকের বসতি এই রাজ্যে। তারা ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিচারে ইসলাম-পন্থী, বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান তন্মধ্যে ইসলাম-পন্থী লোকের সংখ্যাই প্রধান। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাষা হলেও মলয় ভাষাই রাষ্ট্রভাষা। তবে অফিসে, কোর্ট কাচারীতে, দোকান পাটে, হাট-বাজারে হোটেলে রেস্তোরায় মালয়েশিয়ার সর্বত্র ইংরেজী ভাষাই ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীর প্রভাব প্রচলন খুব ব্যাপক।

মালয়েশিয়ায় ১৩টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে একেক জন গভর্ণর ও একটি নির্বাচিত পরিষদ থাকেন। এই তের জন গভর্ণর তাদের মধ্যে থেকে এক জনকে পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের সর্বাধিনায়ক আইন সম্মত বা শাসনতান্ত্রিক রাজা রূপে নির্বাচন করেন। মলয় ভাষায় সর্বাধিনায়ক বা রাজার পদবী হচ্ছে "জঙ্গ দি পারতুয়ন আগং" মালয়েশিয়ায় দুইটি পরিষদ নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত। একটি হল-প্রতিনিধি পরিষদ ও অপরটি সনেট পরিষদ। প্রতিনিধি পরিষদ হতে হবে সম্পূর্ণ নির্বাচিত আর সিনেট পরিষদ হতে হবে আংশিক নির্বাচিত, আংশিক মনোনীত। মহামান্য সর্বাধিনায়ক-জঙ্গ দি পারতুয়ন আগং প্রতিনিধি পরিষদ থেকে এমন একজন সদস্যকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরূপে নির্বাচন করেন যিনি সর্বতো মুখী যোগ্য, সর্ববরেণ্য নেতা ও অধিক সংখ্যক সদস্যের অনুমোদিত।

কুয়ালালামপুর হচ্ছে সিলঙ্গার প্রদেশের অন্তর্গত মহানগরী। ইহাই মালয়েশিয়া রাজ্যের রাজধানী। ইহার লোক সংখ্যা ১৩,৮৬,২৫১ জন। আয়তন ৩১৬০ বর্গ মাইল। কুয়ালালামপুর মহানগরীতে যে সকল প্রতিষ্ঠান উল্লেখ-যোগ্য পর্যটক গণের দর্শণীয় সেগুলো এই-লেইক গার্ডেন, মোরিশ পদ্ধতিতে প্রস্তুত গভর্ণমেন্ট অফিস সমূহ, মসজিদ নাগারা, ন্যাশনাল মনুমেন্ট, অত্যচ্চ গম্বুজ-বিশিষ্ট চিত্তাকর্ষক রেলওয়ে বিল্ডিং, নব-নির্মিত পার্লামেন্ট হাউস ও ইহার সংলগ্ন মনো-মুগ্ধকর পার্ক। মহানগরীর পাশে হিন্দু মন্দিরের সংলগ্নে মহান বতু কেইভ নামে এক বিস্ময়কর গুহা রয়েছে সেখানে যাতায়াতের জন্য খাড়া পাহাড়ের গাত্র কেটে ২৭০টি ধাপ-বিশিষ্ট সুগম সোপান নির্মিত। টেমপ্লার পার্ক যেখানে রয়েছে স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বিনী, ঝরণা ও বন-ভোজনকারীদের মনোরম আস্তানা সিলঙ্গার সমুদ্রোপকূলে পোর্ট স্বোয়েতেন হাম। উলুক্লেং জাতীয় চিড়িয়াখানা ক্লোং নামে সিলঙ্গার প্রদেশের রাজপুরী-যেখানে রয়েছে নয়নাভিরাম রাজকীয় মসজিদ, যেখানে রয়েছে "ইস্তানা আলং শাহ্" নামে নব-নির্ম্মিত রাজ প্রাসাদ।

এ সব দর্শনীয় স্থান দর্শন করলে দর্শকের অন্তরে যে ছাপ পড়ে যায়-তা জীবনে কখনও মুছবার কথা নয়। আজীবন আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হতে থাকবে তার অন্তরে।

পিনাঙ্গ প্রদেশে তিনটি মনোরম দর্শন-যোগ্য স্থান, কেমরণ উচ্চ ভুমি, ফ্রেসারস্ পর্বত ও ন্যাশনাল পার্ক। তম্মধ্যে ন্যাশনাল পার্ক বা মলয় ভাষায় "তামল নাগারা" অতীব মহান ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। ইহা পশ্চিম মালয়েশিয়ায় সবুজ সুন্দর বন-ভুমির বক্ষে প্রতিষ্ঠিত। এই তামল নাগারার আয়তন ১৬৭৭ বর্গ মাইল ও উচ্চতার উপদ্বীপের উচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গ ৭১৮৬ ফুট। নদী পথে ইহাতে যাতায়াত করতে হয়। এই পার্কে অত্যাশ্চর্য্যজনক দৃশ্য হলো আমেরিকান বন্য মহিষ, হাতী, ঘোড়া, নিনাদী হরিন, বন্য শূকর, বাঘ, বানর ও পুচ্ছহীন বানরের সমাবেশে নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন এখানে রয়েছে তিনটি পর্যটক শিবির, তিনটি বাংলো, একটি বিশ্রামাগার। তাতে আবার আগন্তুকদের আহার বিহারের সর্ববিধ সুব্যবস্থা। কেউ যদি নিজস্ব তাঁবু খাটিয়ে কিংবা ক্যাম্প করে থাকতে চান, তবে পার্ক সার্ভিস থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার পাওয়া যায়। ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্র বড় সুলভ। মোটর বোটে আনন্দ জনক ভ্রমণের জন্য এই পার্কের মধ্যেই মনোরম জলাশয় দর্শক গণের নয়ন গোচরে আসে।

মালয়েশিয়ায় সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হলো- সাবহ্ প্রদেশের অন্তর্গত মন্ট 'কিনা বুল' ইহার উচ্চতা সমুদ্র সমতল রেখার থেকে ১৩৪৫৫ ফুট।

মালয়েশিয়ানদের বিশিষ্ট গুণ শুধু বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্য্য নয়, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদে নয় কিংবা উন্নয়ন মূলক কর্মে কিংবা বলিষ্ঠ আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর নয়। তাঁদের অন্তর্নিহিত আসল গুণটুকু হল - তাঁরা দায়িত্ব শীল, কর্ম-প্রবন, উদার, আপনাদের কর্তব্যে ফাঁকি দেয় না। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রত্যেকটি লোক। সর্বোপরি তাঁরা জাতীয় কল্যাণ সাধনায় অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণু। তা না হলে মীন-পুচ্ছের ন্যায় একটি ছোট চিকন দেশ আমাদের দেশের তুলনায় কি লোক সংখ্যায়, কি আয়তনে দশ ভাগের এক ভাগও নয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দূর অগ্রসর হতে পারলো কি করে।

বিদেশী পর্যটক মালয়েশিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যদিও মালয়েশিয়া নানা বর্ণ, নানা গোত্র ও নানা ধর্মের লোকের অধ্যুষিত দেশ, তথাপি তাঁরা দেশাত্ম-চেতনায় সচেতন, তাঁরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ-শূণ্য, তাঁরা একই পরিবারস্থ লোকের ন্যায় এক ও অভিন্ন। পরস্পর গভীর সমঝোতা ও সহানুভূতি সম্পন্ন।

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেন্ট পদ্ধতির শাসিত দেশ। প্রধানমন্ত্রীই এই রাজ্যের সর্বেসর্বা। ইহার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী দেওয়ান টাংকু আবদুল রহমান পুত্র। তিনি ইসলাম পন্থী। তাঁকে প্রত্যক্ষ করার ভাগ্য হয় নি, তথাপি লোক মুখে তাঁর গুণগান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। প্রত্যেকটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রত্যেকটি দোকান পাট, রেস্তেরায়, এমনকটি অন্য ধর্মাবলম্বীর ধর্ম মন্দিরে প্রধান মন্ত্রীর সুন্দর ছবিখানি যেরূপ সুসজ্জিত ও স্বালঙ্কৃতভাবে সংরক্ষিত তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে তিনি দেশের একজন অতিশয় জনপ্রিয় ও সর্ববরেণ্য নেতা। প্রায় বুদ্ধ মন্দিরে দেখতে পাই

দাতার নাম লিষ্টির বোর্ডে সর্বাগ্রে প্রধান মন্ত্রীর বা ব্যক্তিগত নামের পার্শ্বে প্রদত্ত ডলার সংখ্যা সর্বাধিক বেশী। কোন মন্দিরে এক লক্ষ ডলারের কম দেখি নি। এই ভাবে রাজ্যের সর্বত্রই তাঁর জনপ্রিয়তার নিদর্শন রয়েছে।

ছয়

১৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার, কুয়ালালামপুর ত্যাগ করে পিনাঙ্গ যেতে হবে। পিনাঙ্গ হচ্ছে মালয়েশিয়া রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। ইহার সদর শহর বা রাজধানী হচ্ছে পিনাঙ্গ বা জর্জ্জ-টাউন। এখানে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের অবশিষ্ট অধিবেশনগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

একে তো উপদ্রুত রাত্রি। নিদ্রা তো কারোই হয়নি। তাতে আবার ভোরে শয্যা ত্যাগ। ভোর রাত্রির আরামদায়ক সুখ-নিদ্রার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সকলেরই কুঞ্চিত ললাট। তথাপি কি করা যায়? উপায় নেই, পিনাঙ্গ যেতে হবে। খুব তাড়াহুড়ার মাধ্যমে আচমন-কৃত্যগুলো সেরে নিলাম। এক্ষণই নিজ নিজ জিনিষ-পত্র নিয়ে নীচে চলে যেতে হবে। প্রাতঃ রাশের পরই বাসে চাপতে হবে। উপরে উঠবার আর সময় থাকবে না।

চারদিন বসতির পর এহেন আরামপ্রদ প্রকোষ্ঠটি ছেড়ে আসতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বিশেষ করে গ্রীষ্ম কালের বিজলী পাখা ও পস্পের গদি-আঁটানো বিছানাটা। কামরা থেকে লিফটে এসে দেখি। সাদা টুকটুকে ক্ষীণ-কায়া একটি ৯/১০ বৎসরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্দেশ্য সে লিফটের সুইচ টিপবে এবং আমাদেরকে নীচে নামিয়ে নেবে। গত কয়েক দিন ধরে এভাবে উঠা নামা করতে প্রায়ই এই মেয়েটিও তার সঙ্গিনীগণকে দেখেছি। হঠাৎ হাসি-মুখী মেয়েটি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, Rev. Sir, excuse me, where are you coming from? আমি বললাম, We are coming from Pakistan. এই ছোট মেয়েটির মুখে ইংরেজী কথা তো নয়, কর্ণ কুহরে যেন মধু বর্ষণ। মধু মুখী মেয়েটি আবার বলল, Please, give me a Pakistan coin. অমনি আর্শ্চয্য হয়ে গেলাম। এতটুকু মেয়ের বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহের হবি, যা হোক, মাননীয় মহাথের ও আমি পকেট হাতড়িয়ে একটি দশ পাই ও একটি পাঁচ পাই মেয়েটির হাতে দিলাম। হাতে দেওয়ার সাথে সাথেই Thank you very much বলে মেয়েটি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ মেয়েটির সহাস্যে বদনের প্রতি তাকিয়ে রইলাম তার নির্মল আনন্দ-রস উপভোগের সাথে নিজেরাও উপভোগ করলাম।

নীচে নেমেই তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাস সেরে নিলাম। ৭টায় বাস। আমরা যথা সময় বাসে চেপে বসলাম। প্রতিনিধি মণ্ডলীকে নিয়ে এখান থেকে যে কয়টা বাস

যাওয়ার কথা সবগুলো বাস সময় মত এসে পৌছেনি বলে বাস ছাড়তে এক ঘন্টার অধিক বিলম্ব হয়ে গেল। বাস ছাড়ল প্রায় ৮-৩০ টার সময়। প্রকাণ্ড বাস, দেখতে অতি সুন্দর বাসগুলোর বডি। আরাম-দায়ক গতি আঁটানো। নমুনায় আমাদের দেশের ষ্টেট বাসের মত হলেও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। আমাদিগকে কুক্ষিতে ধারণ করে বাসগুলো একটার পিছনে একটা দানব গতিতে ছুটল। প্রশস্ত রাজ-পথ। রাজ-পথের মাঝখানে প্রলম্বিত সাদা রংয়ের চিহ্ন দেওয়া আসা-যাওয়ার সীমানা নির্ধারণী রেখা। কালোর মাঝে সাদা রং পথিকের শুধু দৃষ্টিই আকর্ষণ করে না। মনকেও মুগ্ধ করে। পথের দুই পাশে অনুচ্চ শৈল-শ্রেণী, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে রং বেরঙ্গের কুটীর সমূহ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত। প্রায় প্রত্যেকটি কুটীরের সামনে অবিরত ধারার পানির ফোয়ারা আর নানা রকম ফুলের সুসজ্জিত বাগান।

পুরা বেগে বাসগুলো ছুটে চলছে। মহানগরীর সীমা অতিক্রম করে বন বনান্তের বুক চিরে বাসগুলো পিনাঙ্গের পানে ছুটছে আর ছুটছে। এই যে দিগন্ত বিস্তৃত বন-বনান্ত, গহীন অরণ্য তাহা অকেজো আগাছা কিংবা বৃক্ষ তরুলতাদি দ্বারা আচ্ছন্ন নহে অতি উপাদেয় মানব সভ্যতার পরম হিতৈষী নির্বাক বন্ধু এক মাত্র রাবার বাগান। রাস্তার দু ধারেই অন্তহীন সারিবদ্ধ রাবার বৃক্ষ। প্রত্যেকটি বৃক্ষে উপর থেকে গোড়া পর্য্যন্ত সর্পাকারের আঁকা বাঁকা কর্ত্তন চিহ্ন। যে চিহ্ন নালীতে বৃক্ষের রস-কসের ধারা বসানো হাঁড়িতে এসে জমে মাঝে মাঝে রাবার সংগ্রহে ও বাগানের পরিচর্য্যায় নিরত ফুট ফুটে ফ্রগ সেলোয়ার পরিহিতা কত কত মহিলাকে দেখলাম আপন মনে কাজ করে চলেছে। রাবার বাগানের এই দৃশ্য আমার চোখে অভূত পূর্ব আমার দৃষ্টি অপলক নেত্রে শুধু চেয়ে থাকতেই চায় চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল আসে, তথাপি ফিরতে চায় না। কি দুরন্ত লোভের দুরন্ত দৃষ্টি। অবিশ্রান্ত বাস ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল। ইতোমধ্যে কত বাজার কত বন্দর অতিক্রম করল তার কি এত হিসেব রেখেছি? কত মনোহর দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দিয়েছে। কত অপরূপ সৌন্দর্য্য মনোগহনে আটকা পড়ে গেছে। তথাপি চোখের তৃপ্তি আসে নি। যত দেখছে দেখার লালসা তত বেড়েই চলছে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করলে যেমন অগ্নির প্রজ্জলন শক্তি অনেকগুন বৃদ্ধি পায়। আমাদের চক্ষাদি ইন্দ্রি য়ব ক্ষুধাও তদ্রুপ।

হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়ল পর্বত গাত্রে। অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতির ছোট ছোট নীচ নীচ অসংখ্য সৌধ-মালা। সবগুলো একই আকার ও নমুনার দূর থেকে দেখতে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য। কি নয়নাভিরাম, আপন গাত্রে অসংখ্য সৌধ মালা পরিহিত ক্রমঃ হ্রস্বায়মান পর্বত আকাশ পানে উঠে গেছে। এই দৃশ্য তো আমার জীবনে একান্ত অভিনব। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এ গুলো চীনাদের শ্মশানের উপর সমাধি মন্দির।

শ্মশান দেখলে সাধারণতঃ মানুষের. অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। আমার অন্তরে তাই সূচিত হল। শ্মশানের নাম শুনতেই আমরা ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠি।

শ্মশানস্থ ভূত-প্রেতের উপদ্রবের গল্পে বিচলিত হই। আবার শ্মশানের প্রতি অপবিত্রতা আরোপ ও কম করি না। শ্মশানে গেলে স্নান না করে বাড়ী ফিরি না। শ্মশান এমনিই ভীতি জনক ও অপবিত্র। শ্মশান যে জগৎ শুদ্ধ প্রাণীর অন্তিম বাসস্থান, অন্যান্যদের প্রতি নিয়ত শ্মশান যাত্রা দর্শন করা সত্ত্বেও আমাদের বোধে না। শ্মশানে না গিয়ে কারো কি নিস্তার আছে? অতীতে গিয়েছে বর্তমানেও অহরহ যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ও যাবে। বড়ই আশ্চর্য্য যে জেনে শুনে দেখেও আমাদের ধারণা আমরা কখনো যাব না এবং আমাদের আকাঙ্খা আত্নীয় স্বজন কাকেও যেতে দিব না। আমরা যেমনটি আছি চিরকাল তেমনটি থাকব। এই ভাবই আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপে প্রকাশ পায়। একদিন শ্মাশানে যাত্রা যে সুনিশ্চিত তা কখনো অন্তরে জাগে না। আমাদের দৈনন্দিন কাজে এই ভাব কখনো প্রকাশ পায় না যে আমরা এখানে মরণ শীল, অনিত্য। একদিন আমাদের শ্মশানে যেতে হবে।

প্রাণীগণ সৈন্য সদৃশ। যুদ্ধে গমনোন্মুখ সৈন্যদের নানা আমোদ প্রমোদে মত্ত করে রাখা হয়, যাতে শ্মশান বা মৃত্যু সম্পর্কে তাদের অন্তরে কোন রূপ চিন্তার উদ্রেক না হয়। সৈন্যগণ দলে দলে সর্বদা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করে কিন্তু যারা গমন করে তারা আর ফিরে আসে না। তথাপি পশ্চাদগামীদের কোন চিন্তা নেই। মানুষও অবিদ্যা মোহের তাড়নায় মোহিত ও অন্ধ হয়ে আছে। নিত্য মৃত্যুর চির গমন দেখেও চিন্তার উদ্রেক নেই।

মৃত্যুর মহান চিন্তা মানুষের জীবনে কিরূপ ফল-প্রসু হয় এ সম্পর্কে ভারতের মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন এক আশ্রমবাসী একনাথ নামে এক সাধু মোহান্তের একটি ঐতিহাসিক গল্প বড় প্রণিধন যোগ্য। সাধু মোহান্ত একনাথ ছিলেন সদা সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ। একদিন তাঁর ভক্তগণের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপনীত হয়ে জিজ্ঞাস করলেন, প্রভো! আপনি কি উপায়ে এরূপ সুন্দর সুখী সমৃদ্ধ ভক্তি-ভাজন জীবন লাভ করলেন? আমরা যারা সংসার জীবন যাপন করছি, অকুশল চিন্তা পাপ কর্ম্ম সম্পাদন ব্যতীত একদিন আমরা থাকতে পারি না। আপনি কি করে আজীবন নিষ্পাপ নিষ্কলুষ রইলেন। আপনার এই পরম পবিত্র জীবনের উৎস কি? তখন সব্রহ্মচারী ভাবিতাত্ম এক নাথ মৃদু হাস্যে বললেন বৎস! এত প্রশ্ন কেন করছ, আমার জীবনের বিষয় জেনে তোমার কি লাভ? তোমার জীবনের আয়ুস্কাল যে আর মাত্র সাত দিন। তচ্ছ্রবনে সে ব্যক্তি মোহান্তের কথায় পুরাপুরি বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং নিজের মৃত্যু চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি মৃত্যু চিন্তা নিয়েই বাড়ী ফিরলেন, তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্য মৃত্যু চিন্তা ত্যাগ করতে পারলেন না। যত দিন যায় তত তাঁর মৃত্যু চিন্তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। সাত দিন সমাপ্ত হতে আর মাত্র দু দিন বাকী। এমন সময় ভক্তের দেহে মৃদু জ্বরের সঞ্চার হয়। এবার তিনি একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন সাধু মহাপুরুষের কথা অসত্য নয়। এই তো তাঁর বাক্য আমার জীবনে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছে।

মৃত্যু চিন্তায় বিভোর ভক্ত শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছেন। সপ্তম দিন সাধু এক-নাথ এসে ভক্তের শয্যার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস! গত সাত দিন তোমার কিরূপ কাটল, এর মধ্যে তুমি কয়টি পাপ কাজ করেছ? ভক্ত বললেন, প্রভো! আমি যে মৃত্যু চিন্তায় অস্থির। পাপ কাজ করা তো দুরের কথা, সাত দিনের মধ্যে পাপ চিন্তার লেশ মাত্রও আমার অন্তরে স্থান পায়নি। সাধু বললেন বৎস! জগতের যাবতীয় বস্তু যে অনিত্য দুঃখ ময় ও নিঃসার এই মহান সত্য সম্যক উপলব্ধি করা যায় এক মাত্র মরণ স্মৃতি সাধনায় এতে সাধু সন্ন্যাসীর জীবন নিষ্পাপ, পবিত্র হয় ও পরম জ্ঞান লাভ হয় সাধুর এই মর্ম্ম স্পর্শী উপদেশে ভক্তের জীবনের দিক পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল সুস্থির হয়ে গেল তাঁর জীবনের সকল প্রকার প্রহেলিকা।

আমার এখানে উচ্চ নীচ, ধনী-মানী, রাজা-প্রজা, পণ্ডিত মুর্খ বলে যতই বিভেদ করি না কেন, তার চুড়ান্ত মীমাংসা হয় শ্মশানে গেলে! ভেদ-বিভেদ শূন্যতায় শ্মশানে সবাই সমান। তাই বাংলা ভাষার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি বলছেন, মৃত্যু মাঝে হতে হবে চিতা ভস্মে সবার সমান। জীবনের যত সুখ-দুঃখ, যত অহঙ্কার যত তাড়না সব শ্মশানে গিয়ে বিলীন হয়। তার অনন্ত কুক্ষিতে সব জীর্ণ হয়ে যায়। জীবনের অবসানে যেখানে চিরতরে যেতেই হবে, যেখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তন আর সম্ভব পর নহে। অথচ জীবদ্দশায় সেখানে গিয়ে তার মহিমা একটু ও দেখি না। তার স্বরূপ স্মৃতির অনুশীলণ করি না। মৃত দেহকে আমরা ভয় করি। কি জানি মৃত দেহে বেতাল সঞ্চার হতে কেউ দেখেনি। মৃত দেহের কঙ্কালের ভিতর কিছু থাকে না। তা সর্ব্ব শূণ্য। চিতা মৃতকে দগ্ধ করলেও জীবিতকেদগ্ধ করে না। চিতার বা মৃত্যুর প্রতি জীবিতের ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু কাম-ক্রোধাদি চিন্তা অহরহঃ জীবের জীবন দগ্ধ করে জীবিতে জীবিতে রাত দিন লড়াই কখন পক্ষে কখন বিপক্ষে কখন ও বা কামনার তাড়নায়, কখনও হিংসা বিদ্বেষের উগ্র উত্তেজনায়। দৈনন্দিন ধর-পাকাড়, বধন-বন্ধন ধর্ষণ যে জীবিতের দ্বারই সম্ভব। জীবিতের ভিতরকার বেতালোপদ্রবে যে জগৎ শুদ্ধ অতিষ্ঠ জগৎ যে গঞ্জনাময় জীবিতের কাছে জীবিত যে কত ভয়াবহ তা আমাদের ভাবনায়ই আসেনা। জীবিতের প্রতি আমাদের ভয়-ভীতি নেই। সংসারালয়ের প্রতি মনের যে দুর্দ্দম্য তাড়না, তা শ্মশান বা মৃত্যুর ইন্দ্রিয়াতীত শুভ সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সব বিলীন হয়ে যায়। অন্তরে পবিত্রতার সঞ্চার হয়।

যে ক্ষেত্রে মৃত দেহ দাহ করে তাকে বলে শ্মশান! যে ক্ষেত্রে মৃত দেহ ভূ গর্ভস্থ করা হয় ইহা কবর খোলা নামে পরিচিত। অনাদি কাল থেকে এই মাটির পৃথিবীতে অহরহঃ এসব কর্ম সম্পাদিত হয়ে চলে এসেছে। বিরাম হয় নি। কাজেই শ্মশান, মশান, কবর খোলা কিংবা বধ্য-ভূমি ব্যতীত এই পৃথিবীতে কি তিল ধারণের স্থান অবশিষ্ট আছে? সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে বিশ্ব জগৎ একটা বিরাট শ্মশান বা কবর খোলা বিশেষ। আরো চিন্তা করলে হৃদয়ঙ্গম হবে যে আমরা রাত দিন কত শত হত্যা করি, আমাদের জঠরাগ্নি কত শত প্রাণীকে দগ্ধ করে, গ্রাসে গ্রাসে কত শত

প্রাণীকে আমাদের উদরে কবর দিই। তজ্জন্য আমাদের জীবিত দেহগুলো ও একেকটা বহু বছরের শ্মশান বা কবর খোলা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

শাস্ত্রের থেকে আমরা জানতে পেরেছি শ্মশান বা শ্মশানে নিক্ষিপ্ত মৃত দেহের সাধনা করে জগতের কত শত মহামানব পরম শান্তি লাভ করেছেন, তার সীমা সংখ্যা নেই। সংসার অশান্ত নিত্য কোলাহলে পুর্ন কাম-ক্রোধাদি ক্লেশে ক্লেদাক্ত, অপবিত্র। আর শ্মশান বা মৃত দেহ হচ্ছে শান্ত সমাহিত পরম পবিত্র।

শ্মশানের কথা ভাবতে ভাবতে বেলা যখন ১০ টা তখন বাস একটি ছোট শহরে গিয়ে থামল। প্রখর রৌদ্র অসহ্য গরম, আনন্দের বিষয় যে প্রতিনিধি বর্গের প্রত্যেকের হাতে একটি করে পাখা দেওয়া হয়েছিল যাত্রার প্রাক্কালেই। তাতে গরম পীড়নটা অনেক লাঘব হল।

পরিচালকেরা এসে আমাদিগকে এক চীনা হোটেলে নিয়ে পৌঁছলেন। হোটেলে দেখি আগের থেকেই ব্যবস্থিত টেবিলে সজ্জিত নানা প্রকার উপাদেয় নাস্তা, চা-কফি ইত্যাদি। ইচ্ছা মত খেয়ে নিলাম। মনে মনে ধারণা আজকের ভোজন এখানেই ইতি। পেরেক প্রদেশের রাজধানী বা সদর শহর ইপো পৌঁছতে এখনো অনেক পথ। বারটার আগে ইপো পৌঁছা যায় কিনা সন্দেহ। যেহেতু যথোচিৎ সময়ে কুয়ালালামপুর থেকে রওনা হওয়া যায় নি। তদ্ধেতু ইপো পৌঁছান ঠিক সময় না ও হতে পারে।

থেরবাদী ভিক্ষুদের ভোজন কৃত্য যে বারটার পর আর চলে না। বারটার পূর্বে পথে আর কোথাও আহারের ব্যবস্থা নেই।

হোটেলে দেখলাম কত রকমের সুস্বাদু খানা যে আয়নার বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে। তাতে বাস্তবিকই লোভ হয়েছিল। আরো দেখলাম কত রকমের আসবাব পত্র, তৈষজ-পত্র ঘরের বাহিরে ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। রাজপথের উপর শহুরে হোটেল, অগণিত লোক জনের অবাধ আনা-গোনা। চুরির উপর শহুরে এদেশে নেই ইহাও একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের জিনিষ পত্র তো বাহিরে রাখা দুরে থাক ঘরে রাখাও দায়। কোনকারণে দরজার বাহিরে গেলেই আমাদের সম্পদ মালিকানা ছাড়িয়ে চলে যায় বাড়ীর চার দিকে পাকা পাঁচিল করলেও নিশ্চিত হওয়া যায় না। তার উপর আবার অস্ত্র বসাতে হয়ে বোতলের চাঁড়া না হয় কাঁটা তার।

হোটেল থেকে এসে বাসে চাপলাম। প্রত্যেক প্রতিনিধিকে দুইটি করে কমলা লেবু দিয়ে গেল লেবু দেখে বড় আনন্দ পেলাম, এই গরমের মাঝে রাস্তায় কমলা লেবু খেতে পাব।

আবার বাস ছুটল তীব্র বেগে। কয়েক মাইল আসার পর ইচছা হল একটি কমলা খাই। ভাবলাম কমলা তো খাব, কমলার খোসা ফেলব কোথায়? রাস্তায় না বাসে? রাস্তা যেরূপ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আর বাস যেরূপ সুন্দর চকচকে ধবধবে

কমলার খোসা ফেলবার স্থান কোথাও নেই। তথাপি আমার সিদ্ধ স্বভাবের একটা বুদ্ধি আঁটল - বাস তো চলতি, জানালার পাশে ফেলে দেবে। আমার দিকে তো কেউ তাকিয়ে থাকেনি। এই বুদ্ধিতে থলে থেকে একটা কমলা বের করে খোসা ছাড়ালাম। হস্ত উপরে উঠাচ্ছি, ফেলছি, এমন সময় ধরা পড়ে গেলাম-ইউরোপীয়ান ভিক্ষু শ্রীক্ষান্তি পালের হস্তে। একই আসনে দুজনই উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমিও স্মিত হাসলাম। আসলে বেকুবিও করলাম শরম ও পেলাম। কমলা তখান আর খাওয়া হল না। সব থলের মধ্যে পুরে নিলাম।

বাস চলছে তার অভিরাম গতিতে। এদিকে আমাদের মধ্যে কিরূপ রহস্য ঘটল। একমাত্র আয়ুস্মান শ্রীক্ষান্তি পাল ছাড়া বাসের কারো তাতে ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

মনে পড়ল কোটিল্যের অর্থ শাস্ত্রের কথা। অর্থ শাস্ত্রে নগরবাসীদের জন্য একটি নীতির উল্লেখ আছে। রাস্তায় আবর্জ্জনা ফেললে তাকে জরিমানা দিতে হত। কারো বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার জল-কাদা জমে থাকলে তাকে জরিমানা দিতে হত। তৎকালীন শহরবাসী লোকেরা যদি সত্যি সত্যি এ সব নিয়ম মেনে চলে থাকে-তবে বলতে হবে আজকালকার নগর অপেক্ষা তৎকালীন নগরগুলো অতি সুন্দর তকতকে ঝকঝকে স্বাস্থ্যকর ছিল। তা হলে কমলার খোসা রাস্তায় ফেলার দায়ে আমিও দণ্ডনীয় হয়ে পড়েছিলাম প্রায়।

আমরা যখন ইপোর সীমানায় পৌঁছি তখন বেলা ১১-৩০মিঃ। প্রথমতঃ আমাদিগকে নামাল এক গুহা-মন্দিরের দরজায়। মনে করলাম এই মন্দিরই ইপোর সম্ পো তোং বুদ্ধ মন্দির। এখানেই সব কিছু হবে। এখন মন্দির দর্শন থেকে খানার চিন্তাই চমৎকার। মন্দিরে গিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই আবার বাসে চাপবার হুকুম। কেউ দেখল কেউ দেখলনা। আমি বিশেষ কিছু দেখতে পাই নি। তাড়াহুড়া করে আবার বাসে চাপলাম। আফশোষ রইল এই অত্যুঙ্গ পর্বত তল মনোরম দৃশ্যের গুহা মন্দিরটা দেখা গেল না। গোড়াতেই গলদ হয়ে গেছে। নির্দ্ধারিত সময় রওনা হলে গন্তব্যে পৌছার আগে এই মন্দিরটা ধীর স্থির ভাবে দর্শন করা যেত। এই জন্যই এখন এত তাড়াহুড়া।

ইপোর সেই সম্-পো-তোং বিহারে পৌঁছতে প্রায় বারটা। রাজপথ ধারে বিরাট বিহার। কিয়দ্দূর অগ্রসর হতেই দেখি, বিরাট হল গৃহ। সারাটি হলেই গোল গোল টেবিল সাজানো। তন্মধ্যে চৈনিক আহারের অপূর্ব সমাবেশ। সব নিরামিস। সময় ছিল না বলে তাড়াতাড়ি আহার কৃত্য শেষ করতে হয়েছে। তাতে না পারলাম এই নূতন আহার্য্যের স্বাদ গ্রহণ করতে না পারলাম তৃপ্তির সহিত পরিপাটি ভোজন সমাপন করতে। আমি গো গ্রাসে গিললাম মাত্র।

বিহারটি বিশ্বের ৩১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে যথোচিৎ সৎকার সম্বর্দ্ধনা করবার যেমন যোগ্যতম স্থান তেমনি অভ্যর্থনাকারী লোক জন। পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরাই

পরিবেশন, কি আদর আপ্যায়নে অধিকতর নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় বুড়া মেয়ে-ছেলে ইংরেজীতেই কথা বার্ত্তা বললেন।

আহারের পরক্ষণে প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন তথাকার কর্মসূচীর এবং অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন যেন সমগ্র প্রতিনিধিবর্গ সম্মিলিত ফটো তোলার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হন।

চৈনিক বিহারগুলোর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যে পড়ল। সব বিহারেই তার ব্যবস্থা রয়েছে। বিহারের একটা বৃহৎ অংশে প্রতিষ্ঠিত দেওয়ালের গাত্রে ছোট ছোট সারিবদ্ধ বাক্স চেম্বার। বাক্সের মধ্যে চীনা মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ অস্থি-ধাতু রক্ষিত হয়। বাক্সের বর্হিদেশে ঐ ব্যক্তির ফটো, নাম ঠিকানা থাকে। তাতে যে কোন লোক জানতে পারে যে কোন বাক্সে কার অস্থি রক্ষিত। ইহাও বিহারের একটা সৌন্দর্য্য ও মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করছে।

অতঃপর আমরা এই বিহার ত্যাগ করে এক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী দেখতে গেলাম। বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরী। ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার সাহেব আমাদিগকে বিনম্র অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন এবং কল-কারখানা দেখালেন। ভিতরে সব কল-কব্জা ক্রিয়া-কৌশল বিজ্ঞান সম্মত। সহগামী লোকের মধ্যে কেউ কিছু বুঝে থাকলেও আমার বুঝবার যোগ্যতা কোথায়? আমি শুধু চোখেই দেখে নিলাম। আমি দেখলাম এক কলে মাটি ঢুকানো হচ্ছে, বহু কল কারখানার ব্যবধান অতিক্রম করে রূপান্তরিত হয় এবং আরেক কলের মাধ্যমে সেই মাটিই আপনা-আপনি প্যাক করা সিমেন্টের বস্তা রূপে বের হয়ে আসছে এতে ভারী আনন্দ পেলাম।

অনন্তর বাস তার দানব-কুক্ষিতে আমাদিগকে কুক্ষিগত করে দৈত্যগতিতে ছুটল। চলল ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পর কত চিত্র-বিচিত্রের মন্দির-মসজিদ গির্জ্জা-বিহার দেখে আনন্দ পেলাম। এই সব ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ সংগঠনে একটা যেন পারস্পরিক উৎসাহ ব্যঞ্জক প্রতিযোগিতার আভাস পাওয়া যায়। যে কত অধিক পয়সা খরচ করে ধর্ম মন্দিরটি লোকের চিত্তাকর্ষক করতে সক্ষম, যেন তার তত বেশী বাহবা। বস্তুতঃ এই প্রতিযোগিতায় আপন আপন ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মর্য্যাদা ও নৈতিক বোধেরই নিদর্শন পরিস্ফুট।

বাস যখন বাটার ওয়ার্থ নামক ঘাটে গিয়ে পৌঁছল তখন বেলা তিনটা ত্রিশ মিনিট। বাস থেকে নেমে আমরা ফেরীতে উঠলাম। দোতালা ফেরী। দোতলার উপরে যেখানে আরোহীদের বসবার আরাম কেদারা রয়েছে, আমরা তথায় বসে পড়লাম। নীচের তলায় যান-বাহন রক্ষার ব্যবস্থা। যথা সময় ফেরী তার মন্থর গতিতে চলল। পর পাড়ে পিনাঙ্গ শহর। মাঝে একটি অল্প পরিসর সমুদ্র খাঁড়ি। আমাদের ফেরী এই খাঁড়ির উপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলছে।

সূর্য্যের সোনালী রশ্মি পতিত হয়ে ফেরীর সর্বাঙ্গ রঙ্গীন করে ফেলল। রশ্মিতে তেজঃ আদৌ নেই। তাতে নিহিত আছে অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য ও রূপচ্ছটা। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ক্রমশঃ রক্তিম হয়ে উঠল এবং নীরব নিস্তব্ধতার মাঝে শান্তির আভাস সৃষ্টি করে অস্তমিত হয়ে গেল।

সম্মুখে অসংখ্য দালান কোটা বোঝাই ও জলাকীর্ণ পিনাঙ্গ শহর। দুই পাশে অনন্ত অসীম মহাসমুদ্রের অচ্ছেদ্য অংশ। উপরে মেঘ মুক্ত রক্ত রাস রঞ্জিত অনন্ত আকাশ। কি অপরূপ শোভায় শোভিত। নহে দিবা নহে রাত্রি সন্ধিক্ষণে প্রকৃতির সর্বত্র একটা গুরু গাম্ভীর্য্য প্রশান্ত ভাব বিরাজমান। প্রদোষের এই ভাব-গম্ভীর রূপ দর্শনেও মলয় হিল্লোলে সুখ-স্পর্শনে আমার অন্তরাকাশ অনাবিল আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়।

সমুদ্র বক্ষে তরঙ্গের বিক্ষোভ নেই। চাঞ্চল্য নেই, আছে শুধু একটা শান্ত সমাহিত ভাব। অসংখ্য যান বাহন আপন আপন গন্তব্যে ছুটে চলছে। সমুদ্রার্ণবের মধ্যে কোনটি বহু রাজ্যের, বহু দেশের সমুদ্র অঞ্চল অতিক্রম করে তখন মন্থর গতিতে তীর সংলগ্ন হচ্ছিল। কোনটি পোতাশ্রয় ত্যাগ করে অনন্ত পারাবারের বক্ষচ্ছেদ করে অসীমের পানে ছুটছে।

কর্ম-ক্লান্ত মাঝি মাল্লাগণ সান্ধ্য সমীরণের মধুর স্পর্শে প্রফুল্ল-চিত্তে নিজ নিজ নৌকাগুলো নিয়ে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। আকাশ-বিহারী বিহগবৃন্দ নিজ নীড়ের সন্ধানে চলছে।

এরূপে প্রদোষের ঘনচ্ছটায় সৌন্দর্য্যাবেশ সৃষ্টি করে কি চমৎকার সুষমা মণ্ডিত পিনাঙ্গ সমুদ্রের তটদেশ শোভা বর্দ্ধন করছে।

আমাদের ফেরী সম্মুক গতিতে তটে ভিড়লে আমরা পিনাঙ্গ শহরে অবতরণ করলাম। এখন সন্ধ্যা সাতটা। সমুদ্র ঘাটেই পিনাঙ্গ বৌদ্ধ সমিতির সদস্যগণ প্রতিনিধি বর্গকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। এখান থেকেই প্রতিনিধিগণকে বিভিন্ন হোটেলে, বিভিন্ন মন্দিরে যাঁদের যেখানে রাখা উচিৎ বিবেচনা করলেন, তাঁদেরই সেখানে পাঠালেন। কুয়ালালামপুর যেরূপ সকল প্রতিনিধি একই স্থানে ছিলেন, এখানে সেরূপ ব্যবস্থা নেই। আহারের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন স্থানে।

বাসগুলোর মধ্যে ক্রমিক নম্বর দেওয়া হল। কত নম্বর বাস কোন্ কোন্ স্থানে যাবে, কতটার সময় যাবে, বিহারে বিহারে হোটেলে হোটেলে অবস্থানকারী প্রতিনিধিগণকে সকাল বিকাল আনা নেওয়া করবে। তার উত্তম ব্যবস্থা করা হল।

আমাদের বাস নম্বর হচ্ছে - তিন। বাসস্থান হচ্ছে - সিংহল দেশীয় বিহার-মহিন্দারাম। তিন নম্বর যুক্ত বাসের গাইড হলো তং-তৈ-কৈ, তেং কিন্ হুং এবং

আনন্দ রাজ-এই তিনজন। তন্মধ্যে প্রথম দুইজন হচ্ছে চীনা যুবক। তৃতীয় জন হচ্ছে সিংহলী পিতার ঔরসে ও চীনা মায়ের গর্ভজাত। তাই তার নামটায় ভারতীয় সংস্কৃতি এবং চেহারায় ককেশীয় বা হিন্দু আকৃতি বহন করছে।

তিন নং বাস আমাদিগকে নিয়ে ঘন্টা খানেক পরেই মহিন্দারামে পৌছল। আমরা বাস থেকে নেমে বুদ্ধ-বন্দনা ও ভিক্ষু বন্দনা সেরে বিহারের অধ্যক্ষ মাননীয় প্রেমরতন মহাথেরোর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম। তিনি আমাদের সর্ব্ব প্রকার আহার বিহার সংক্রান্ত সুবিধার কথা বাতলে দিলেন।

প্রকান্ড ভু-খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত, বহু ভিক্ষু-শ্রামণ ও অতিথি অভ্যাগতের জাঁকজমকে বসবাসের উপযুক্ত সংস্থান এই মহিন্দারাম। এখানকার মন্দিরটার গঠনে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরের পিছনের দিক নামে কোন অংশ নেই। বৃহদাকার মন্দিরের মাঝখানে দেওয়াল। উভয় পাশেই প্রতিমার বেদী। বেদীর উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমা। বুদ্ধরূপ দর্শনে ও বুদ্ধ পুজায় শ্রদ্ধাবান লোকেরা যে যে দিক দিয়ে আসুক সে দিকেই মন্দিরের সম্মুখভাগ। প্রশস্ত পূজা বেদিকা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পাশেই বোধি-মণ্ডপ ও বোধি বৃক্ষ তা ছাড়া স্থায়ী বসবাসকারী ভিক্ষু শ্রামনদের আবাস বিহার, অতিথি-অভ্যাগতের জন্য পৃথক আবাস-গৃহ ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত। এই সঙ্ঘারামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। ইহার মাধ্যমে শিক্ষাকামিগণকে পালি, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। ইহা অভিজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষু দ্বারা পরিচালিত। ইহাতে শিক্ষার্থীদের থেকে কোন রূপ মাহিনা নেওয়া হয় না। অধ্যক্ষ মহাথের মাননীয় প্রেম রত্ন বড় মৈত্রী পরায়ণ, অতিথি পরায়ণ, অমায়িক লোক। আমাদের প্রতি তিনি যে সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন - তা আজীবন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করতে হবে। শাস্ত্রোক্ত আগন্তুক ব্রত নামে যে বিনয়ের বিধান রয়েছে তিনি তা কড়া-ক্রান্তিতে পালন করেছেন। উত্তর পশ্চিম মালয়েশিয়ায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ইহা অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

সারা দিন পথ শ্রান্তিতে সকলেই ক্লান্ত। কাজেই অদ্য সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করলাম। মধ্য রাত্রি অতিক্রান্তে আমি ঘুম থেকে উঠে অন্ধকারে যেই বের হলেম অমনি বিহারের লম্বা কেশবিশিষ্ট বড় কুকুরটি আমাকে আক্রমন করে বসল। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল চীৎকার করে অনাসৃষ্টি করিনি। ভাবলাম- কুকুরটি ভিক্ষুদের পালিত, আমি কখনও কুকুরকে হিংসা করি না। আমাকে এভাবে আক্রমন করবে কেন? আমার বিহারেও তো দুচারটি কুকুর আছে। আমার কুকুরগুলো কোন দিন কোন ভিক্ষুকে আক্রমন করে না অন্যকেও না। এই ভেবে আমার টর্চটি হাতে নিয়ে লাইটের ফোকাশটা অন্য দিকে না ফেলে ফেললাম আমার শরীরের দিকে কুকুরটি এবার আমাকে চিনল যে আমি একজন কাষায় বস্ত্র পরিহিত ভিক্ষু তদ্দর্শনে সে শান্ত হয়ে গেল। আমিও নিজকে নিরাপদ মনে করে প্রস্রাব কুটিতে চলে

গেলাম। ফিরবার পথে সে আমার দিকে তাকালও না।

পরদিন সকালে যথারীতি আচমন কর্মাদি সেরে বুদ্ধ-বন্দনা, মহাবোধি বন্দনার পর প্রাতঃরাশ গ্রহণের সময় দেখি, আক্রমণকারী কুকুরটি সেখানে হাজির। কুকুরকে মাখন লাগানো বিস্কুট যখন পর পর কয়েকটি দিলাম, তখন থেকে কুকুরটি আমার বন্ধু হয়ে গেল।

সাত

১৮ই এপ্রিল শুক্রবার। সকাল ৮টার সময় আমাদের ৩নং বাস এসে মহিন্দারামের সম্মুখে হাজির। অদ্য ফোর-তোয় হাই স্কুল হলে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হবে সাড়ে নয়টার সময়। আমরা যারা মহিন্দারামে ছিলাম, সবাই গিয়ে বাসে চাপলাম, বাস কয়েকটি রাজ-বীথি অতিক্রম করে ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে ফোর-তোয় হাই স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌছিল।

বাস থেকে নেমে স্কুলের বহিঃরূপ দে'খেই চক্ষু স্থির হয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক ইতস্ততঃ করে লক্ষ্য করলাম - বিশাল প্রতিষ্ঠান। অন্তরে জাগল-পাক-ভারতের প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর স্মৃতি। নালন্দা, বিক্রম শীলা, কনকস্তুপ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমতূল্য না হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি ঐ গুলোর একটা জীবন্ত রূপ বহন করেছে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান রূপে। বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক বাহক রূপে ইহা রাজন্য বর্গ পরিপুষ্ট প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা দর্শকের মনে জাগিয়ে তোলে। এই ফোরতোয় হাই স্কুলটি বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, দর্শন, পদার্থ বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র প্রভৃতি সহ বিদ্যা, বহু শিক্ষার যেরূপ বিখ্যাত পীঠ-স্থান এবং ইহার মাধ্যমে সমাজ ও দেশকে উন্নত করার জন্য ইহার কর্তৃপক্ষ গণ যেরূপ চেষ্টিত ও উদ্দীপ্ত; তদ্ধেতু ইহাকে আমি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে তুলনা না করে পারি না। অধিকন্তু এই অভিমত প্রকাশ করছি যে ইহা প্রাচীন শিক্ষা ও আধুনিক সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়-সাধিত সুবৃহৎ কেন্দ্র। প্রধানতঃ ইহা বৌদ্ধ জনগণের পরিপোষিত ও পরিচালিত। ইহাকে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান বল্লেও অত্যুক্তি হবে না।

প্রথমতঃ ফোর-তোয় প্রতিষ্ঠান বলতে একটি ভিক্ষুনী বিহার ও অনাথশ্রম ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন দু'জন বিদূষী ও উৎসাহী মহিয়সী মহিলা। একজন হলেন ভিক্ষুনী শ্রেষ্ঠ মাননীয় কু-অন্-ছোং এবং অপর একজন হলেন ওঙ্গ-লোঙ্গ-সু যাঁদের উৎসাহ ও কর্ম প্রবণতায় পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত হল-ফোর-তোর প্রাইমারী স্কুল। ক্রমশঃ স্কুলের সকল সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে আজ হাই স্কুলে পরিণত হয়েছে।

এই হাই স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার মান, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষক-মন্ডলী ও

প্রচুর ঘর-দরজা, বিপুল আসবাব-পত্র প্রভৃতি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও জাঁক-জমক দেখছি-তাতে বলা চলে, মালয়েশিয়ার এ প্রতিষ্ঠানের জুড়ি নেই। এ সব কারণে আমি আমাদের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এটার তুলনা করেছি। তাদের প্রাইমারী স্কুলের জুড়ি আমাদের হাই স্কুল। মালয়েশিয়াতে স্কুল শিক্ষার সমাপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। কলেজ শিক্ষা নামে মাঝে স্বতন্ত্র কোন শিক্ষা নেই। ফোর-তোয় হাই স্কুলের বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ১৮৯০ জন। শিক্ষক ৬৬ জন। তন্মধ্যে কয়েক জন আছেন বিদেশী ডিগ্রী-ধারী, বিদেশী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত।

তাছাড়া ফোর-তোয় প্রতিষ্ঠানের শিশু কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় শনিবার রবিবার শিশুদের যেই শিক্ষা দেওয়া হয় - তাতে তথাগত বুদ্ধের অমোঘ শিক্ষা ও করুণা বিধানে বহু লোক বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। শিশু সম্প্রদায়ের জীবন গঠন, যুব সমাজের চরিত্র গঠন, জনগনের জীবনের পবিত্রতা বিধান ও জীবন দুঃখের অবসানে বিপুল প্রেরণা দান করে আসছে। তা মালয়েশিয়ার বিশেষ করে বৌদ্ধ সমাজে নিরূপম সুনাম অর্জন করেছে। এই বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত বিরাট প্রতিষ্ঠানটি মালয়েশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

এই ফোর-তোয় ছাড়া আরো অনেকগুলো অনুরূপ প্রতিষ্ঠান মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে রয়েছে যেগুলো বাস্তবিক সমাজ হিতৈষণায় অগ্রণী। যেমন- মালাক্কা সিয়াং লিন প্রাইমারী স্কুল, পিনাঙ্গ বৌদ্ধ অবৈতনিক স্কুল ইত্যাদি।

স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকতেই দেখি -বিরাট হল গৃহ। ইহার এক ধারে বেদীর উপর ষড়-রশ্মি সমন্বিত পদ্মোপরি দণ্ডায়মান অনিন্দ্য সুন্দর এক বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। উহা মানস সরোবরে পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ষড়-রশ্মি-নির্গত-দেহ তথাগত বুদ্ধের কথা দর্শকের মনে স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রত্যেকটি রশ্মির আলোকচ্ছটা ষোড়শ হস্ত বিকীর্ণ। স্বচক্ষে না দেখলে এরূপ জ্যোতির্ময়ী প্রতিমার কল্পনা বা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

সর্ব্বোপরি বেদীর নীচের ধাপে বিস্তীর্ণ মঞ্চ - সেখানে গৌড়ীয় বসন পরিহিত পূজনীয় লামা, ভিক্ষু, সাধু সন্ন্যাসী উপবেশন করলেন।

তার নীচে বিরাট প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের উপর কুণ্ডলাকারে টেবিল-গ্যালারী সুসজ্জিত। টেবিল গ্যালারীর উপর পর পর প্রত্যেক আঞ্চলিক শাখা সমিতির নির্দিষ্ট আসনের সম্মুখে নিজ নিজ নামাঙ্কিত সাইন-বোর্ড রয়েছে এবং প্রায় সাইন-বোর্ডের সাথে একটি করে মাইক রয়েছে। আমরা আমাদের সাইন-বোর্ডের সামনে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লাম।

প্রত্যেক অধিবেশনের প্রারম্ভে পর্য্যায় ক্রমে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক স্বস্তি বাচন, পঞ্চশীল প্রদান, মঙ্গলাচারণ অনুষ্ঠিত হয়। অদ্য ১৮ তাং শুক্রবার এই

মহান আন্তর্জাতিক অধিবেশন আমাদের অন্যতম পাকিস্তানী প্রতিনিধি মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাথের পঞ্চশীল প্রদান ও স্তোত্র আবৃত্তি করলেন।

পিনাঙ্গের এই অধিবেশনগুলে কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। কারণ এ সকল অধিবেশনে গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনাবলীর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান প্রস্তাবনায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ বিরতি-মূলক শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রস্তাব গ্রহণ-পূর্বক বিশ্বের বিভিন্ন মহলে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

অতঃপর যে সব বিষয় নিয়ে অত্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হয়, সে বিষয়গুলো হচ্ছে এই ঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুব কেন্দ্র স্থাপন, বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সজ্মকে আন্তর্জাতিকীকরণ স্থায়ী কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সজ্মকে ইউনেস্কোর সাথে এক জোট করা ইত্যাদি।

প্রথমতঃ দক্ষিণ ভিয়েতনাম হতে এক প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয় যে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সামর্থ-হীন লোকের মধ্যে একটি সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র ও সংস্থা স্থাপন করা হোক। এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রতিনিধি দলের প্রধান নায়ক, ভিয়েতনামস্থ বৌদ্ধ অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্পর্কে এক জোরালো বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁর দেশকে অত্যন্ত ভাগ্যহীন বলে বর্ণনা করেন। কারণ সেখানে পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরে যুদ্ধের তাণ্ডব-লীলা চলে আসছে। ভাবাবেগ বিমিশ্রিত এক বক্তৃতায় তিনি তথাকার নিরীহ লোকদের উপর হত্যালীলা এবং বৌদ্ধ মঠ সমূহের ধ্বংস ব্যাপারে এক লোমহর্ষক বিবৃতি প্রদান করেন। এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যুব কেন্দ্র স্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন করেন যার কর্ম-কুশলতায় যুদ্ধের শিকারে পরিণত নিরীহ লোকদের জীবন রক্ষা করা যেতে পারে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামী নায়কের বক্তৃতা সমাপ্ত হওয়ার পর অধিবেশনে এক হৃদয়গলানো ভাবের সৃষ্টি হল কারণ, তাঁরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করে মানবতা-বাদী প্রতিনিধিগণ গভীর ভাবে মর্ম্মাহত হলেন ও ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

আমাদের সাধারণ সম্পাদক মিঃ দেব প্রিয় বড়ুয়া এই সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলেন যে আপাত দৃষ্টিতে এই প্রস্তাবনায় একটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ট দেশের সমস্যার ব্যাপারে মানবিক যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। বস্তুতঃ ব্যাপারটিকে যতই সরল, সহজ ও তর্কাতর্কির উর্দ্ধে বলে মনে করা যাক না কেন ইহা একেবারে আপদমুক্ত নয়। ইহাতে অনেক গূঢ় রাজনৈতিক রহস্যপূর্ণ চিন্তা ধারা হয়েছে। এই জাতীয় প্রস্তাবনার সাথে জড়িত হওয়ার অর্থ-অত্যন্ত কৌশলে ও অবশ্যম্ভাবিতার মাধ্যমে একটা রাজ্যের সমস্যার সাথে পক্ষাপক্ষের মধ্যে আমাদের সকলকে জড়িত করা। বিশেষ করে আমাদের দেশের মত একটা নিরপেক্ষ দেশের পক্ষে এই জাতীয় প্রস্তাব

সমর্থন করা নিতান্ত বিপজ্জনক। কারন ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের দেশ যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকার মৌলিক মনোভাব গ্রহণ করেছে - সে ভূমিকা প্রহসনে পরিণত হবে।

অবশেষে মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবাবেগ বর্জিত ও বুদ্ধি-বাদী মনোভাব নিয়ে আলোচনার দরকার আছে। এই মহান সম্মেলনের একমুখী ভাব তরঙ্গে একমাত্র মিঃ বড়ুয়াই এই প্রস্তাব সম্পর্কে তীব্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনার সূত্র-পাত এমন ভাবে করলেন যে বিশ্ব বৌদ্ধ প্রতিনিধি ভ্রাতাদের সুকুমার মনোবৃত্তিতে কোনরূপ আঘাত লাগে নি।

প্রথমতঃ মিঃ ডি, পি, বড়ুয়া সভায় দণ্ডায়মান হয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি সহানুভূতির স্বরে এই দুর্ভাগ্য-জনক পরিস্থিতির জন্য গভীর উদ্বেগ ও গভীর সমবেদনা প্রকাশ করলেন তিনি সভায় প্রকাশ করেন ভিয়েতনামের বৌদ্ধ জনগণের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণে তিনি মর্ম্মন্তুদ ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে নায়কের বক্তৃতায় সকলের অনুভূতিকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে - বৌদ্ধ হিসাবে ও মানুষ হিসাবে অবশেষে আমাদের সাধারণ সম্পাদক ভিয়েতনামী প্রতিনিধি দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে প্রতিনিধি দল চান কিনা যে একটি যুবকেন্দ্র স্থাপনার উদ্যোগ করা হোক অথবা পূর্ব থেকেই ভিয়েতনাম যুবকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা এই প্রশ্নের ইঙ্গিত দিয়েই সাধারণ সম্পাদক ব'সে পড়লেন- যাতে সভার ভাব তরঙ্গ পৌছে, যাতে বিশ্বের প্রতিনিধিবর্গ যথার্থ বিষয় অনুধারণা, আলোচনা ও সুবিন্যস্ত ভাবে চিন্তা করতে পারেন।

দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রতিনিধি দল অবগত করাল যে তাঁরা চান যে এই সম্মেলন দক্ষিণ ভিয়েতনাম সমাজ কল্যাণ ও যুবকেন্দ্র স্থাপনাকে সমর্থন করুন। আর ভিয়েতনামে ইতোপূর্বে এই জাতীয় কোনরূপ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় নি।

পুনরায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক মিঃ বড়ুয়া আলোচনায় যোগদানের উদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করলেন এবং বললেন কোন দেশ বিশেষের জটিল সমস্যার মধ্যে কোন নতুন কেন্দ্র স্থাপন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংজ্ঞের কিংবা ইহার সম্মেলনের আওতা বা দায়িত্বের মধ্যে আছে কিনা গভীর ভাবে ভাবতে হবে। অবশ্য পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন কেন্দ্রকে সমর্থন দেওয়ার প্রশ্নে আলোচনা চলতে পারে।

ইত্যবসরে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি দল ভিয়েতনামে যুবকেন্দ্র স্থাপনার পক্ষে জোরালো সমর্থন জ্ঞাপন পূর্বক বক্তৃতা দিলেন।

মিঃ ডি, পি, বড়ুয়া তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন যে এ জাতীয় মনোভাব বা সমর্থন জানাতে গেলে ইহা প্রতীয়মান হবে যে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সজ্ঞ এবং ইহার সম্মেলন প্রধান হোতা হিসাবে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। তখন যে কোন দেশ

একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করার জন্য এবং তাতে সমর্থন পাওয়ার মানসে সর্বদা এগিয়ে আসবে। এই জাতীয় ব্যাপারে বিশ্ব সঙ্ঘকে নিষ্প্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি ও অনর্থক তর্কাতর্কির দিকে নিক্ষেপ করবে অতএব ইহা যুক্তিসঙ্গত ও যথোচিৎ হবে যে এই সম্মেলন কোন অমূর্ত প্রকল্পের আলোচনা করবেন না। বরং কোন বাস্তব বিষয়ের প্রস্তাবনায় সমর্থনের প্রশ্ন বিবেচনা করবেন।

অবশেষে এই তর্কাতর্কির মধ্যে সম্মেলনের সভাপতি প্রতিনিধি বর্গের মতামত সন্ধান করলে সকলেরই এক বাক্যে মত হল যে এ জাতীয় প্রস্তাব বাদ দেওয়া উচিৎ। কারণ সেখানে মূর্ত বলে কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এরূপে প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে বাতিল করা হয়।

সাড়ে এগারটায় মিটিং থেকে উঠে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ফোর-তোয় প্রতিষ্ঠানের পিছনের দিকে চলছি। সম্মুখে যত অগ্রসর হচ্ছি ততই চোখে ঝলক লেগে যায়। বিরাট বুদ্ধ মন্দির, জ্যোর্তিময়ী বিগ্রহ। প্রত্যেকটির গঠন প্রণালীর বৈচিত্র্য প্রতিভাত হচ্ছে আমার চোখে। বিচ্ছুরিত প্রভা উদ্ভাষিত হচ্ছে চারদিকে। বেদীর উপরে ধূপধুনা ও দেউল পুঞ্জ অবিরত জ্বলমান। আমি সারা জীবনের সকল প্রকার মৌন আকুতি বিবশ করে নিবেদন করলাম।

আরো অগ্রসর হতেই দেখি - প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ সমগ্র প্রাঙ্গণে বিশ্ব ভ্রাতাদের জন্য সজ্জিত টেবিলের উপর খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্য-পেয় ও চুষ্য সর্ববিধ আহারের অপূর্ব সমাবেশ। আমরা এক টেবিলের সামনে বসে গেলাম। প্রথমতঃ খাদ্য-দ্রব্যাদি দেখেই অন্তরে লোভ জেগেছে। অবশ্য চোখে যা তৃপ্তি কর জিহ্বার আস্বাদনে অতৃপ্তি হওয়ার কারণে নেই। বড় আরামের সহিত ভোজন-কৃত্য সমাপন করলাম।

কিছুক্ষণ পরেই ঘোষণা করা হল সকল প্রতিনিধির প্রতি অনুরোধ সবাই যেন স্কুলের সম্মুখে খেলার মাঠে একত্রিত হন সেখানে সকলের সম্মিলিত ফটো তোলা হবে।

প্রথমতঃ মনে একটু বিরক্তির সঞ্চার হয়। কারণ আজ প্রখর রৌদ্র কিরণ, অসহ্য গরম। এই গরমের মধ্যে মাঠে কি দাঁড়ানো যাবে? এদিকে আমার নেই স্বাস্থ্য, নেই চেহারা, ফটো তোলার অত আনন্দ কি আমার আছে? পাসপোর্টের প্রয়োজন ছাড়া আমি তো জীবনে ফটো তোলার চিন্তাও করি নি। ভাবলাম-গরম হলেও ইহার গুরুত্ব আছে। আমি মনে করি, - আমি তাঁদের কোন প্রয়োজনে না আসতে পারি; কিন্তু তাঁরা তো আমার প্রয়োজনে যথেষ্ট আসবেন। এই বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতাগণকে কি জীবনে কোন দিন কোন স্থানে ঠাণ্ডার সময় পাওয়া যাবে? এই বলে অনিচ্ছা সত্ত্বে হলেও মাঠের দিকে রওনা দিলাম। তথায় দুই সারিতে চেয়ার সাজানো। সামনের একটিতে বসে পড়লাম। অপর সব-কেউ বসলেন কেউ দাঁড়ালেন। আর যে যত

পারল - ক্যামরা টিপল। খালি পর পর শুনা গেল Ready please, One-two-three, O.K.

মাঠের থেকে সভা-গৃহে ফিরলাম। আড়াইটার সময় আবার অধিবেশনের শুরু হল।

দ্বিতীয়ত ঃ আর্থিক সাহায্য প্রদান উপলক্ষে থাইল্যাণ্ড সরকারের ভূমিকা বিবেচনায় প্রারম্ভিক সম্মেলন ব্যাঙ্ককে স্থায়ী কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর স্থাপন করার ব্যাপারে প্রস্তাব পাশ করলেন। পরে ইহা পিনাঙ্গ সাধারণ সম্মেলনের অনুমোদন পূর্বক দৃঢ়ীভূত করার প্রাক্কালে থাই সরকারকে অনুরোধ করা হয় - যেন থাই সরকার কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরকে ব্যাঙ্ককে স্থায়ী ভাবে স্থাপন উৎসবটিকে অবলম্বন করে স্মরণিকা মুদ্রা বের করেন। অবশ্য, স্থায়ী কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর স্থাপনার ব্যাপারে পূর্বেই সব কিছু ঠিক-ঠাক হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানী দলের উক্ত সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করার কোন সুযোগই হয়নি।

তথাপি সাধারণ সম্মেলনে আমাদের সাধারণ সম্পাদক - মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া থাইল্যান্ড কর্তৃক স্মরণিকা মুদ্রা বের করা প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করেন, - যেই আলোচনার প্রভাবে প্রতিনিধিবর্গের অনেক অন্ধতা অপসারিত হয়ে গেছে। মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া স্থায়ী কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর ধারণাটিকে পূর্ণভাব হৃদয়ঙ্গম করে তার পরিচালিত ব্যাপারে কতকগুলো গুরুত্ব পূর্ণ দিক আলোচনা করেন। এতে প্রতিনিধি বর্গ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়ে যান - এই জন্য যে, এতগুলো অপ্রিয় অথচ বাস্তব সত্যের সমালোচনা তিনি যে করতে পারবেন - এতে কারো ধারণা ছিল না।

তিনি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন - ব্যাঙ্ককে স্থায়ী সদর দপ্তর স্থাপন একটা উল্লেখ যোগ্য ও স্মরণীয় সিদ্ধান্ত কিন্তু এ কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘ যেন বিশ্ব বৌদ্ধ অধ্যুষিত সমগ্র দেশ সমূহের আস্থাভাজন থাকেন ও সমগ্র বৌদ্ধ জগতে প্রতিনিধিত্ব প্রদানে সক্ষম হন। সেই দৃষ্টি কোণ থেকে কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে লোকজন মনোনয়ন অথবা নির্বাচন করে কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে কর্মকর্তা মনোনীত করতে হবে। নচেৎ কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে শুধু একটা বিশেষ রাষ্ট্রের প্রাধান্য থাকবে। ফলে বিশ্বের কোন একটা বৌদ্ধ দেশ নিরুৎসাহ হতে পারে। এ জন্য মিঃ বড়ুয়া আন্তর্জাতিক সেক্রেটারিয়েট গঠনের পরামর্শ দেন।

মিঃ ডি, পি, বড়ুয়া আরো মন্তব্য জ্ঞাপন প্রসঙ্গে জাতিসঙ্ঘ, ইউনেস্কো ও বিশ্বের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে একটা তুলনা-মূলক বর্ণনা উত্থাপন করলেন ও এই ইঙ্গিত প্রদান করলেন যে আমাদের এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে আসন প্রদান পূর্বক কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সংসদ স্থাপন একেবারেই সঙ্ঘের গোড়ার কথা। কাজেই বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরকে

আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া উচিৎ। ইহার মধ্যে বিভিন্ন দেশের লোক থাকতে দেওয়া হোক। তা হলে বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুসারী দেশগুলোর মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও সংহতি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যে উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে একদা এই বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের গোড়া পত্তন হয়েছিল।

ব্যাঙ্ককে স্থায়ী কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর স্থাপনার কারণ প্রদর্শন করে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক - মিঃ সঙ্ঘবাসী বললেন যে কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের ব্যয়-ভার চালিয়ে নেওয়া একটি বিরাট সমস্যা; যেহেতু বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে খরচাদি চালান সম্ভব পর হয় নি। কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরকে থাইল্যাণ্ড সরকারের আর্থিক সাহায্যের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। যেহেতু অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-ভার সদস্য রাষ্ট্রগুলো বহন করে থাকে। তদ্ধেতু বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের ব্যয়-ভার বহনও সদস্য রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে উক্ত নীতি সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের কর্মচারী নিয়োগের সূত্রটির মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলো আর্থিক সমর্থন প্রদানের নীতিটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত প্রতিনিধি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সোভিয়েত প্রতিনিধি বল্লেন যে কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের অধঃস্তন সম্পাদক মণ্ডলী বিভিন্ন দেশ হতে নেওয়া হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ হতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হোক।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সংসদের পরিচালক মণ্ডলী নির্দ্ধারণ করার উহাই একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা বলে বিবেচিত হয়।

এরূপে সম্মেলনে থাইল্যাণ্ড সরকারকে স্মরণিকা প্রতীক প্রচার করবার অনুরোধ প্রস্তাবটি ও সোভিয়েট প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে পাশ করা হয়।

বেলা এখন পাঁচটা। আজকের জন্য অধিবেশনের কাজ বন্ধ হলো। আমরা চললাম বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে। যে সকল গাইড আমাদিগকে নিয়ে চলল, তারা চীনা বাদামের কয়েকটি পুটুলি গাড়ীতে তুলে নিল এবং কতেক ছোট ছোট চাপা কলার কাঁদিও নিল। বাদাম ও চাপা কলা দুটোই উপাদেয় খাদ্য। আমার ধারণা - এরা হয়তো সদয়ে সদ্ব্যবহার করবে। প্রতিনিধি বর্গের সামান্য সন্তোষের সৃষ্টি করবে।

যথাসময়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে পৌছলাম। বাস থেকে নেমে বাগানে ঢুকেই দেখি-বড়োই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। অসংখ্য পাদপ শ্রেণী পত্র পল্লবে পল্লবিত, ঘন সবুজ বর্ণের লতা বিতান। প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের অপূর্ব নিদর্শন, তাতে আবার মনুষ্য বুদ্ধির কারু-কার্য্য। বিচিত্র দৃশ্য। পর্বতোপরি জলাশয়, তাতে পদ্ম-

ফুলাদি জলীয় উদ্ভিদের চাষ নগরের উপকণ্ঠে অনুচ্চ পর্বত মালায় ক্রমশঃ ঢালু পাদদেশ-তারই মাঝে এই উদ্যান পরিশোভিত। ফুল বৃক্ষ, ফল বৃক্ষ, মূল্যবান কড়ি কাঠের বৃক্ষ, পত্র বাহার আর কত যে বিচিত্র লতা-গুল্ম রয়েছে এই উদ্যানে। দেখলে নয়ন জুড়িয়ে যায়। মন মোহিত হয়ে যায়। প্রকৃতির মাঝে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র সমারোহ।

বৃক্ষ তরুলতাদি মানুষের চির সাথী। মানুষের নির্জীব বন্ধু, স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি, মানুষের জীবন রক্ষা, সৌন্দর্য্য রক্ষা করে আসছে-এই উদ্ভিদের। মানুষ সৃষ্টির জীবের শ্রেষ্ঠ হলেও মানুষের সাথে মানুষের বিরোধ ঘটে, পশ্চাচার হয়। কিন্তু উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কোন হিংসা বিরোধ নেই। বরং যেই কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় মানুষ অন্যায় অবিচার করে থাকে। সংসারে বাঁধা পড়ে। জেল জরিমানা ভোগ করে, সেই রিপুর তাড়না থেকে মুক্তি লাভের আশায় মানুষ নির্জন বনান্তে, নিভৃত মূলে ও অরণ্যানীর আশ্রয় নেয়। তাই বলি বৃক্ষ তরুলতাদি পরম পবিত্র। মানব জীবনের মূর্ত মুক পরম বন্ধু।

কিয়দ্দুর অগ্রসর হতেই দেখি-অসংখ্য চতুস্পদ জন্তু। চিত্র বিচিত্র পক্ষীর ঝাঁক ও বন্য বানরের পাল। কেহ বৃক্ষের উপরে, কেহ মাঝে, কেহ বা মাটিতে দ্বি-পদ প্রাণীর থেকে হাতে হাতে কলা নেয়, নিক্ষিপ্ত উক্ষিপ্ত বাদামের লুট কুড়িয়ে খায়। কি অপূর্ব আনন্দ মানুষের সাথে বন্য পশু পাখীর মধুর মিলন। আমাদের ঢাকা বিহারের পুকুরের যে সকল মাছ রয়েছে এগুলোও মানুষের হাত থেকে খাদ্য দ্রব্য ঠোকর মেরে খায়। হাতের আওতায় এসে আনন্দে কেলি করে। ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই, যদি হিংসা লোভের আভাস পায়, তবে কি আর শ্যাম আমার সাক্ষাৎ পায়। পশু হোক, পক্ষী হোক, আর মানুষই হোক, যেখানে ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, মৈত্রী-করুনা, দয়া দাক্ষিণ্য সেখানেই পরস্পর সমান,পরস্পর আপন ও সহানুভূতি সম্পন্ন, সেখানে এক দুই গণনায় জনসংখ্যা অসংখ্য হলেও প্রীতির বাঁধনে এক ও অভিন্ন সেখানে বিষাদ-বিসম্বাদের কারণ থাকলেও কার্য্যতঃ বিবাদ-বিসম্বাদের উপদ্রব হয় না। প্রেম-প্রীতির চাপে অতলে তলিয়ে যায়। শান্তি নিবিড় নীড় গড়ে ওঠে।

বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল মহিন্দারামে এসে স্নান, বন্দনাদি সান্ধ্য-কৃত্য সেরে নিলাম এবং বসে বসে বন্ধু বান্ধবের সাথে কতক্ষণ গাল গল্প করলাম।

অতঃপর আমরা হোটেল মন্দরিণে উপস্থিত হলেম। বিশ্বের সকল প্রতিনিধি তথায় সমবেত হলেন। হোটেল কর্তৃপক্ষ সম্মানিত আগন্তুকগণের আনন্দ বর্দ্ধন ও সম্মানার্থে কর্ণ-সুখ কর বহুবিধ বাদিজ ও নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করলেন। চীন দেশীয় বাদ্য-যন্ত্র দেখতে যেমনি নয়নাভিরাম, তেমনি মনোমুগ্ধকর ইহাদের ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী স্বর লহরীর সুমধুর ধ্বনি। হোটেল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ভোজন-কৃত্য আরম্ভের পূর্বে ডাঃ জে, পি, মলল শেখর ভোজ-সভায় কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিলেন। হোটেলের

দারুণ হৈ হল্লার দরুন তাঁর বক্তৃতা আমি কিছু বুঝতে পারি নি। অতঃপর হোটেল মন্দরিণ থেকে আমরা ফিরে এলাম রাত্রি দশটায়। আজ আর কোন রূপ কার্য্যক্রম না থাকায় রাত্রি সোয়া দশটায় সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা বলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আট

আজ ১৯শে এপ্রিল শনিবার। ভোর পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করার সাথে সাথে সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা বলে জগতের সকল প্রাণীর প্রতি শুভেচ্ছার বাণী উচ্চারণ করলাম এবং আচমন-কৃত্যাদি সমাধা করলাম।

প্রত্যহ ভোরে তন্ ছেং গুয়ান নামে একজন ভদ্রলোক গাড়ী করে ভিক্ষুদের জন্য খাদ্য-ভোজ্য নিয়ে মহিন্দারামে এসে পৌছেন। অদ্যও তিনি নিত্য কর্মের পুনরাবৃত্তি করলেন আজ তিনি যে খাদ্য পরিবেশন করলেন-তা হচ্ছে সিংহল দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্য। সাদা তুলতুলে বড় মোলায়েম এক প্রকার সুস্বাদু পিঠা। নারিকেলের দুগ্ধের প্রস্তুত তরকারীর জুসের সহিত মুখে পুরলে অমৃতের স্বাদ তুচ্ছ করে। তদুপরি মাখন-জেলি সর্করা মিশ্রিত টোষ্ট কফি, চা, কলা আরামের সহিত খেয়ে নিলাম মহিন্দরামের প্রাতঃরাশ।

অমনি আমাদের ৩নং বাসের গাইড এসে খবর দিল, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী। যেতে হবে অধিবেশন হলে, ফোর-তোয় হাই স্কুল। নয়টা থেকে অধিবেশন কার্য্য আরম্ভ এবং আজই ১১টায় অধিবেশনের পরিসমাপ্তি।

আমরা মহিন্দারামস্থ প্রতিনিধি মণ্ডলী সবাই বাসে চাপলাম এবং যথা সময় অধিবেশন হলে গিয়ে পৌছলাম। বিশ্বভ্রাতা সবাই এসে পৌছলেন এবং যার যার নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন।

তৃতীয়তঃ ব্যাঙ্ককে স্থায়ী কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর স্থাপন উপলক্ষে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকার সমূহ যাতে স্মরণিকা উৎসব পালন করেন, সেই জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে সিংহল প্রতিনিধি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সিংহল প্রতিনিধি তাঁর মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে তাঁর দেশও এ ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হতে পারে। সিংহল এমন একটি দেশ-যে দেশটি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘ স্থাপনার সময় অগ্রগামী দেশ সমূহের অন্যতম ছিল। সিংহলের কলম্বোতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘ স্থাপনে সিংহল আশা করেছিল যে বরাবরই সঙ্ঘে তার নৈতিক প্রাধান্য বিরাজমান থাকবে। কিন্তু ব্যাঙ্ককে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পরক্ষণ হতেই সিংহল যেন কি একটা হারিয়ে ফেলেছে। বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রে স্মরণিকা উৎসব পালন করা হোক প্রস্তাবে সিংহলের ব্যক্তিগত মনোব্যাথাই যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। মন্তব্য করলেন যে যেহেতু কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর ব্যাঙ্ককেই স্থাপিত করার উদ্যোগ আরম্ভ করে ছিল। সুতরাং কেবল মাত্র থাইল্যাণ্ড সরকারকে স্মরণিকা উৎসব পালন করার জন্য অনুরোধ করা হলেই যথোচিৎ হবে। সিংহলের প্রস্তাবটি সমর্থন করার জন্য কেহই অগ্রবর্তী হল না।

অবশেষে আমাদের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি, পি বড়ুয়া প্রস্তাবের পক্ষে দণ্ডায়মান হলেন এবং মালয়েশিয়া প্রতিনিধির বক্তব্যের জবাব দান কালে বললেন যে কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর স্থাপন ব্যাপারটি যদি আনন্দের বিষয় রূপেই বিবেচিত হয়,তবে যে কোন দেশই আনন্দ উৎসব পালন করুক, ইহা বাধা দেওয়া উচিৎ হবে না। বাধা দেওয়ার পশ্চাতে কোন যুক্তি নেই। প্রত্যেকেরই আনন্দ করার অধিকার আছে।

এই বাদানুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অধিবেশনের সভাপতি মিঃ মিয়াবারা যখন ভোট নিতে আরম্ভ করলেন, তখন দেখা গেল সিংহলের প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল।

সিংহলকে সমর্থন প্রদান করাতে সিংহল পরে আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আমাদের প্রতিনিধি দল কারো বিরোধিতা না করে সকলের সৌহার্দ্য ও সদিচ্ছা লাভ করেছেন।

চতুর্থতঃ- বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের পক্ষ হতে এই মর্মে একটি বলিষ্ঠ প্রস্তাব গৃহীত হল যে ইউনেস্কোকে অনুরোধ করা হোক যাতে ইউনেস্কো বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘকে স্বীকৃতি দেয়, যাতে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘ একটি বেসরকারী ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন স্থানে কনসাল পাঠাতে পারে। ইউনেস্কোর সাথে যুক্ত প্রচেষ্টায় যাতে বুদ্ধের আলোকে বৌদ্ধ শিল্পকলা ও কৃষ্টির মূল্যায়ন সংগঠন করবে এবং যাতে পৃথিবীতে শান্তির বার্তা প্রচার করবে।

প্রস্তাবটি আগেই বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচিত হয়ে ছিল। প্রস্তাবটির আলোচনার ক্ষেত্র ছিল শিল্পকলা, কৃষ্টি ও সাহিত্য প্রকাশনা কমিটি। যে কমিটিতে আমাদের সাধারণ সম্পাদক মি. দেবপ্রিয় বড়ুয়া অন্যতম সদস্য ছিলেন।

উক্ত কমিটি পরিকল্পনা করল যে, এমন একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করা হোক যা ইউনেস্কোর সাথে একত্রীভূত হওয়ার সোপান হিসাবে কাজ করবে। আলোচনা চলাকালে মালয়েশিয়া প্রতিনিধি বিশেষ কমিটি নিয়োগ প্রকল্পটির বিরোধিতা করে ছিলেন এবং বলে ছিলেন যে সম্মেলন কার্য্য নির্বাহক কমিটিকে বিষয়টি আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করুক।

মিঃ ডি.পি. বড়ুয়া এই ইঙ্গিতটির বিরোধিতা করে বললেন যে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ সম্পর্কিত অনুরূপ একটি প্রস্তাব গত ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের চেংমাইর সাধারণ

অধিবেশনে আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু কার্য্য নির্বাহক কমিটি তাঁদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীয় অন্যান্য কাজের ঐ প্রস্তাবটির বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এই প্রস্তাবটি অতীব ব্যাপক ও এতে সার্বক্ষনিক মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হোক।

মিঃ বড়ুয়া শুধু এই বলেই ক্ষান্ত হলেন না। অধিকন্তু তিনি প্রস্তাব করলেন যে বিষয়টি কার্য্য নির্বাহক কমিটির নিকট পেশ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। এই অধিবেশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে উহা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আইন বলে বিবেচিত হবে এবং তাতে অনুরোধ উপরোধ জড়িত থাকবে না। অবশ্য বিশেষ কমিটিতে কাদের নেওয়া হবে-সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যনির্বাহক কমিটিই চুড়ান্ত করবে। এই অধিবেশনে নাম নির্ধারণ করতে গেলে ধাঁধায় পড়তে হবে। এবার সিংহল পাকিস্তানকে সমর্থন করল। এ রূপে ইউনেস্কোর উদ্দেশ্যে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি সর্বসম্মত ক্রমে পাশ হয়ে গেল। তবে বিভিন্ন দেশ হতে সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারটি কার্য্যনির্বাহক কমিটির হাতেই ন্যস্ত রইল।

কন্‌ফারেন্স বৈঠকগুলোর কার্য্য সমাপ্ত হল। মাঝে মাঝে মত ও পথ নির্ধারণের ব্যাপারে সাধারণ মতানৈক্য দেখা দিলেও যবনিকা পতনের পূর্বাহ্নে মিলনের সর্বতোমুখী চরম সুরটি ঐক্য-তানেই বেজে উঠল।

এখন বেলা ১১টা বাজে। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় উপস্থিত। আমরা সবাই চললাম এন্ সন্ রোডস্থ পিনাঙ্গ বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠানের দিকে। কতিপয় মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাস বিহারের দরজায় এন্ এস্ রোডের উপর থামল। বাস থেকেই দেখতে পেলাম - প্রশস্ত রাজপথের ধারে বিস্তীর্ণ ভু-খণ্ডে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠান। বর্হিভাগ দেখেই বিস্মিত হয়ে গেলাম। অদ্ভুত তার গঠন প্রণালী প্রতিষ্ঠানের সম্মুখ দেশটায় পাশাপাশি কয়েকটি গোল পার্ক। প্রত্যেক পার্কের কেন্দ্রে অতি উচ্চ সুচারু দর্শনের প্যাগোডা বা চৈত্য। চৈত্য-গাত্রে উপরি ভাগের চর্তুপার্শ্বে বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। চৈত্যের চতুর্দিকে সুসজ্জিত পুষ্প বাগান। এমনি ভাবে প্রকৃতিকে কেটে ছেটে ইচ্ছা মত তারা সমান সুন্দর সংযত করে রেখেছে। তা নয়ন গোচরে আসলে কার না নয়ন মোহিত হবে।

অভ্যন্তরে যাওয়ার পর প্রাণ-স্পন্দন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই মন্দিরে ও পিঠাপিঠি দ্বি-বিপরিত মুখী বিরাট প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। এক পার্শ্বে তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্য-মণ্ডলীর প্রতিমুর্তি। অপর পার্শ্বে অমিতাভ। অক্ষোভ্য, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বোধি সত্ত্বাগণের প্রতিমূর্তি। এই মূর্তিগুলোর গঠন, বেদীর কারুকার্য্য ও মন্দিরের আকার সম্পর্কিত বর্ণনার ভাষা আমার নেই। থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম ও মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় ক্ষেত্র এই মন্দির। এই মন্দির গঠনের যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার মাল-মসলা সুদুর ইটালীর থেকে সংগৃহীত ও বিদেশী শিল্পীর নির্মিত। এখানকার চীন সম্প্রদায়ের লোকেরা বড় ধনী দেদার টাকা তাঁরা খরচ করেছে এই প্রতিষ্ঠানের

জন্য। চীনা জাতির জাতীয়তা বোধ, ত্যাগ, ও নৈপুণ্যের নিদর্শন প্রত্যেক ক্ষেত্রে। চীনের রাষ্ট্র নায়ক সুন-ইয়াত সেনের সমাধি মন্দির করতে গিয়ে যে জাতি কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করতে পারে-ধর্ম মন্দির করতে গিয়ে তারা যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে সক্ষম-তাতে আর আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে?

আরো অভ্যন্তরে গিয়ে দেখি-প্রকাণ্ড ভোজনালয় সারাটি ভোজনালয়ে ইউরোপীয় খাদ্য ভোজ্যের পারিপাট্য টেবিলের উপর সাজানো। আমরা এক টেবিলে বসে পরম তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিলাম। আহারের কিছুক্ষণ পরে পিনাঙ্গ পাহাড় দর্শনে যাওয়ার আয়োজন হল।

এমন সময় দেখি-আমাদের মাননীয় মহাথের বিহারের পিছনের দিকে গেলেন। আমি মনে করলাম। তিনি পায়খানায় কিংবা প্রস্রাবে গেছেন। তাই আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি আসলে এক সঙ্গে বাসে উঠব। কিন্তু আমার অলক্ষ্যে কোন্ সময় এসে তিনি বাসে চাপলেন, আমি টের করতে পারিনি। ইতিমধ্যে আমাদের ৩নং বাস ছেড়ে গিয়েছে। আমি চেতনা পেয়ে অগত্যা অন্য বাসে উঠেই দেখি আমাদের মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া বাসে বসে আছেন। তিনি আমাকে ডেকে বসালেন। ইহাই সর্বশেষ বাস। এটা হারালে সারা দিনের জন্য আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। পিনাঙ্গ পাহাড়ও আর দেখা হত না।

পিনাঙ্গ বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠান, পিনাঙ্গ।
Buddhist Institute of Penang, Buddhist Association

বাসখানি শহরের বহু রাস্তায় ঘুরে ফিরে পিনাঙ্গ পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে যান-বাহন আবর্তিত হয়, যেখানে কুণ্ডলাকার বেদীর উপর বিদ্যুৎ চালিত প্রস্রবন অবিরাম বেগে প্রবাহিত হয়, সেখানে গিয়ে থামল। এই কৃত্রিম ঝর্ণার পাশেই ছোট একটি পাকা কুটীর। ইহা দেখতে বড় সুন্দর। ইহার পিছনে প্ল্যাট-ফরম। যাত্রীদের বিশ্রামাগার, টিকেট ঘর এবং অন্যান্য সব রয়েছে। ইহাই পিনাঙ্গ পাহাড়ের রেলওয়ে ষ্টেশন।

আমরা বাস থেকে নেমে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করে দেখি-ছোট্ট একখানি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা করাচির ট্রামের মত। বিদ্যুৎ চালিত এই গাড়ী। সারা জীবন সমভূমিতে আমাদের বাস। দেশের এক ধার থেকে অপর ধার পর্যন্ত বিলম্বিত রেল লাইন দেখতে পাই; কিন্তু দেখি তার ব্যতিক্রম। পর্ব্বত গাত্রে খাড়া একটি রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত ইহার ঠিক মাঝা-মাঝি স্থানে দুইটি গাড়ী পাশাপাশি অতিক্রম করার জন্য অল্প কতটুকু লাইন দ্বি-গুণ করা হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে প্রথমতঃ অন্তরে রীতিমত ভয়ের সঞ্চার হয়। পরে অন্যান্য যাত্রীদের উঠা-নামা দেখে ভয়ের স্থানে সাহস পেলাম। অতঃপর আরোহনের জন্য ঔৎসক্য ও কৌতুহল জেগে বসল।

প্রত্যেক গাড়ীর একটা বগী দুইটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। একটি প্রকোষ্ঠ প্রথম শ্রেণী ও অপরটি দ্বিতীয় শ্রেণী যাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। খুব বেশী হলে ৩০ জন যাত্রীর বসবার যোগ্য এই গাড়ী। আমরা প্রতিনিধি বর্গ যখন গাড়ীতে চাপলাম, তখন গাড়ীর বিভেদ আর রইল না। গাড়ী মন্থর গতিতে ফির্ ফির্ কির্ কির্ শব্দে উপরের দিকে উঠতে লাগল। ভীতি মিশ্রিত আনন্দ অন্তরে গুমরে গুমরে উঠল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের গাড়ী বিপরীত গামী অপর একটি গাড়ীর পাশ কাটিয়ে অর্ধ পথের ষ্টেশনে গিয়ে থামল। আমি মনে করলাম-এই-ই বুঝি সীমান্ত। কিন্তু ক্ষণেক পরেই আমাদের গাইডের নির্দ্দেশে আমরা অপর একটি গাড়ীতে চাপলাম। ইহাও ফির্ ফির্ কির্ কির্ শব্দে লাইনের সীমান্তে গিয়ে থামল। এই সীমান্ত ষ্টেশনের উচ্চতা সমুদ্র রেখা থেকে ২৪২৩ ফুট। কিন্তু (Funi cular Railway) রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ৬৩৫০ ফুট। এই অত্যুঙ্গ পর্বত গাত্রে চড়াই ও উৎরাই রেল পথ জগৎ বক্ষে খুব কমই দেখা যায়। একটি আছে ইউরোপের সুইজারলেণ্ডে অপরটি আছে-চীনের হংকং এ আর তৃতীয়টি রয়েছে মালয়েশিয়ার এ পিনাঙ্গ। জগতে আর কোথাও এরূপ অদ্ভুত রেল লাইন আছে বলে আমার জানা নেই। ইহা দেশী-বিদেশী লোকের দর্শন ও উপভোগের চমৎকার বস্তু।

আমরা গাড়ী থেকে অবতরণ করে পর্বত দেহের সুবিন্যস্ত আঁকা-বাঁকা পাকা রাস্তায় পায়দলে গিয়ে পৌছলাম পর্বত শীর্ষের নন্দন-কাননে। এখানে রয়েছে কয়েকটি কুণ্ডলাকারের মনোজ্ঞ পার্ক। তাতে সুরম্য পুষ্প নিকেতন। শিশুদের খেলা-ধুলার

মাঠ, পুলিশ-কোয়ারটার, একটি সম্ভ্রান্ত রেঁস্তোরা। অতিশয় মনোরম ছোট্ট একটি মসজিদ। মসজিদের পাশেই দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুদের ধর্ম মন্দির। এই মসজিদ ও মন্দিরের মাঝে বিশেষ কোন ফাঁক নেই। এই অন্তরাল বিহীন মসজিদ ও মন্দিরের অবস্থানটি আমার চোখে পড়ে গেল। ইহাদের সহাবস্থান বললে অত্যুক্তি হয় না। কিরূপে এখানে হিন্দু-মুসলমানগণ পাশাপাশি অবস্থান করে তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন? এ কথা আমাদের গাইডকে জিজ্ঞাস করে জানলাম-মালয়েশিয়ার জনগণের বসবাস শান্তিপূর্ণ। তাঁরা কোন দিন কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের খবর জানে না। তা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। মালয়েশিয়া বাসী জনগণ যে পরস্পর সমঝোতা ও সহানুভূতিশীল তারা যে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে সহনশীল, মালয়েশিয়া দেশটি যে গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রকৃত অনুসারী দেশ-এই মন্দির মসজিদ দুই ?? পীঠস্থানের একই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠাই চরম ও পরম নিদর্শন।

এক্ষেত্রে সব চেয়ে আকর্ষণীয় ঠাঁই হচ্ছে শিশুদের বিশ্রাম ও ক্রীড়াগার। ?? আনন্দোৎসবের মাধ্যমে জীবন গঠনের কলা-কৌশল, সাজ-সরঞ্জাম এই বিশ্রামাগারে। আমরা কয়েকজন ভিক্ষু তথায় গিয়ে বসলাম। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধি আমাদিগকে অরেঞ্জ, সেভেন-আপ, কোকো-কোলা পান করতে দিলেন। আমি এই সুস্বাদু পাণীয় রস পান করতে করতে দেখলাম-ঘরের ভিতরে ঘোড় দৌড় ও হস্তী কেলি। সুইচ টিপলেই ঘোড়া দৌড়াতে আরম্ভ করে আর হাতী মনের আনন্দে দর্শকের মনোরঞ্জন মানসে কেলি করতে থাকে। তা দেখলে সত্যই ভ্রম হয় - ইহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম।

বিশ্রামাগার থেকে বের হয়ে আমরা রেলওয়ে পর্বত গাত্রের সর্বত্র ইতস্ততঃ বেড়িয়ে বহু দৃশ্য দেখলাম। তাতে আমাদের ঘন্টা চারেক সময় ব্যয় হল। পিনাঙ্গ পর্বতের উপরি মাঝে মাঝে সবুজ মসৃন ঘাসের আকর্ষণীয় বিছানা। বিছানার উপর বসতেও ইচ্ছা হয়। এমনি কি শুতেও ইচ্ছা হয়। মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। কত বিচিত্র রকমের ফুল মাথায় করে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি ফুলের থোবা দর্শকের মনোরঞ্জন করে থাকে। মলয় হিল্লোলে ফুলের পাঁপড়িগুলো পত্র-বাহারের পত্রগুলো যখন আস্তে আস্তে নড়তে থাকে, তখন মনে হয় যেন ইহারা দর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে- তাদের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ উপভোগ করার জন্য। প্রকৃতির উপর মানুষের হাতের রচনা কত যে সুন্দর ও মনোরম-তা প্রত্যক্ষ না করলে ভাষায় বুঝান শক্ত।

পর্বতের পুর্ব পার্শ্বে পিনাঙ্গ শহর। পর্বতের শৃঙ্গ থেকে এক নজরে সারাটি শহরের বিচিত্র শোভা দর্শকের চোখে পড়ে যায়। ইহার প্রায় অপর তিন দিকেই অনন্ত পারাবার। পার্বত্য গাছ পালার ফাঁকে ২ আবার মনুষ্য বসতির বাসগৃহ। মনোরম

কুটীর। এ সব নানা রকমের দৃশ্য পর্বতটিকে রমনীয় করে তুলছে। পর্বতের বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে যেন আমাদের চোখে নেশা ধরে যায়। অতৃপ্ত সে দর্শন যত দেখি ততই দেখতে ইচ্ছা হয়। সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য, গাম্ভীর্য্য, সমৃদ্ধি ও মহাত্ম্য বিচারে পাক-ভারতের লোকেরা কাশ্মীরকে ভূ-স্বর্গ বলে। আমার ইচ্ছা হয়-পিনাঙ্গ পর্বতের এই সব শোভা সৌন্দর্য্যময় উদ্যানগুলোকে স্বর্গীয় নন্দন-কাননের সঙ্গে তুলনা করি।

ভিয়েতনামী প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্রামাগার থেকে আমরা বের হয়ে পড়লাম। প্রাঙ্গণে এসে দেখি-আমাদের মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গাল গল্প করছেন। আমাদের সহিত প্রীত্যালাপের পর ফটো তোলা হল দুই দুইবার।

অতঃপর আমরা পর্বত শীর্ষ থেকে নেমে ষ্টেশনে পৌছলাম। অন্যান্য প্রতিনিধিদের জন্য এখানে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ যাবৎ। কাউকেও ফেলে কেউ তো আসতে পারি না। সকল প্রতিনিধি এসে পৌছলেই আমরা রওনা দিই।

পর্বত থেকে নেমে আসতে প্রায় ৫টা বেজে গেল। মহিন্দারাম এখান থেকে বেশী দূর নহে। আমরা যখন মহিন্দারামে পৌছি তখন প্রায় ৬টা। সারা দিন ঘুরা ফিরায় শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। স্নান বন্দনাদি করে ক্লান্তি কিছুটা বিনোদন করে নিলাম।

সন্ধ্যা ৭টার সময় পিনাঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ তন্ শ্রী ওং পোনীর বাড়ীতে সমগ্র প্রতিনিধি দলের জন্য অভ্যর্থনা ও নৈশ ভোজের ব্যবস্থা। আমরা যারা থেরবাদপন্থী ভিক্ষু। তাদের বিকেলে ভোজন নিষিদ্ধ, আমাদের তথায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ভোজন নহে; অভ্যর্থনা সভায় অনেক কিছু আলোচনা হয়-তাতে অংশ গ্রহন।

আমরা যথাসময়ে মুখ্য-মন্ত্রীর বাড়ী পৌছে দেখি-সারা বাড়ী আলোক সজ্জায় সজ্জিত। চিত্র বিচিত্র আলোকরাশি। তাকালে চক্ষুদ্বয় ঝলসে যায়। বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড ময়দান। তার চারধারে রজনীগন্ধা, বেলী ফুল ইত্যাদি সুগন্ধিময় ফুলের বাগান। ফুলের সৌরভে সমগ্র ময়দান আমোদিত এই ময়দানেই অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। আমরা থেরবাদী ভিক্ষুরা সভার এক প্রান্তে আসন গ্রহণ করলাম। আমাদের টেবিলে চা, কফি, কোকোকোলা, সেভেন-আপ, অরেঞ্জ প্রভৃতি প্রচুর পানীয় দ্রব্যের সমাবেশ। তৃপ্তির সহিত আমরা পান করলাম।

কিছুক্ষণ পরে মুখ্য-মন্ত্রী বাহির থেকে এসেই প্রতিনিধি বর্গের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এমন সময় সভা মধ্যে বিপুল হর্ষধ্বনি পড়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অভ্যর্থনা বক্তৃতায় সমগ্র প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্বক পিনাঙ্গের নাগরিক জীবনের মান, পাস্পরিক ভ্রাতৃভাব, জীবিকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করলেনএবং তাঁর অতিথিমণ্ডলীকে আহার-কৃত্য সমাধা করলেন।

ইত্যবসরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বৌদ্ধ প্রতিনিধি বন্ধুবর শ্রীমৎ ধর্মপাল ভিক্ষু মুখ্য মন্ত্রীকে সম্রাট অশোকের আদর্শে নির্মিত একটি ধর্ম চক্রের সুরম্য সুন্দর প্রতীক দান করলে সভাস্থলে হর্ষ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে মুখ্য-মন্ত্রী ও শ্রীমৎ ধর্মপালকে প্রতিদান স্বরূপ পিনাঙ্গের রাজকীয় প্রতীকের একটি বহু মূল্য ধাতব মডেল প্রদান করলেন। ইহাতেও সভাসদবৃন্দের আনন্দ আর ধরেনি।

মন্ত্রী ভবন থেকে বিদায় নিয়ে মহিন্দারামে পৌছতে সাড়ে দশটার পর হয়ে গিয়েছিল। ১১.৩০ টায় সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা বলে শয্যা গ্রহণ করলাম।

নয়

২০শে এপ্রিল, রবিবার, ভোর ৫টার সময় শয্যা-ত্যাগ করে যথারীতি প্রক্ষালন কর্মাদি সমাধা করলাম, বুদ্ধ-বন্দনা, বোধি-বন্দনা, বোধি প্রদক্ষিণ করে আসতেই হাঁক এসে পৌছল - 'চা প্রস্তুত, দয়া করে এসে পড়ুন। অমনি ত্বরিত গতিতে ভোজনালয়ে এসে পড়লাম এবং উপাদেয় দ্রব্য-সামগ্রী সব পাঁচ দশ মিনিটে গিলে ফেললাম। খাওয়ারপর চিন্তা হল-আঃ এত বেশী খেলাম কেন? এক্ষণই আবার দুইটি বিহার দর্শনে যাচ্ছি। সেখানেও তো টিফিনের ব্যবস্থা থাকতে পারে যা হোক, এখন তো উদগীরণের উপায় নেই।

অতঃপর বাসে গিয়ে বসলাম। বাস ছাড়ল। আমি সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা বলে চক্ষু মুদলাম কয়েক মিনিটের মধ্যেই চার মাইল পথ অতিক্রম করে বাস গিয়ে থামল-কেক্ লোক্সী-মালয়েশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম। কেক্ লোকসী-এই চৈনিক প্রবচনের বাংলা অর্থ হলো-স্বর্গীয় বিমান মন্দির। ইহা যে পাহাড়ের উত্তর পূর্ব প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত ইহার নাম হচ্ছে-শ্বেত সারস শৈল। এই প্রতিষ্ঠানটি ত্রিশ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৮৯০ সালে ফোচিং থেকে দু'জন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁদের অনুসারী ভক্তবৃন্দ এসে এই সঙ্ঘারামের গোড়াপত্তন করেন। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইহার নির্মাণ কার্য্য চলতে থাকে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত। এই নব নির্মিত মন্দিরের আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বারোদঘাটনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সনে। ইহার রমনীয় দৃশ্য কখনও পর্যটকের চক্ষু এড়ায় না। সুরম্য পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ থেকে মন্দিরাঙ্গণ পর্য্যন্ত ইহার একটানা সুদীর্ঘ বারান্দা বা প্রবেশ মার্গ। এই প্রবেশ পথের দু'পাশে অসংখ্য মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভারে সুসজ্জিত সুরম্য দোকান পাট। নিম্নে শত শত পদক্ষেপ ক্রমশঃ উর্দ্ধে চলে গেছে। এই প্রবেশ পথকে সুদীর্ঘ একখানি সিঁড়ি বললেও অত্যুক্তি হয় না। বৃষ্টি ও সূর্য্যোত্তাপ নিবারণ কল্পে উপরে দস্তা-ঢালাই ছাদ। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই

আমাদের চোখে পড়ল-উৎসর্গীকৃত একটি পাকা পুকুর। তন্মধ্যে উন্মুক্ত আকাশ-তলে মুক্ত কুর্ম্ম-নিয়ে কোনটি সাঁতার কাটছে, কোনটি ডুব দিচ্ছে। কেউ কেউ পরস্পর কেলি করছে। তাদের খেলা-ধূলায় মানুষ যোগ দিয়েছে নানা আহার্য্য হস্তে। আহার্য্য পেলে ইহারা দ্বি-গুণ উৎসাহিত হয়ে উঠে।
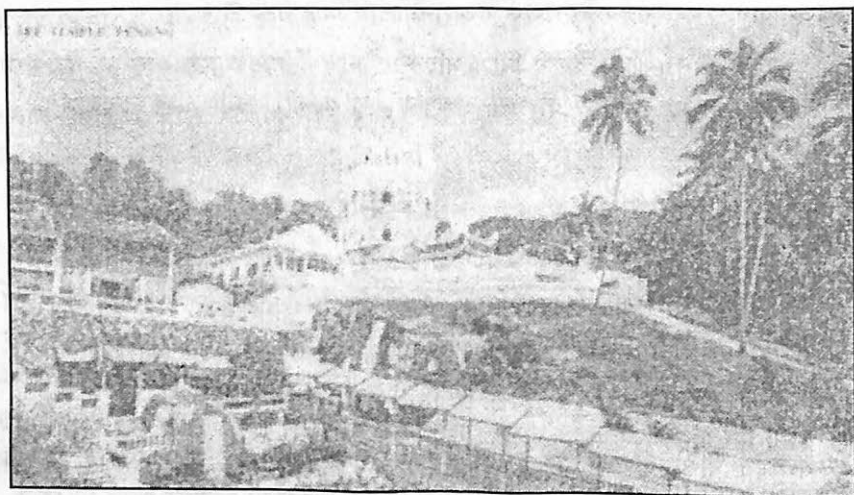
কেক্ লোক্ সী মন্দির, পিনাঙ্গ।
Kek Lok See Temple, Penang.

থাইল্যাণ্ড মালয়েশিয়ায় কোন কোন বিহারে এরূপে কচ্ছপ প্রতিপালনের রীতি আছে। প্রতিপালনের জন্য স্বতন্ত্র একটি জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া হয়। বৌদ্ধ ভক্তগণ বিভিন্ন বয়সের কচ্ছপ এনে নির্মিত পুকুরে ছেড়ে দেয়। কচ্ছপ ভূ ও স্থল উভচর প্রাণী। ইহারা নাকি কয়েকশত বৎসর বেঁচে থাকে। অথচ ইহাদের পরিপোষণে আহার্য্যের প্রয়োজন অতি অল্প। তাই মানুষের পক্ষে ইহারা সুপোষ্য।

এ জগতে মানুষ যা দেয়, প্রতিদানে তা-ই পায় যা দেয় না তা পায় না। ভোগ্য বস্তুর দানে ভোগ সম্পত্তি, আয়ু দানে আয়ূ, জ্ঞান দানে জ্ঞান লাভ হয়। দীর্ঘায়ু লাভের কামনাই থাইল্যাণ্ড মালয়েশিয়ার বৌদ্ধদের এই প্রযত্ন প্রয়াস এখানে একটি মজার খবর হল এই, - পুকুরে পরিত্যক্ত কচ্ছপগুলো প্রায়ই রঙ্গীন। দাতা যে কচ্ছপটি দান করে তার পৃষ্ট খোল লাল রং এ রঞ্জিত করে এবং খোলার উপর দাতার নাম ধাম লিখে দেয়।

আরো কয়েক ধাপ উপরে উঠে দেখি সাধারণ মৎস্য ও সুবর্ণ-বর্ণ মৎস্যের পাশাপাশি দুটো পুকুরে। ইহারা আনন্দে ক্রীড়া-কৌতুকে মশগুল। পুকুরের অনতিদূরে

পদ্ম-বনে পদ্মাকর। শ্বেত-পদ্ম, নীল-পদ্ম ও লাল-পদ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্মে অপূর্ব সমাবেশ। সরোবরের উর্দ্ধ প্রান্তে পুষ্প উদ্যান। তারই কেন্দ্রে কৃত্রিম জলপ্রপাতের অবিরাম ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সম্মুখে আরো কয়েক ধাপ গিয়ে আমরা বন্দনা-প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম যেখানে শ্রদ্ধাবান জনগণ অনুক্ষণ সমবেত বন্দনায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবান তথাগত মন্দিরটি হচ্ছে পাহাড়ের একেবারে শীর্ষ দেশে অবস্থিত। তারই পিছনে শত ফুট উচ্চ, অতীব সুন্দর, অতি সমৃদ্ধ সাততলা জাঁকাল প্যাগোডা। এই প্যাগোডা বা মন্দিরের চারপাশে যে আরক্ষা (Railing), তা মনোরম কারুকার্য্য খচিত। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন। নগরবাসী ও বিদেশাগত দর্শকের চোখ-মন প্রাণোভিত করে - এই প্যাগোডার অপূর্ব নির্মাণ প্রণালী। ইহার প্রতিটি তলায় ভগবান তথাগতের মর্মর পাথর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সর্বোপরি তলায় দেখতে পেলাম এক চতুর্ভূজ নারী মূর্ত্তি। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম-ইহা করুণার দেবতা মূর্ত্তি।

মন্দিরের চূড়ায় আরোহনকারীকে দান করতে হয়-এরূপ একটা বাধ্যতা মূলক নির্দেশ নামা লেখা রয়েছে দান বাক্সের উপর। আমরা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলে আমাদের প্রতি সেই নীতি অব্যাহত রইলো না। বিশেষতঃ আমার হাতে কোন টাকা পয়সা ছিল না। আমাদের যা কিছু ছিল সব একজনের হাতেই গচ্ছিত।

সপ্তম তলা মন্দিরের বারেন্দা থেকে দু'একটি বাক্যালাপ করতে গিয়ে ফোর মোজার প্রতিনিধি দাম্পত্য যুগলের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। কথায় কথায় চোখে মুখে ফু'টে উঠলো আমার প্রতি তাঁদের স্নেহ ও ভক্তি। মন্দির থেকে ফিরতে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে হঠাৎ ভদ্র মহিলা আমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং অঞ্জলি বদ্ধভাবে প্রণতি জানালেন। অধিকন্তু পকেট থেকে বের করে ৫ ডলারের একটি নোট দান করলেন। তাঁদের এই অযাচিত দানের-কারণ যে কি, আমার প্রতি কিরূপ মমত্ব বোধে এই দান চেতনা তাঁদের অন্তরে জাগল তা আমি চিন্তা করে কূল পাইনি। দুঃখের বিষয় তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারিনি। এমন কি তাঁদের ঠিকানাটি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিনি। এমনই বিহ্বল আমি অবশেষে সর্বনিম্ন তলায় প্রতিষ্ঠিত তথাগত করুণাঘনের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন করতে গিয়ে মহাযান পন্থী ভিক্ষুর ভাষায় নিবেদন করলাম,-

দদামি চাত্মানমহং জিনেভ্য ঃ সর্ব্বেন সব্ব চ তদাত্মজেভ্য ঃ
পরিগ্রহং মে কুরুতাগ্র সত্ত্বা যুষ্মাসু দাসত্ব মুপেমি ভক্ত্যা ঃ।।

"তথাগত জিনগণকে আমি আত্ম সমর্পন করছি। জিনগণের আত্মজ বোধি সত্ত্ব ও শ্রাবক সজ্ঘকে সর্বস্বতোভাবে আমার জীবন সর্বস্ব প্রদান করছি। হে নর-দেব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ। আমি পরম শ্রদ্ধার সহিত তোমাদের দাসত্ব বরণ করছি। দয়া করে আমাকে স্বীকার করো।"

শাস্ত্রে স্বর্গ ও স্বর্গীয় বিমানের যেরূপ বর্ণনা দেখেছি। এই কেক লোকসী মন্দির দর্শনে সেই স্মৃতি অন্তরে জেগে উঠেছে। আজ যেন স্বর্গ ও স্বর্গীয় বিমান প্রত্যক্ষ করলাম। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী ইহার গঠন কার্য্যে কত কোটি ডলার ব্যয়িত হয়েছে, তার প্রকৃত হিসাব সম্ভবতঃ কর্মকর্ত্তারাও ঠিক ভাবে রক্ষা করতে পারেননি। যথার্থ-ই সার্থক হয়েছে এই মন্দিরের নাম কেক্ লোকসী অর্থাৎ স্বর্গীয় বিমান মন্দির।

কেক্ লোক্সী মন্দির দর্শন করে আমরা গেলাম (Bat Temple) বেট টেম্পল্ অর্থাৎ বাদুর মন্দির দেখতে। মন্দিরটি তেমন সমৃদ্ধ না হলেও ইহার বৈশিষ্ট্য হল-এই মন্দিরের ভিতরে, বাহিরে আশেপাশে অসংখ্য কলা বাদুর ঝুলায়মান অতি নিকটে এত বড় জনতার কোলাহল সত্ত্বেও এদের এতটুকু ভয় ভীতির উদ্রেক দেখতে পেলাম না। পেলাম একটা আনন্দময় তুমুল চাঞ্চল্য। বরং এরা যেন বিদেশাগত অতিথি দর্শন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। আমাদিগকে যেন অভ্যর্থনা জানাতে উদ্বিগ্ন। লাজে সম্মানে শুধু আমাদের মাথায় এসে বসেনি। উপক্রমটা তেমনই দেখাচ্ছিল।

বাদুর মন্দির থেকে আমরা গেলাম ওয়াট চর্য্যা মঙ্গলারাম নামে শ্যাম দেশীয় বিরাট সজ্ঘারাম। এখানে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা। বেলা বারটার মধ্যে ভোজন-কৃত্য সমাপন করে মন্দির দর্শনে ভিতরে ঢুকলাম। মন্দিরের বর্হিদেশে বিরাট-কায় দুই দ্বার-রক্ষক মূর্ত্তি। দেখতে ভীষণাকার। অভ্যন্তরে সিংহ শয্যায় শায়িত প্রকাণ্ড পরিনির্ব্বাণ বুদ্ধ মূর্ত্তি। ইট পাটকেলে প্রস্তুত এই মূর্ত্তি। ধন্য এই দেশের বৌদ্ধ জনগণ ধন্যবাদ তাঁদের ধর্ম বোধকে মূর্ত্তির পিছনে নিভৃত কোণে বসে কতক্ষণ শীতলত্ব উপভোগ করলাম এই ভীষণ গরমের মাঝে।

কিছুক্ষণ পরেই সবাইর সম্মিলিত ফটো তোলার ডাক আসল। প্রচণ্ড রৌদ্র কিরণে ফটো তোলা কি সাংঘাতিক কষ্ট। তথাপি 'তথাস্তু' বলে মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে ফটোতোলার কাজটি সমাপ্ত করলাম।

সেখান থেকে আমরা মৎস্য-খামার (Aquarium) দেখতে গেলাম। প্রকাণ্ড প্রাসাদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ভয়ঙ্কর গরমের মাঝে প্রাসাদে ঢুঁকে আরামের সুখ-স্পর্শ পেয়ে দেহমন জুড়িয়ে গেল। প্রাসাদ-গোত্রে দেখলাম মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্রী টংকু আবদুল রহমানের নামের সঙ্গে জড়িত এই প্রতিষ্ঠানের নাম টংকু আবদুল রহমান মৎস্য খামার। ইহার অভ্যন্তরে অগনিত প্রকোষ্ঠে কত দেশের কত চিত্র-বিচিত্র মৎস্যের কেলি যে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। তার অবশ্য তত হিসাবও রাখিনি। করাচির ক্লিপটনস্থ খামারের তুলনায় প্রায় সমতুল্য। খামার দর্শনের আনন্দ অপেক্ষা আরাম পেয়েছি অনেক বেশী। এই নিদারুণ গ্রীষ্মের দুপুর বেলাটায় যা অসহ্য গরম পড়ছিল। তার কিছুটা লাঘব হয়েছে এই প্রাসাদে; যেহেতু প্রাসাদটি ছিল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

দর্শক ও পর্যটক চোখে সর্বাধিক আশ্চর্য্য ও আমাদের বস্তু হচ্ছে (Snake

Temple) স্নেইক টেম্পল-অর্থাৎ সর্প মন্দির। আমরা তা দেখতে গেলাম। এই সর্প মন্দির শহর থেকে ছয় মাইল ব্যবধানে দক্ষিণ-পূর্বকোণে জেলটিং রোডে অবস্থিত। ইহার পিছনের দিকে উচু খাড়া পাহাড়। সম্মুখে প্রলম্বিত রাজপথ। ইহা একটি প্রাচীন মন্দির। ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে।

বাস থেকে নেমে আমরা প্রায় একশত পদক্ষেপ অগ্রসর হয়ে মন্দিরের দরজায় উপনীত হলেম। আমার ধারণা ছিল-সর্প মন্দিরটার সম্ভবতঃ মুচিলিন্দ সর্পরাজ কর্তৃক তথাগত যে রক্ষিত হয়ে ছিলেন, তার কোন নিদর্শন থাকবে অথবা মন্দিরের মৌলিক গঠনের পদ্ধতিটা সর্পাকৃতির হবে। মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই অন্তরে প্রশ্ন জাগল-তবে সর্প মন্দির নাম কেন হল? যেহেতু সর্পের কোন নিদর্শন বা কোন সর্পের উপর আমার চোখ তখনও পড়েনি। বুদ্ধ প্রতিমার দৃষ্টি থেকে ফিরিয়ে বেদীর উপর নিক্ষেপ করতেই দেখি-জীবন্ত সর্প-একটি দুইটি, তিনটি, চারটি, পাঁচটি.... ।

বেদীর নীচে, ধুপ দানিতে,মোমবাতির ছিপে, ফুল দানির মস্তকে, অলস্কৃত পাত্রে, টেবিলের নীচে আলমারির নীচে ও কার্নিশের উপরে ভিক্ষুদের শয়ন কক্ষে, চৌকির তলে সর্বত্র সর্প আর সর্প। সর্পগুলো বর্ণে সবুজ। ছোট বড় সকল আকারের সর্পই রয়েছে। বৃহত্তম সর্প ৭/৮ ইঞ্চি মোটা ও ৪/৫ হাত দীর্ঘ। আমি দেখে তো অবাক।

সর্প মন্দির, পিনাঙ্গ।

Snake Temple, Penang

হঠাৎ বিহারের উত্তর দিক থেকে জন কোলাহল শুনা গেল হু হু করে শব্দ উঠছে মনে করলাম - সাপে কাউকেও কামড়াল নাকি। দৌড়ে গিয়ে দেখি-জাপানী প্রতিনিধি বলিষ্ঠ জোয়ান পুরুষ হাতে ধরে একটি বড় আকারের সর্প গলার জড়াচ্ছেন, একটি বিড়ি বেঁধে মস্তকোপরি স্থাপন করছেন একটি ডাইন বাহুতে অপরটি বাম বাহুতে জড়াচ্ছেন, কেহ কেহ ফটো তুলছেন। আর সমবেত জনতা উচ্চ শব্দে তামাসা করছেন তাই এত ঘন ঘন হর্ষধ্বনি, তাই এত শোরগোল।

সর্পগুলো বড় ধীরগতি। ইহাদের আহার্য্য হচ্ছে ডিম। কেহ ডিম দিলে ইহারা অলক্ষ্যে ডিমের ছোট অংশে দংশন করে কুসুম টুকু খায়। ইহারা কাউকেও দংশন করে না। অথচ বিষধর বলে বর্ণনা আছে এগুলো কারো পোষিত নহে, স্বতঃআগত। সর্পগুলোর বিহারে আনা-গোনা ও অবস্থান দেখে মনে প্রশ্ন জাগল যে ইহারা শুধু বিহারে কেন? অথচ আশে-পাশের কোন দোকান পাটে কিংবা কারো বাড়ীতে এদের এরূপ গতি বিধি নেই। বিহারে প্রচুর আহার্য্যের কোন লোভও নেই। অথচ রাত দিন সমারোহ। অনুমান করলাম যে তাতে বিহারবাসী কোন তান্ত্রিক ভিক্ষুর তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব থাকতে পারে। নতুবা সাপের এরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত আনা-গোনা ও অবস্থান থাকবে কেন?

বিহারের দরজায় বহু দোকান পাট, মনোরম দ্রব্য সম্ভার প্রত্যেক দোকানে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পয়সার অভাবে বিশেষ নিতে পারলাম না। শুধু তিন ডলারে একটি ছোট কার্ড পুস্তিকা কিনলাম। যাতে সর্প-মন্দিরের ছবি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

সর্প মন্দির দেখার পর আমাদিগকে বাজারে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের কারো বাজার করার কিছু নেই বলে উদ্যোক্তারা এবার নিয়ে গেলেন সমুদ্র তটে। সমুদ্র কুল ঘেঁষে একটানা রাজপথ যা পিনাঙ্গকে বেষ্টন করে আছে। বাসটি সমুদ্রের উপকুল বর্ত্তী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাজপথ ধরে এঁকে বেঁকে চলল। বাস পিনাঙ্গ টাউনের উত্তর পশ্চিম সমুদ্র কূল ধরে ৬/৭ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে আমাদিগকে লোন পিন হোটেলে নামিয়ে দিল। এখানে আমাদের আসার কথা ছিল ৪/৫ টার সময়। কিন্তু বাজারে কোন করণীয় ছিলনা। সেই সময়টা হাতে ছিল বলে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুই ঘন্টা পূর্বেই এসে পৌঁছি।

লোনপনি হোটেলের মালিক অতিশয় নম্রতার সহিত আমাদিগকে বসার ব্যবস্থা করে দিলে আমরা আসন গ্রহণ করলাম। হোটেল খানা যেমনি সমুদ্রের উপকুলে তেমনি পর্বত পাদদেশে বালুকাময় ছায়ানিবিড় সৈকতে প্রতিষ্ঠিত। লম্বমান সমুদ্র-তটে রয়েছে মনোরম বিশ্রামাগার। বালক-বালিকাদের ব্যায়ামশালা, খেলা-ধুলার সাজ সরঞ্জাম। শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব শোভা ধারণ করে দণ্ডায়মান সমুদ্র পুলিনের কোথাও সুন্দরভাবে ছাটাই করা শ্যামল সবুজ ঘাস, কোথাও

বা বিচিত্র ফুলের গাছগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চোখ ঝলসানো আভা ছড়িয়ে চলছে। হোটেলের পিছন দিকে প্রলম্বিত রাজপথ। তার উপরে অত্যুঙ্গ শৈলশ্রেণী। গাছপালার সবুজ সুন্দর অনন্ত বৈচিত্র্য ও লতাপাতার ঘন-নীলিমা দর্শকের চোখে মায়া অঞ্জন মাখিয়ে দেয়। আশে পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সাদা ধবধবে ঢেউ খেলানো বালুকার মাঠ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে মহা সমুদ্র সঙ্গম করেছে। হোটেলের সম্মুখে অনন্ত মহাপারাবার। কখনো শান্ত সমীরণের প্রশান্ত তরঙ্গমালা সমুদ্র বক্ষে আছাড় খেয়ে পড়ছে আর উঠছে। কখনো বা অনন্ত নীলাকাশের দমকা বাতাসের ঢেউ সমুদ্র ঢেউয়ের সাথে মিলিত হচ্ছে, তাতে উঠছে অত্যুঙ্গ ঢেউ রাশি উপরে বালুকা পলিশের অসংখ্য ঢেউ সূর্য্য রশ্মির সাথে আপনার রশ্মি বিকিরণ করছে। গহন পর্ব্বতের ঝিম ঝিম শব্দ-লহরী কর্ণ-কুহর আলোড়ন করছে এতে উত্থিত হচ্ছে পথিক পর্যটকের মন প্রাণে মহাআনন্দ প্লাবন প্রকৃতির এরূপ অপরূপ রূপে অনুপম শোভায় চোখ জুড়িয়ে দেয়, প্রাণ ভরে উঠে। এক ধারে জলধি গম্ভীর আরেক ধারে অত্যুচ্চ পর্বত শ্রেণীর অভ্র ভেদী-চুড়া। মাঝখানে সুশোভিত লোন পিন নিকুঞ্জ কানন এরূপ দৃশ্য কি জীবনে কখনো দেখেছি এ দর্শন অপূর্ব।

সর্প মন্দিরের অন্য একটি দৃশ্য, পিনাঙ্গ।
Another view of Snake Temple, Penang.

আজ রবিবার, বিশ্বের আন্তর্জাতিক ছুটি দিবস। আজ কত কত শ্বেতাঙ্গ পরিবার পুরুষ-নারী কর্ম-ক্লান্ত জীবনের সাপ্তাহিক অবকাশ উপভোগের জন্য এক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন স্বামী স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধবী সম্মিলিতভাবে আরামের ছুটি ভোগ করবেন। সারাটি দিন খেলা-ধুলায় এখানেই ব্যয় করবেন তাই কেউ তাবু খাটাচ্ছেন, কেউ অর্দ্ধোলঙ্গ বালির বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। তাতে মনে হল, হাইড্রপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীর বিধানানুসারে মাটির শীতল আর্দ্রতায় পাকস্থলীতে সেঁক দেওয়া হচ্ছে। আর কেহ নির্মল বায়ু সেবন করছেন। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ দম্পতি তাঁদের প্রাণ-প্রতিম অপত্য স্নেহের পুতুল সন্তান সন্ততি নিয়ে সমুদ্র-সলিলে ক্রীড়ায় নিরত। কেহ বা নৌকা বিহারে প্রবৃত্ত। আর কেহ বা স্কী খেলায় মশগুল।

এসব কৌতুহলী দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের অন্য প্রতিনিধিবর্গ এসে পৌঁছবার সময় হয়ে আসল নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম অন্যান্য কেউ করলেন না, কেবল আমরাই যা করেছি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ৪-৩০ টায় সব প্রতিনিধি এসে পৌঁছলেন। সুসজ্জিত টেবিলের উপর সবাই বসে পড়লেন। অমনি লোন পিন হোটেলের মালিক ম্যানেজার অতিথিবন্দকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলে পরিচালকেরা এসে সুস্বাদু নাস্তার সহিত চা-কফি পরিবেশন করলেন। আমরা থেরবাদী ভিক্ষুরা সাদা চা-ই তৃপ্তি ভরে পান করলাম।

হঠাৎ তিন নম্বর বাসের আরোহিদের প্রতি ঘোষণা এসে শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করল- যাওয়ার সময় হয়েছে প্রস্তুত হউন' এই ইঙ্গিতের সবাই গাত্রোত্থান পূর্বক বাসে চাপলাম। বাস যে পথে গিয়েছিল, সে পথ ধরেই আবার ফিরছে। এখন সময় হচ্ছে- গোধুলি-লগ্ন। সূর্য্য পাটে বসতে চলছে। আকাশের পক্ষীগণ নীড়াভিমুখী। সমুদ্রের পবিত্র জলে নহানর্থীরা নহান-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরছেন। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি বিনোদন মানসে অসংখ্য জনতা সমুদ্র তটে ভিড় জমাচ্ছে।

পথি পার্শ্বে মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। তাতে ফুলের সারি ও বিচিত্র শোভা। পর্বত পাদে তরু রাশির পত্র পল্লব সুশোভিত ডাল-পালা। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে নানা রংয়ের বিদ্যুৎ বাল্ব। দিবালোক বলেই বিদ্যুৎতের বিচিত্র আলোক সজ্জা উপভোগ করা সম্ভবপর হলো না। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে রয়েছে বিভিন্ন রেঁস্তোরা আর সমুদ্রে স্নানার্থীগণের পোষাক ভাড়া ও পোষাক বদল করার মনোরম ঘর। জল-কিনারার অনতিদূরে অর্দ্ধ-ভাসা অর্দ্ধ-ডুবা বড় বড় শিলা পাথর। তার উপরে স্নান-নিরতা কত কত যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর উঠা নামার উৎসব। কেহ ডুবায়, কেহ সাঁতারে, কেহ বা মেলা-মেশা-আমোদ-প্রমোদে বিভোর। চলন্ত বাস থেকে এই আনন্দময় মেলা দর্শন করে আমরাও আনন্দ উপভোগ করলাম।

সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় বাস আমাদিগকে মহিন্দারামে পৌঁছে দিল। আমরা স্নান ও সান্ধ্য বন্দনা সেরে নিলাম।

ঘন্টা খানেক পরেই গাইড এসে আবার হাঁকল-বাস এসে গেছে, দয়া করে আপনার তৈরী হউন। যাওয়ার সময় হয়েছে।

কয়েক মিনিট পরেই আমরা বাস যোগে ফোর তোয়হাই স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে গত কয়েক দিন যাবৎ সম্মেলন বসেছিল। বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের ইহাই সর্বশেষ সম্মেলন। আজ বিদায় সম্বর্দ্ধনা সভা।

বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের অধিবেশন সমাপ্তির পর মালয়েশিয়া বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংস্থার সৌজন্যে বিদেশাগত প্রতিনিধিবর্গের বিদায় সম্ভাষণ ও সম্মানার্থ এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এই ভোজ সভায় বিশেষ ভাবে উপস্থিত হয়েছেন প্রতিনিধিবর্গ, পর্যবেক্ষকগণ এবং আতিথ্য প্রদানকারী দেশের মহারথী বৃন্দ।

এই অভ্যর্থনা পর্বে পাকিস্তানকে অদ্বিতীয় সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রধান ভোজ-টেবিলে বসবার জন্য বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অন্যান্য যে দেশগুলোকে প্রধান ভোজ-টেবিলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে-সিংহল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদক এবং মালয়েশিয়া বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংস্থার প্রধান ব্যক্তি।

বিদায় সম্ভাষণ উৎসবে বিশ্বের সকল প্রতিনিধিদের পক্ষ হতে মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়াকে ভাষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তাঁকে অনুরোধ করা হয় হঠাৎ, ভোজ পর্ব আরম্ভ হওয়ার একটু আগেই। তিনি প্রস্তুত ছিলেন না যে তাঁকে আজ বিদায়াভিনন্দন সভায় বক্তৃতা দিতে হবে। তথাপি "যোয্যেন যোগ্যং যোজয়েৎ যোগ্য" যোগ্যকেই যোগ্য পদে যোজনা করেন। এই প্রস্তাবে পাকিস্তান তথা পাকিস্তানী প্রতিনিধির প্রতি অদ্বিতীয় সম্মান হিসেবে আমরা বিবেচনা করেছি। মিঃ ডি, পি, বড়ুয়া বিশ্বের এই মহতো মহান সম্মেলনে পূর্ব প্রস্তুতি বিহীন তাৎক্ষণিক বক্তৃতার মাধ্যমে যেই যোগ্যতার পরিচয় দিলেন, তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

মহামান্য রাজকুমারী পুন, বন্ধু প্রতিনিধি এবং সদ্ধর্মানুসারী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ।

আজকের সান্ধ্যকালীন এ বিদায়ী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবার পক্ষ হতে কিছু বলার জন্য আমাকে যে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তা আমার প্রতি বিরাট সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন বলে মনে করি।

আপনাদের সবার মত আজকে আমার মনও বিদায় প্রাক্কালে বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সমঝোতা ও বন্ধুত্বের আন্তরিক পরিবেশে দীর্ঘ দশ দিন যাবৎ আমরা পরস্পর যে মতামত বিনিময় করেছি যে অপূর্ব সমাবেশে মিলিত হয়েছি। তার

পরিসমাপ্তিতে আজ আমরা বিচ্ছেদের ব্যথায় অত্যন্ত অভিভুত। নবম বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনের এই দশটি দিন আমাদের সবার কাছে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিমন্ডিত হয়ে উঠেছে। আমরা যখনই মিলিত হয়েছি তখন আমাদের সবার মনে এ অনুভূতিই জেগেছে যে এটা যেন একটি পরিবার পূর্ণমিলন। দূর দুরান্ত দেশ থেকে আগত বন্ধু ও আত্মীয় জনের যেন এটা একটা প্রীতি সিদ্ধ সমাবেশ। এখানে যে আমরা মিলিত হয়েছি-তাতে দেশ দেশান্তরের সীমান্ত রেখা অদৃশ্য হয়ে গেছে এখানে রাশিয়া কিংবা আমেরিকা, প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য, উত্তর দক্ষিণ-কোথা থেকে কে আগত তা কখনো বড় হয়ে দেখা দেয়নি। এমন কি আমাদের মধ্যে কে থেরবাদী আর কেই বা মহাযান পন্থী তার প্রশ্ন ও উঠেনি। আমাদের মধ্যে একটা মাত্র অভিন্ন অনুভূতিই বড় হয়ে উঠেছে যে বৌদ্ধ হিসেবে আমরা যেন একটি পরিবারেই মানুষ। আর আমাদের সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা এবং ধর্মের গৌরব বর্ধনের কর্মসূচী গ্রহণের জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এখন আমরা বিদায় কালে এ ভোজ সভায় সমবেত হয়েছি আশু বিচ্ছেদের বেদনাময় আর্তিতে আমাদের সবার অন্তর অনুরণিত। আজ একজন ইংরেজ লেখকের কথা আমার মনে পড়েছে- প্রত্যেক বিচ্ছেদের মধ্যেই ক্ষীণভাবে মৃত্যুর একটা করুণ স্মৃতি নিহিত থাকে। এ উক্তির মাধ্যমে তিনি বন্ধু ও প্রিয়জনের জন্য গভীর বেদনা বোধ এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়ার যন্ত্রণা-দায়ক ব্যাকুলতার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। দশ দিন মিলে মিশে থাকার পর এই যে আমরা আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি তাতে আমরা ও আপনাদের সবার মনে বিদায়ের করুণ সুরই কেবল বাজছে।

কিন্তু এ বেদনার্ত অনুভব থাকা সত্বেও পুনরায় আমাদের সম্মেলন না হওয়া পর্যন্ত আগামী দু'বছর কাল আমরা প্রতীক্ষা করে থাকব এবং আমরা পরস্পর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এই প্রতীক্ষার প্রতিশ্রুতিই এই নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

এই সম্মেলন এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানে সমৃদ্ধ। মালয়েশিয়া নবম বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনের জন্য অত্যন্ত উত্তম স্থান বলেই বিবেচিত হয়েছে। এই সম্মেলনে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের ৩১টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেছেন এবং জাতি সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উধান্ট তাঁর ব্যক্তিগত দূতের মাধ্যমে এতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে এ ধরণের প্রতিনিধিত্ব এই সর্ব প্রথম এবং যথেষ্ট তাৎপর্য্য রয়েছে। এ ঘটনা শান্তির প্রবক্তা বুদ্ধের আদর্শ রূপায়ন কামী বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সাথে বিশ্বের বৃহত্তম শান্তি সংস্থা জাতি সংঘের সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও সংহত করে তুলছে এটা বাস্তবিকই অপূর্ব ঘটনা তা ছাড়া এই সম্মেলনে আমরা বিশ্ব বৌদ্ধ সজ্ঘকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে একটি বেসরকারী স্বাধীন সংস্থা হিসেবে বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার কিভাবে কার্যকরী সংগঠনে পরিণত করা যায় তৎসম্পর্কে বাস্তব সম্মত গন্থায় আলোচনা করেছি। বুদ্ধের বাণীর আদর্শে

শান্তির জন্য কাজ করাই হচ্ছে এই আলোচনা ও ধারণার মর্মকথা। এটা সত্যিই তাৎপর্য পূর্ণ সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে আরও বাস্তব সম্মত উপায়ে কাজে ব্রতী হওয়ার জন্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠনের সুপারিশ এই সম্মেলনে জানানো হয়েছে। আপনার সবাই এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং এর বাস্তবরূপ অচিরেই দেখতে পাব বলে আমরা আশাকরি। এই সম্মেলনে আমরা জাতিতে জাতিতে হানাহানির অবসান মিটিয়ে বিশ্ব মান্তি জোরদার করে তোলার জন্য আহবান জানিয়েছি। যুদ্ধ ও হিংসা বিদ্বেষে জর্জরিত ক্ষত বিক্ষত এই পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপনে এ উদাত্ত আহবান বাস্তবিকই তৎপর্য্যমন্ডিত। এই সম্মেলনে সমগ্র মানব জাতির জন্য আশা ও আশ্বাসের বাণী শোনাবার কাজেই সমধিক ব্রতী হয়েছে। সদ্ধর্মের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের ব্যাপারে এ সম্মেলন বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের কাছ থেকে যথেষ্ট সুপরামর্শ ও উপকার লাভ করেছে।

এই সম্মেলনে গৃহীত একটি গুরুত্ব পূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে-ব্যাঙ্ককে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের স্থায়ী সদর দপ্তর স্থাপন। এ কথা আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে বৌদ্ধদের ঐক্য ও সংহতি যে কোন মূল্যেই অক্ষুন্ন রাখতে হবে যদি এটা অর্জন করা যায় তা হলে স্থায়ী সদর দপ্তর স্থাপন বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। এই সম্মেলনে আমরা বহু বিষয়ে যে আশু সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি-তাও নয়। কিন্তু তবু কোন বিষয়ে বিভিন্ন রকমের মত পার্থক্য দেখা দেওয়া সত্ত্বেও এ সবের একটি প্রীতি মধুর উপসংহার ঘটেছে। কারণ আমরা সমঝোতার মনোভাবও সদ্ধর্মের অভিন্ন কল্যাণ বাসনার মাধ্যমেই সব সময় পরিচালিত হয়েছি এটা আমাদের শ্লাঘার বিষয় এই সম্মেলনে আমরা ডাঃ জি, পি, মলল শেখরের জ্ঞান গর্ভ পরামর্শ ও উপদেশে অশেষ উপকৃত হয়েছি। এই সুপণ্ডিত কুটনীতিবিদই ১৯৫০ সালে সিংহলে বিশ্ব বৌদ্ধ সংস্থার প্রতিষ্ঠা দান করে ছিলেন। তাঁর প্রাণ-বন্ত বক্তৃতা আমাদের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আমাদের মহামান্য সভানেত্রী রাজকুমারী পুন পিসমাই দিসকুলের কাছ থেকেও আমরা প্রচুর অনুপ্রেরণা লাভ করছি। তাঁর অনুপম মধুর ব্যক্তিত্ব সামপ্রতিক বছর গুলোতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমাদের কর্ম তৎপর সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ সংঘবাসীর প্রতি আমার আন্তরিক প্রশংসা ও যথেষ্ট শুভেচ্ছা বোধ রয়েছে। আমি জানি যে এ সমস্ত বলার মধ্যে এই সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আপনাদের প্রশংসা ও শুভেচ্ছার বাণীই আমি উচ্চারণ করছি।

এই মহান সম্মেলন আয়োজন করার জন্যে আমি মালয়েশিয় বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংঘের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মালয়েশিয়া সম্মেলনের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত স্থানই রয়েছে। মালয়েশিয় সরকারের সদয় ব্যবহারে আমরা বাস্তবিকই বিমুগ্ধ নিবিড় সমঝোতা ও সৎসম্পর্কের মধ্যে লালিত বর্ধিত বহু জাতি

ধর্ম্ম ভিত্তিক একটি আদর্শ দেশ হিসেবেই আমরা মালয়েশিয়াকে দেখতে পেয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্যেও এ এক অনুপম আদর্শ দৃষ্টান্ত বটে। আমার নিজের দেশেও এ আদর্শ দৃষ্টান্ত অনুসৃত হচ্ছে। আমাদের প্রতি মালয়েশিয় সরকার যে আন্ত রিক ব্যবহার করছেন তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এই অপূর্ব সম্মেলন আয়োজনের প্রধান সংগঠক মিঃ খু এবং মিঃ তেহ (Mr. Khoo and Mr. Thta) আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন লাভের উপযুক্ত।

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্থান পরিভ্রমণ করে আমরা সবাই দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সম্মেলনের কর্ম ব্যস্ততার মাঝে এটা আমাদের দেহমনে আনন্দ ও অবকাশ প্রদর্শন করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আজকে উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে পারি। সুউচ্চ পিনাঙ্গ পাহাড়ে যখন আমরা উঠলাম আর পাহাড় শ্রেণীর চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের অসীম জল রাশির প্রতি বিস্মিত বিমুগ্ধ নেত্রে তাকালাম তখন এক অনির্বচনীয় পুলক শিহরণ আমরা সবাই অনুভব করেছি। এ পাহাড়গুলোকে আমার মনে হয়েছে তারা যেন মৌন নির্বাক গাম্ভীর্য্যের মধ্যে লক্ষ্য লক্ষ্য বছরের জ্ঞান প্রভার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর বুদ্ধের অসীম করুণা যেন গর্জনকারী মহাসমুদ্রের অসীম বিস্তীর্ণতায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে।

মালয়েশিয়া থেকে এসব সুখময় স্মৃতি সম্ভার আমরা বহন করে নিয়ে যাচ্ছি। আর এই সঙ্গে মনে পড়ছে তরুণ স্বেচ্ছাসেবী ও দিশারীদের প্রতি ঘন সাহায্য ও সাহচর্য্যের কথা। আমাদের আরাম আয়াশের জন্য তাঁরা দিবারাত্র কি কঠোর পরিশ্রম না করেছেন। সর্বত্র সকল জায়গায়ই আমাদের যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে তা আমরা কোন দিন ভুলবো না। বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ ও বন্ধুগণ আপনাদের পক্ষ হয়ে আমি সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মালয়েশিয়া বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংঘ, সরকার ও জনগণের প্রতি আমাদের অশেষ ধন্যবাদ। বিদায়ের বাণী বলার পূর্বে আমি পুনরায় আরও একবার বলছি যে এ সব মধুর স্মৃতি অনেক কাল ধরে আমাদের মনের মনি কোঠায় অক্ষয় সম্পদের মতো বিরাজ করবে।

আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাই। এই বক্তৃতা শেষে সম্মেলনের বিদায়ী সমাবেশে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে মি: বড়ুয়ার বক্তৃতাকে অভিনন্দন জানান। তখন রাত এগারটা।

আমরা সভাবসানে মহিন্দারামে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আগামী দিন সকাল ৭টার পিনাঙ্গ থেকে বিদায় নিতে হবে এবং ইপো হয়ে আবার কুয়ালালামপুর পৌঁছতে হবে বিকাল ৫টায়। সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা বলে চক্ষু যুগল মুদলাম এবং নিদ্রাবিভূত হলাম।

দশ

আজ ২১শে এপ্রিল সোমবার। ভোর ৫টায় শয্যা ত্যাগ পূর্বক আচমন কর্ম সমাপন করে স্নান ও প্রাতঃ বন্দনা সেরে নিলাম।

আজ রাত্রির অন্ধকার পরিষ্কার হতে না হতেই তন্ ছেং গুয়ান তাঁর গাড়ী করে নিত্য নৈমত্তিক প্রথায় প্রচুর খাদ্য নিয়ে বিহারে পৌছলেন। আজকের আহার নানাবিধ। কতেক সিংহলী, কতেক মালয়ী ও কতেক চৈনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত। মহিন্দারামের শেষ খানা পরসারামে খেয়ে নিলাম।

তারপর বিহারাধক্ষ্য মহাহের ভিক্ষু প্রেম রতন ও মহাহের ভিক্ষু গুন রতন থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তাদের দু'জনকে দুকপি 'পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি' উপহার দিলাম। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কালে তাঁরাও আমাদের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ, ধন্যবাদ ও কতেক দ্রব্য উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন। আর সিঙ্গাপুর গিয়ে আমরা কোথায় থাকবো, কি করতে হবে না হবে সব প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দিলেন।

অমনি ৩নং বাসের গাইড এসে পৌছলে আমরা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা" বলে বাসে আরোহন করলাম পুরা একদিনের জন্য।

বাস কয়েক মিনিট পরেই Rubber Trade Association প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌছল। এখান থেকেই বিশ্বের বৌদ্ধ ভ্রাতারা পরস্পর প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্বক বিদায় নিবেন। তজ্জন্য সবাই এখানে সম্মিলিত হয়েছেন।

হঠাৎ জানতে পারলাম আমাদের বাবু দেবপ্রিয় বড়ুয়া তাঁর এটাচি সে কোথায় ফেলে আসছেন সঠিক বলতে পারেন না। এজন্য তিনি উদ্বিগ্ন। এ সংবাদে আমার গায়ে তো রীতিমত ঘর্ম এসে গেল। তিনজন লোকের যথাসর্বস্ব এই এটাচির মধ্যে। ইহার মধ্যে রয়েছে অতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কয়েকশত আমেরিকান ডলার। যদি এই এটাচি পাওয়া না যায় তবে তিন জনেরই বিপদ।

ত্বরিত গতিতে মিঃ বড়ুয়া তার হোটেল জিলার্ত পিনাঙ্গ এ বন্ধুর গাড়ীতে চেপে বন্ধুটি সহ ছুটে গেলেন। হোটেলে গিয়ে দেখেন হোটেলের পরিচালক সবে মাত্র এটাচিখানি ম্যানেজারের কাছে এনে জমা দিয়েছেন। ম্যানেজার সাহেব ভাবছেন কি করে এটাচিখানা তার মালিকের কাছে পৌছান যায়। এমন সময় মিঃ বড়ুয়াকে দেখে একগাল হেসে দিলেন এবং বলে উঠলেন- "আপনি না আসলেও এটাচিখানি আপনার কাছে পৌছে দিতাম।" এটাচি তখনতার প্রভুকে দেখে যেন ম্যানেজারের টেবিলের কোণে লজ্জায় অভিভূত হয়ে লুকিয়ে আছে। ম্যানেজার সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমাদের দেবপ্রিয় বাবু এটাচিখানি নিয়ে ফিরে এলেন আমরাও স্বস্থির নিশ্বাস ত্যাগ করলাম।

ধন্যবাদ মালয়েশিয়া বাসীকে। চরিত্রের সততা, আত্ম সচেতন, জাতীয়তাবোধ তাঁদের সুতীক্ষ্ণ, বিনয় নম্রতা বিশ্বাস বৈশিষ্ট্যবোধ তাঁদের জাতীয় চরিত্র। এজন্য তাঁরা সব ক্ষেত্রেই উন্নত। জীবনের কোনরূপ অন্তরায়ে আবদ্ধ নহেন। চোখ মারলে যাদের চার পয়সার জিনিষ সম্মুখ থেকে উধাও হয়, তারা কি করে আশা করতে পারে যে কয়েক শত ডলার রাখা হারানো একটা এটাচি এত অনায়াসে নিখুঁতভাবে পাওয়া সম্ভব। অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যানেজার তথা মালয়েশিয়া বাসীকে। ধন্যবাদ আপনাদের জন্মান্তরের সুকৃতিকে।

আমি বাসে বসেই বিশ্বের বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংঘের প্রতিনিধিদের পানে তাকিয়ে রলাম। পরস্পর হস্ত মর্দন, কোলাকুলি করে বিদায়ের শেষ দৃশ্যের করুণ দাবি ফুটিয়ে তুলছেন। আজ সকলে বিমর্ষ বদন, হাসি কারো মুখে বড় একটা নেই। থাকলে সে হাসি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের হাসি নয়। বুদ্ধির সজোরে কায়দা মাত্র। কারো চক্ষু টলমল কি সকরুণ দৃশ্য। ইংরেজ সত্যই বলছেন In every departing there is a element of death অর্থাৎ প্রত্যেক সম্মেলন ক্ষেত্র থেকে বিদায়ের কালে মানুষের অন্তরে সুক্ষ্মভাবে মৃত্যুর শোকচ্ছবি ফুটে উঠে।

মানুষের অন্তরে এমন সব বিগুন রয়েছে যার প্রভাবে কেউ কারো থেকে বিদায় নিতে চায় না। মিলিত থাকতেই চায়। ধরে রাখতেই চায়। কেউ কাকে ত্যাগ করতে চায় না। ইহা নূতন কথা নয় ইহা জগতের স্বাভাবিক ধর্ম তাই বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন–

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্ত ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন যেতে নাহি দিব হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

মানুষের এই অনির্বাস আকাংখা মানুষকে জাগতিক দুঃখে নিমগ্ন করে রাখে। তথাপি অন্তরের আকাংখা কেউ কাউকে যেতে দিবে না। অথচ সকলেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ জগতে এমন কোন শক্তি নেই যে চিরতরে এই মর জগতে কাউকেও ধরে রাখতে পারে। অদৃশ্যে অলক্ষ্যে নীরবে নিস্তব্ধে অবিরাম গতিতে সব চলে যায়। এই আকাংখার মূলগত চরিত্র হচ্ছে জগতের অনিত্যে নিত্যভাব নশ্বর বস্তুতে অবিনশ্বর কামনা বিশ্ব জোড়া দুঃখে সুখস্বপ্ন দর্শন।

এ আকাঙ্খা যাঁর অন্তরে ঐকান্তিক নিবৃতি লাভ করেছে- তাঁর পক্ষে এ জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ। এই দুঃখ মুক্তিই তাঁর পরমা শান্তি জীবন চেয়ে মরণে তাঁর অমৃত লাভ।

হিন্দু মন্দির, পিনাঙ্গ।
Hindu Temple, At Queen Street, Penang.

এই সত্য শুধু নিবৃত পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য নয়। সাধারণ লোকের পক্ষেও কথঞ্চিৎ শান্তি আছে। যদি স্মরণাতীত কাল থেকে এ জগৎ থেকে কেউ না যেত, সকলেই বেঁচে থাকত, এ দিকে বরাবর জন্ম গ্রহণ তো চলছেই, তবে জাগতিক লোকগুলির কি দশা ঘটত। তাই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে--থাকায় শান্তি নেই, যাওয়াতেই শান্তি, চিরতরে গেলে চির মঙ্গল।

পিনাঙ্গ থেকে বাস ছাড়তে প্রায় ৮ টা বেজে গেল। বাস আমাদিগকে নিয়ে ছুটলো। আমিও মহাপুরুষের পূত স্মৃতি স্মরণ পূর্বক 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা বলে চক্ষু মুদলাম। পিনাঙ্গ প্রেই ঘাট অতিক্রম করে বাস সাঁ সাঁ করে ছুটল। বাসে বসে পিনাঙ্গে চারদিন ব্যাপী কর্মসূচীর প্রত্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। একটানা তিন

ঘণ্টা পথ চলার পর বাস ১১টায় পেরেরূ প্রদেশের রাজধানী ইপোর এক গুহা মন্দিরের সামনে এসে থামল। এই মন্দিরের নাম পেরেক টং গুহা মন্দির। ইহার বহির দেশে ক্ষুদ্র জলাশয় নানা প্রকার মনোজ্ঞ পদ্মে সুশোভিত। রাজপথ থেকে মন্দিরে আনা-গোনার জন্য জলাশয়ের দুই ধারে দুইটি পথ পাক্কা প্রশস্ত। পথের আশে পাশে নানা বর্ণের ফুল ও ফুলের বৃক্ষ। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছবার আগে মনে হলো দরজার অনুরূপই ইহা একটি ছোট ঘাটো মন্দির হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ তা নহে দরজায় গিয়ে দেখি--অতি উচ্চ পর্ব্বত তলে বিরাট বিবর মাঝে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। তন্মধ্যে অনেকগুলো ভোজন টেবিল। প্রত্যেকটিতে নানা প্রকার আহার্য্যে ভর্তি।

আমরা একদম ভিতরের দিকে গিয়ে এক টেবিলে বসে চীনা পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্য পরম তৃপ্তির সহিত খেয়ে নিলাম। তারপর ইতস্তত ঘুরে ফিরে দেখতে গিয়ে গুহা প্রাঙ্গণ থেকে যে সিঁড়ী পর্ব্বত শীর্ষে চলে গেছে তা বেয়ে একদম উপরে গিয়ে উঠলাম। ভর লাগতে লাগল। কারণ সিঁড়ীর পাশে কোন রেলিং নেই। এক পার্শ্বে পর্বত গাত্র অপর পার্শ্ব শূন্য, খোলা। পড়বার উপক্রমে ধরবার কিছু নেই। গুহাটা নির্মাণ করা গুহা নহে। ইহা স্বাভাবিক প্রস্তরময় পর্ব্বতের গহ্বর পড়া স্থান"। এই গহ্বরটাই চীনাদের লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়ে কারুকার্য্য খচিত গুহা মন্দির। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদ্যায় চীনেরা যে জগতে শীর্ষ স্থানের অধিকারী ইহাও তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তাঁরা অলৌকিক কল্পনাকে রূপ দিতে জানেন। প্রকৃতিকে নিজেদের ইচ্ছা মত নির্মাণে নিপুন।

গুহার আনাচে কানাচে কোথায় কি আছে প্রায় দেখলাম। এখানে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে সকল বুদ্ধ মূর্ত্তি, যত সব দেব-দেবতার মূর্ত্তি জাতক কাহিনী সম্বলিত যে সব প্রতিকৃতি সবই স্বাভাবিক অর্থাৎ বাহ্যিক কোন বস্তুতে নির্মিত হয়নি। প্রাকৃতিক প্রস্তরের উপরই খোদাই করা মূর্তি। শুধু রং করার কাজটা বাহ্যিক বস্তুতে সম্পন্ন বলতে পারি।

যেহেতু দেখতে দরজার দিকে এগুতেই হঠাৎ সামনে একজন ফটো বিক্রেতা হাজির। পিনাঙ্গ যাওয়ার পথে ছে-তক্-কোক বিহারে যে ফটো তোলা হয়েছিল তার একেক কপি তিন ডলার করে বিক্রি করছে। আমার হাতে পয়সা নেই আমি মনে মনে উপায় খুঁজতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম--দরজায় দণ্ডায়মান (Lobsong Tanzin) Rinpoche (লোব সঙ্গ তনজিন) রিং পোছ। তাঁর সঙ্গে আগেই আমার কিছুটা প্রিয়তা জমে উঠেছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যম হলো--হিন্দি ভাষা ও বিষয় হলো--প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য শান্তি দেবের বোধিচর্য্যাবতার নামক ধর্ম গ্রন্থ। আলোচনায় বুঝা গেল--এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা হত।

আমি তাঁর পাশে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম--দেখিয়ে জী। আপ ফটো লিয়া? তিনি বললেন--হাঁ জী লিয়া।' কিতনা দাম ? 'তীন ডলার " তিনি আমাকে

জিজ্ঞেস করলেন--'আপ লিয়া?' আমি বল্‌লাম--কহাঁ জী, মেরী পাশ পৈসা তো নহী হায়, লেকিন লেনেকী তো জরুরৎ য়া। অমনি তিনি পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে বললেন,--লি জিয়ে তীন ডলার, ইসসে ফটো লি জীয়ে' তীন ডলার আপকো দাম করতা হুঁ।' আমি বললাম--'আপকো ধন্যবাদ, আপকা পাশ নাই শুক্র গুজার রহূঁ।'

তখন দুপুর প্রায় একটা। কতক্ষণ পরেই আমরা বাসে চাপলাম। বাস ছুটল ত্বরিত বেগে, সুদীর্ঘ সোয়া শত মাইল রাস্তা অতিক্রম করে বাস ঠিক পাঁচটায় কুয়ালালামপুর--সিংহলী বিহারের সামনে গিয়ে থামল। আজ তো আর পান্তাই উপত্যকার শিক্ষক-শিক্ষক কলেজ হোস্টেলে খাওয়া থাকা যাবে না। এখানেই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবেন যে কাকে কোথায় পাঠাবেন।

বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে বিভিন্ন স্থানে পাঠালাম। আমাদেরকে পাঠালেন শ্যাম দেশীয় এক নব নির্মিত বিহারে। বাস থেকে নেমে বিহারে ঢুকে দেখি বিহারটি আড়ম্বর শূন্য। বিহারের সম্মুখ ভাগে বুদ্ধ মন্দির। ইহা আকারে অত বড় নহে। পিছনে কিন্তু বিরাট প্রতিষ্ঠান। দ্বিতল প্রাসাদ উপরে আবাসিক ভিক্ষু ও আগন্তুকদের আবাস। উক্ত আবাসের এক আরাম প্রদ প্রকোষ্ঠে আমাদের থাকার জায়গা করে দিলেন। নিম্নে লাইব্রেরী ও বিরাট হল গৃহ। যেই হলে আলোচনা সভা ও জনসভা বসবার উপযুক্ত আয়তন। লাইব্রেরীর এক কোণে বিহার নির্মাণ কার্য্যে চাঁদা দাতাগণের তালিকা বোর্ড। তন্মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে--মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দেওয়ান টাংকু আবদুর রহমান পুত্রের বিখ্যাত নাম। মাত্র এক বৎসর পূর্বে নির্মিত এই বিহার নির্মাণ কার্য্যে তিনি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার দান করেছেন। অবশ্য জানতে সুযোগ পাইনি যে প্রধানমন্ত্রী এত বড় দান কার্য্যটি কি ব্যক্তিগত তহবিল থেকেই সম্পন্ন করেছেন না রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীরূপে রাজ কোষ থেকে করেছেন? যদি সরকারী তহবিল থেকে দান দিয়ে থাকেন, তবে তাঁর ব্যক্তিগত নাম দাতা তালিকার মধ্যে থাকবে কেন? তাছাড়াও তাঁর জনপ্রিয় নামটি এক নম্বর দাতা রূপে আরও কয়েকটি বিহারে দেখেছি। অবশ্য এ কথা সত্য যে সরকারী বা বেসরকারী এরূপ মোটা দান না থাকলে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। কোন জনহিতকর কিংবা সমাজ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে সরকারী বে-সরকারী মোটা সাহায্য প্রয়োজন।

রাত্রি এগারটার সময় যখন শয্যার উপর উপবেশন করলাম,--তখন আকাশে ঘন ঘন মেঘ গর্জন হচ্ছিল এবং মৃদু মন্দ বাতাসের সহিত বেশ এক পশলা মেঘ বর্ষণ হয়ে গেল। তাতে শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যাওয়ায় নিদ্রার আবেশে বিছানায় ঢুকে পড়লাম।

এগার

অদ্য ২২শে এপ্রিল মঙ্গলবার। যথারীতি ভোর ৫টায় শয্যা-ত্যাগ করে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে নিলাম। আজ সকাল বেলায় বিশেষ কোন কর্মব্যস্ততা নেই বলে

মনের উদ্বিগ্নতাও তত নেই। ধীরে সুস্থে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা স্মৃতি উৎপাদনপূর্বক প্রাতঃ বন্দনায় বড় আনন্দ লাভ করলাম। অতঃপর শ্যাম দেশীয় রুচিসম্মত সুস্বাদু প্রাতঃরাশ গ্রহণ করার পর সকাল বেলাটায় ঘুরে ফিরে দেখলাম।

এই বিহারে বসবাসকারী ভিক্ষুরা ধর্ম প্রচার কল্পে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন। সপ্তাহান্তে আলোচনা সভার আয়োজন করেন। প্রতি মাসে বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন ও ঐতিহ্যমূলক সারগর্ভ নিবন্ধ নিয়ে থাই ও চৈনিক ভাষায় পত্রিকা বের করেন। বিশিষ্ট পর্ব দিনে উৎসব, ধর্মানুষ্ঠান ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরীর মাধ্যমে দৈনন্দিন পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। বুদ্ধের প্রতিকৃতি চিত্রিত মাসিক পঞ্জিকা এবং পুস্তক পুস্তিকার আকারে বহু গ্রন্থাদি তাঁরা বের করে থাকেন।

সকাল বেলাই সিঙ্গাপুর যাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরেই গাড়ী এসে হাজির। তাড়াহুড়া করে ব্যাগ-এণ্ড-ব্যাগেজ নিয়ে গাড়ীতে চাপলাম। গাড়ীর ড্রাইভার হচ্ছে চীন দেশীয় কমনীয় কান্তির এক সুঠাম যুবক। বড় অমায়িক তাঁর। তার ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

গাড়ী ছাড়তে প্রায় একটা বেজে গেল। আমরা যাত্রী ছিলাম পাঁচজন। আমরা তিনজন পাকিস্তানী প্রতিনিধি, ব্যাঙ্ককে অধ্যয়নরত পাকিস্তানী ভিক্ষু বসু মিত্র ও অন্য একজন বিদেশী ভিক্ষু। গাড়ীটি ছিল বড় আরাম-প্রদ। ড্রাইভারসহ তিনজন সম্মুখে ও অপর দুইজন সহ আমি পিছনের সিটে বসলাম। গাড়ী আমাদিগকে কুক্ষিতে ধারণ করে বায়ু বেগে ছুটল। আমি তথাগতের পবিত্র নামের সাথে 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা" বারংবার উচ্চারণ করতে লাগলাম।

অনুচ্চ শৈল শ্রেণীর বুক চিরে এই রাজবীথি সিঙ্গাপুরের সমুদ্র তট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বীথির উভয় পার্শ্বে রাবার বাগান ও রোম বৃক্ষের বিচিত্র উদ্যান। রবার বাগান ও রোম বাগানের শেষ নেই। গাড়ী দৌড়ছে সামনে আর বৃক্ষগুলি যেন দৌড়ছে পিছনে। বাগানের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে মনুষ্য বসতি। তা দেখতে অতি মনোরম। এরূপ শত শত জলপদ, নগর বন্দর অতিক্রম করে--গাড়ী কুয়ালালামপুর থেকে প্রায় তিনশত মাইল ব্যবধানে অবস্থিত--সিঙ্গাপুরে পৌছল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কি আটটা।

হঠাৎ গাড়ীটি রাস্তার পার্শ্বে রেখে আমাদের ড্রাইভার একটি মানচিত্র হাতে করে তার এক বন্ধুর বাসায় ঢুকে পড়ল এবং মানচিত্র দেখে তার বন্ধুর থেকে রাস্তার নির্দেশ নিল। অতঃপর ড্রাইভার একটি বড় রাস্তা ধরে গাড়ী আস্তে আস্তে চালাচ্ছে আর অভিপ্রেত রাস্তাটি খুঁজছে। কিয়দ্দুর অগ্রসর হতেই হঠাৎ আমাদের বড়ুয়া বাবুর চোখে পড়ল থোমসন্ রোড--যে রোডে শ্রীলঙ্কারাম নামে সিংহল দেশীয় বিহার প্রতিষ্ঠিত। এই বিহার বের করতে কি বা তাতে পৌছতে বেশী সময় ব্যয় হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শ্রীলঙ্কারামে পৌছলে শ্রীলঙ্কারামের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় গুনশ্রী

মহাথের আমাদেরকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় জানতে পারলাম--তিনি সিংহলের পানাদুরা বিদ্যোদয় পরিবেণের অধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত পূজ্য উপসেন মহাথের ও উপ-অধ্যক্ষ পূজ্য বুদ্ধদত্ত মহাথেরোর শিষ্য। আমার পরোলোকগত উপাধ্যায় পরম পূজনীয় গুনালঙ্কার মহাথের ও পরমারাধ্য আচার্য্য দেব শ্রীমৎ ধর্ম্মাধার মহাথের মহোদয়গণের গুরু ভাই। আমি শ্রীমৎ গুনশ্রীর গুরু ভাইগণের শিষ্য বলে আমাকে পরম স্নেহ ভরে ও আপনত্ব বোধে গ্রহণ করলেন। আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে ও গুরু জ্ঞানেই গ্রহণ করলাম। আমি তাঁকে পেয়ে পরলোকগত উপাধ্যায় ও প্রবাসী আচার্য্য দেবের যেন স্বয়ং সাক্ষাৎ পুত চরিত্রের মধুর সাহচর্য্য লাভ করলাম এবং নিজকে সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত মনে করলাম। নূতন জায়গায় দু'চারি দিন থাকতে ও খেতে হলে মানুষের পক্ষে যা যা প্রয়োজন, যা জ্ঞাতব্য মহাথের মহোদয় আমাদেরকে একে একে সব বলে দিলেন। কোথায় থাকতে হবে, কোথায় প্রস্রাব করতে হবে কোথায় পায়খানা, বা জলের ব্যবস্থা সব দেখিয়ে দিলেন। কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজন করি, কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজন করি না এবং আমাদের গিলান প্রত্যয় কিরূপ হতে পারে--সব কিছু জিজ্ঞেস করে নিলেন। সংক্ষেপে এক কথায় বলতে গেলে আগন্তুক ভিক্ষুর প্রতি বিনয়তঃ আবাসিক ভিক্ষুর যা ব্রত, যা কর্তব্য--পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা পালন করলেন। আমরাও আগন্তুক ভিক্ষু হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠ আবাসিক ভিক্ষুর প্রতি যা করণীয় যত দূর সম্ভব--তা করে নিলাম।

রাত্রি প্রায় এগারটায় শয্যা গ্রহণ করতে গিয়ে দেখি--আমার জন্য একটি ক্যাম্প খাটের উপর বিছানা পাতা হয়েছে এবং ইহাতে একখানি জাপানী পদ্ধতির মশারি খাটানো। ঠিক যেন আমাদের দেশের খড়ের মুড়ল। আমাদের চতুষ্কোষী মশারির মত নহে। আমি ইহার ভিতরে ঢুকেই 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা' বলে চোখ মুদলাম এবং শুয়ে পড়লাম।

বার

আজ ২৩শে এপ্রিল বুধবার, অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ পূর্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিলাম। বন্দনা করার উদ্দেশ্যে যখন মন্দিরে প্রবেশ করলাম--তখন তো আমি অবাক। রাত্রির অন্ধকারে গতকল্য বিহারের বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যায় নি। এখন তো সব চক্ষুর গোচরে প্রকাশিত। মন্দিরটি বিরাট ত্রিতল প্রাসাদ। প্রত্যেক তলাতে বিরাটকায় প্রতিমা। প্রতিমার সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। সর্ব্ব নিম্নতলার পিছনের দিকে বিরাট লাইব্রেরী। মন্দিরের দরজাটি অত্যন্ত কারুকার্য্য খচিত ও বৈশিষ্ট্যময়। দরজার উপরে, নিম্নে, উভয় পার্শ্বে ও মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পথে নানা রকমের জীব জানোয়ারের মূর্ত্তি খচিত। কি চমৎকার দৃশ্য? জীব জানোয়ারের চোখের দিকে তাকালে মনে হয়--সব মিলে যেন আগন্তুককে অভ্যর্থনা করার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান।

বুদ্ধ বন্দনা সেরে বোধি বন্দনায় গিয়ে আরো বিস্মিত হলাম। একটি গোল পার্কের মাঝে বোধি বৃক্ষ। চর্তুপার্শ্বে পাকা চত্ত্বরোপরি চারটি ব্রোঞ্চ নির্মিত মনোরম মূর্ত্তি। বোধি বন্দনা করে উঠতে না উঠতেই ডাক আসল প্রাতঃরাশের। ভোজনালয়ে প্রবেশ করে দেখি--ভিক্ষুদের যে সেবক সে অসঙ্কোচে এক প্রান্তে দন্ডায়মান। সে শুধু আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। অপর ভিক্ষুরা সব এসে গেছেন। অতঃপর সেবক একে একে সব ভিক্ষুদের হাতে টেবিলের উপর সজ্জিত প্রচুর পরিচিত খাদ্য-ভোজ্য গচ্ছিত করে দিলে আমরা তৃপ্তি ভরে খেলাম। সব সিংহল দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত খাদ্য-ভোজ্য সম্ভার। অধিকন্তু চা, কফি, ফল-পাকরার মধ্যে সিঙ্গাপুরী কলা, আনারস আরো কত রকমের ফল--অত নাম কি আমি জানি?

গাড়ীর ড্রাইভারকে পূর্বেই বলে রাখা হয়েছিল যে প্রাতঃরাশের পরে সাতটা কি সাড়ে সাতটায় আমরা সিঙ্গাপুরের কতক দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য বের হব। সে যেন গাড়ী নিয়ে আসে। কাজেই কথানুসারে ড্রাইভার তার গাড়ী নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছল। আমরা গাড়ীতে চাপলাম এবং 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা' বলে রওনা হলাম। আমাদেরকে কোথায় কি দেখাবে--তা ড্রাইভারের উপর নির্ভর করেছি। কারণ আমরা নিতান্ত আনাড়ী। ড্রাইভার সিঙ্গাপুরের আনাচ-কানাচ সম্পর্কেও অভিজ্ঞ। প্রথমতঃ সে আমাদেরকে নিল মনুমেন্টে। গত মহাযুদ্ধে যাঁরা দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে গিয়ে জীবন দান করেছেন--তাঁদের পূণ্য-স্মৃতি সংরক্ষিত। মরজগৎ থেকে তাঁরা চিরতরে চলে গেছেন--কিন্তু দেশ তাঁদেরকে ভুলে নাই। তাঁদেরকে রেখে দিয়েছে মূর্ত্তির আকারে মহাকালের গর্ভে, ইতিহাসে, মানুষের মনো-মন্দিরে। ইহাতে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন অনন্তকালাবধি।

সেখান থেকে গাড়ী চলল সমুদ্র তট ঘেঁষে। অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর গাড়ী থামল টাইগার বাম গার্ডেনের সামনে এবং ড্রাইভার তথায় আমাদেরকে নামিয়ে দিল। টাইগার বাম গার্ডেনের এক ধারে মহাসমুদ্র। অপর ধারে পর্বত পাদ। ইহা চীন দেশীয় ব্যবসায়ী অ-বুন-হ এবং অন-বুন-পর নামক দুই ব্যক্তি দ্বারা আট একর ভূমির উপর তিন লক্ষাধিক ডলার ব্যয়ে ১৯৩৭ সনে প্রতিষ্ঠিত। এই গার্ডেন তাঁদের ব্যবসায় লব্ধ অর্থ ও ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রচার লাভের উদ্দেশ্যেই চীনা কারিগর দ্বারা নির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন স্বরূপ, স্বদেশ বিদেশ থেকে দর্শকরূপে বহুলোক এই স্থানে এসে ভিড় করলেন। ইহার মধ্যে এশিয়া খণ্ডের কোন কোন জাতির নিদর্শন থাকলেও উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নেই। একমাত্র চীনা জাতির সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ধর্ম বিশ্বাস এবং চীন দেশের প্রাকৃতিক ভৌগলিক বিষয় সম্পর্কে কয়েক হাজার বছরের উল্লেখযোগ্য জ্ঞাতব্য বিষয় মূল মডেল বা আদর্শের রূপক দৃশ্য রূপে মূর্ত্ত প্রতীক করে রেখেছে। এদিকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন--এই টাইগার বাম গার্ডেন।

কারো অন্তরে যদি বিখ্যাত চীনা জাতি কিংবা বিশাল চীন সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জাগে তবে তার প্রকৃষ্ট জবাব মিলবে মিত্র বিচিত্র দৃশ্যমান মূর্ত্তির আকারে রূপায়িত ও নির্মিত এই উদ্যানে। আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি বটে কিন্তু ভাষায় ইহার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। যেমন- যদি প্রশ্ন করা হয় যে চীন সাগরে কোন্ কোন্ জল জন্তু বাস করে। তা হলে মডেলের আকারে দেখতে পারেন--এই গার্ডেনে একটি কৃত্রিম সমুদ্রের সৃষ্টি করে যত সব বিচরণকারী জীবজন্তু থাকা সম্ভব, তাতে সবই রয়েছে যদি প্রশ্ন জাগে যে চীন সাম্রাজ্যের পর্বত গহনে কোন্ কোন্ জীব জানোয়ারের বাস? তবে দেখতে পারেন--এটি নকল পর্বতারণ্য রচনা করে তাতে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, অজগর প্রভৃতি সাধারণ আরণ্যক হিংস্র জন্তু ও অন্যত্র বিরল জানোয়ারের অসংখ্যক সমাবেশ। চীনা জাতির মৌলিক ধর্ম কি? তার সমাধানে দেখতে পাবনে বুদ্ধ বোধি বোধি সত্ত্বগণের মূর্ত্তি, প্রতিকৃতি ও তাঁদের জীবনের কথাকাহিনী সম্বলিত অপূর্ব নিদর্শন সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক সামাজিক ও ধর্মীয় সব রকমের নিদর্শন এই টাইগার গার্ডেনে।

ছোটবেলায় কলকাতায় অবস্থান কালেও লক্ষ্য করে ছিলাম আর এ যাত্রায় লক্ষ্য করলাম মালয়েশিয়ায় চীনা জাতি বড় পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ ও কষ্টসহিষ্ণু। সারাদিন রাত তারা মেসিনের মত কাজ করে। মেসিনের উৎস হচ্ছে--বিদ্যুৎ শক্তি। সুইচ টিপলেই মেসিন চলার আরম্ভ হয়, আর এই চীনা জাতিটি চলছে অফুরন্ত উৎসাহ অদম্য মনোবল। পরিশ্রম ও বাণিজ্য তাদের জাতীয় জীবনের প্রধান উৎস। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তারা সমান ওয়াকেবহাল। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তারা যেরূপ চরিত্র ও বুদ্ধির পরিচয় দিতে সক্ষম--এশিয়া খণ্ডে আর কোন জাতিকে সেরূপ দেখা যায় না। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ ও ঘটনাকে জাতীয় চরিত্রে প্রতিফলিত করতে, ইতিহাসকে জাতীয় জীবনে আত্মস্থ করতে তারা সুদক্ষ। তারা জানে জাতীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণকে কিরূপে বংশ পরম্পরায় আগলে রাখা যায়। তারা জানে কিরূপে বর্তমানকে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সম্মুখে তুলে ধরে তাদেরকে গড়ে তোলা যায়। ধর্ম ক্ষেত্রেও তাদের অসীম ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেখেছি। সপ্তম শতাব্দীতে ইউ-য়েন-সাং, ইটসি প্রভৃতি চৈনিক পর্যটকগণ দশ হাজার মাইল দুর্লঙ্ঘ্য গিরি কান্তর পদব্রজে অতিক্রম করে বুদ্ধের ধর্ম শিখবার ও সাধনার জন্য ভারত বর্ষে এসে ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমে ধর্ম শিক্ষা ও সাধনার পর ধর্ম শাস্ত্রের বোঝাই করা পুঁথি পৃষ্ঠে বহন করে নিজ দেশে নিয়ে গিয়ে ছিলেন এবং নিজ দেশে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন বিজ্ঞানের পরিচয় ছিল না। ছিল তাদের মনোবল ও পাথুরে চরণ যুগল। ইতোমধ্যে ভারতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি লুপ্ত ও ধ্বংস প্রায়। বৌদ্ধ ধর্ম পুনরুদ্ধার হয় চীন দেশ থেকে। চীনাদের কঠোর পরিশ্রমে অসীম ধৈর্যে পরম সৌজন্যে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে চীন জাতি যতখানি পাক-ভারতের কাছে ঋণী, পাক-ভারতের

বৌদ্ধেরাও এই ধর্মের পুনরুদ্ধার ক্ষেত্রে চীনাজাতির নিকট ততখানি ঋণী। বর্তমানে চীনা জাতি সমগ্র বিশ্বের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যায় যেমন গরিষ্ঠ ক্ষমতায়ও অদূর ভবিষ্যতে যে প্রধানতম হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

মধ্যাহ্ন আহারের সময় হয়ে আসছে--আমরা টাইগার বাম গার্ডেন দর্শন করে বিহারে ফিরছি। ফিরার পথে টাকার এক্সচেঞ্জের জন্য পর পর কয়েকটি ব্যাঙ্ক খোঁজ নিয়েও সফল হওয়া গেল না। তাতে বেশ কিছু সময় ব্যয়িত হয়ে যায়। ঘড়িতে প্রায় এগারটা। আমরা বিহারে এসে পৌঁছলাম। গাড়ী থেকে নেমে আমরা হাত মুখ প্রক্ষালন করে ভোজনালয়ে গিয়ে দেখি--বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদরে জন্য অপেক্ষামান। ঐ দিকে সিংহল দেশীয় ভদ্র মহিলা যিনি অদ্য ভিক্ষুদেয় আহার্য্য দান করেছেন--উৎসর্গ করার জন্য এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের উপস্থিতির পর ভদ্র মহিলা যথানিয়মে আহার্য্য দান করে দিলেন। খেতে বসে দেখি প্রায় আহার্য্যগুলো সিংহল দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত। সিংহল দেশীয় খাদ্য পাক-ভারত থেকে বেশী তফাৎ নয়। প্রস্তুত প্রণালী বা রুচির বিশেষ তারতম্য নেই। আমরা তৃপ্তির সহিত খেয়ে নিলাম।

সিংহলী ভদ্রলোক শ্রীলঙ্কারাম বিহার কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি আমাদেরকে অনুরোধ করলেন--অদ্য বিকাল পাঁচটায় বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে যেন একটা বাংলা বক্তৃতা প্রদান করি। ভদ্রলোক ইহা Tap Record যন্ত্রে ধরে নিবেন এবং এই বক্তৃতা আসন্ন বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবে জনসভায় উদ্বোধন করবেন। কারণ উৎসবে বহু বাঙ্গালী সমাগম হয়। বাংলা বক্তৃতা হলে বাঙ্গালীদের পক্ষে সুবিধা হবে। এই প্রস্তাবে আমরা সম্মতি দিলাম। সকলের শুভেচ্ছায় আমিই সে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমি সে জন্য দুপুর থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে একটা বক্তৃতা প্রস্তুত করলাম। কিন্তু ভদ্রলোক ৫টায় আর আসলেন না। আসলেন রাত্রি প্রায় আটটায়। রাত্রি আটটায় আমার বক্তৃতা Record করলেন। অতঃপর মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাথের মঙ্গল সূত্র পাঠ করলেন এবং বাবু দেবপ্রিয় বড়ুয়া Buddhism in Pakistan অর্থাৎ পাকিস্তানে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব রেকর্ড করে নিলেন। এগুলো আবার পরীক্ষার অভিপ্রায়ে তৎক্ষণাৎ উদ্বোধন করে দেখলেন যে সব ঠিক আছে। এখন রাত্রি এগারটা। আমি শুতে গিয়ে দেহখানি শয্যোপরি নিক্ষেপ করলাম এবং সব্বে ভবন্তু সুখিত'ত্তা বলে চক্ষুদ্বয় মুদলাম।

তের

ভোর ৫টায় গাত্রোত্থান করে যথারীতি আচমন কর্মাদি সেরে নিলাম। অদ্য বৃহস্পতিবার ২৪শে এপ্রিল। আজ বিশেষ কোন কাজের প্রোগ্রাম নেই। আছে সামান্য কিছু বাজার করা মাত্র। আমার শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না বলে আমি সারা দিন অবসরেই কাটালাম। মাননীয় মহাথের আয়ুষ্মান ধর্মপাল, বসু মিত্র ও বাবু দেবপ্রিয়

বড়ুয়া সিংহলী একজন গাইড নিয়ে সিঙ্গাপুর বাজারে গেলেন এবং নিজের দ্রব্যের সাথে আমার জন্যও কিছু দ্রব্য ক্রয় করে আনলেন।

এদিকে আমি বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় গুন-শ্রী মহাথেরের সঙ্গে সারাদিন ব্যাপী বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষু যাঁরা সিংহলে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম ও পালি শিক্ষার উদ্দেশ্যে গিয়ে ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে, পাকিস্তানী ভিক্ষুদের শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কে গাল গল্প করে করে কাটালাম। তিনি তাঁর সহ-বিহারী সতীর্থ বন্ধু আমার আচার্য উপাধ্যায় গণের নানা গুণ বর্ণনা করলেন এবং আমাকে সিংহলে বেড়াতে যাওয়ার জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা যোগালেন।

সন্ধ্যায় যখন নানারূপ মনোজ্ঞ বাজার সদাই এসে পৌঁছল, একে একে সব দেখে নিলাম তখন চোখ জুড়িয়ে গেল। মন প্রাণ তৃপ্ত হয়ে গেল। সিঙ্গাপুর বাণিজ্য শুল্কহীন শ্রেষ্ঠ বন্দর। শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র ও প্রোতাশ্রয়। জিনিষপত্রের দর--আমাদের দেশের তুলনায় সিঙ্গাপুর এক তৃতীয়াংশ। এখানকার তিন টাকার জিনিষ সিঙ্গাপুর এক টাকা বা আরো কম। তাই সিঙ্গাপুর বাজারের প্রতি একটা লুব্ধ দৃষ্টি থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হচ্ছিল--যদি মোটা টাকা পয়সা থাকত, তবে বন্ধু-বান্ধবের জন্য দেশে কত জিনিষই বা নিতাম । সামর্থ থাকলে গোটা সিঙ্গাপুর বাজারটাই দেশে নিয়ে যেতাম। ফল পাকরার দিকে তাকালে তেঁতুল দর্শনের ন্যায় জিহবার লালসার লোল আসে। সিঙ্গাপুরের কলা ও আনারস তো জগদ্বিখ্যাত। দুনিয়ার সব দেশের লোকেই অল্প বেশী এই সিঙ্গাপুরে বাস করে। কাজেই সিঙ্গাপুরের স্বল্প মুল্যের দ্রব্য যায় না-এমন জায়গা দুনিয়ার খুব কমই আছে।

নানা দিক দিয়ে সিঙ্গাপুর মহানগরী বড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান একটি মাত্র নগরীর উপর নির্ভর করে একটি রাষ্ট্র চলতে পারে তার এরূপ শক্তি সামর্থ রয়েছে নগরীর বাহিরে কতগুলো বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে সিঙ্গাপুর নামে নুতন রাষ্ট্র গঠিত। সমুদ্রের অগভীর অংশে বাঁধ বেঁধে মালয়েশিয়ার সঙ্গে সিঙ্গাপুরকে সংযুক্ত করেছে। ইহার আয়তন ২২৪ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা বার লক্ষ মাত্র। অধিকাংশ চীনা জাতির বাস।

শয্যায় গমনের পূর্বেই নিজ নিজ জিনিষ পত্র সব গুছিয়ে নিলাম। ভোরে ভোরে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে কুয়ালালামপুর রওনা হতে হবে। গাড়ীর ড্রাইভারকে একথা বলে রাখা হয়েছে- সে যেন গাড়ী নিয়ে ঠিক ৬ টায় বিহারে এসে হাজির হয়। তখন আর এদিক ওদিক করে সময় ক্ষেপন করা যাবে না। এই বলে সকলে শয্যায় গমন করলাম এবং "সব্বে সত্তা ভবন্ত সুখিত"তা বলে লম্বা হয়ে গেলাম।

চৌদ্দ

অদ্য শুক্রবার ২৫মে এপ্রিল ভোর রাত্রি ৪ টায় শয্যা ত্যাগ করে যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সব সেরে নিলাম এবং বন্দনাদি পূর্বক প্রাতঃরাশ গ্রহণ করলাম। বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ গুণ-শ্রী মহাথের চীবর, পেন, খাদ্য দ্রব্য ও ঔষধ ইত্যাদি অনেক

জিনিষ উপহার দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার আমি কিছু দিতে পারলাম না। এক কপি পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি অতিরিক্ত ছিল। পিনাঙ্গ একই বিহারের দুইজনকে দুই কপি দেওয়াতে কম পড়ে গেল। নচেৎ এক কপি এখানে দান করা যেত। কাজেই উপায় নেই। অন্তরের সরল শ্রদ্ধা ছাড়া তাঁর প্রতি অন্য কিছু নিবেদন করা গেল না। পঞ্চাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক মহাথের মহোদয় থেকে বিদায় নিলাম।

ঠিক ৬টায় আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে রওনা হলাম গাড়ী আমাদরেকে বক্ষে ধারণ করে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটল। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হাতে আসলে গাড়ী গিয়ে থামল রাস্তার ধারে এক বাজারে। কয়েকটি হোটেলই পাশাপাশি রয়েছে। চীনা হোটেল, মলয় হোটেল ও দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু হোটেল। আমরা ভারতীয় হিন্দু হোটেলে ঢুকে দেখি-বিষুব রেখা অঙ্কিত দেশের লোক সব যম কালো ড্রাইভার তার জাতীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে চীনা হোটেলে ঢুকল। এখন আমাদের বিপদ। খেতে বসে লবণকে লবণ বললাম, নিমক বললাম রামরস বললাম Salt বললাম। কোন রকমেই পারা গেল না। অবশেষে আঙ্গুলীর মাথায় করে জিহ্বাগ্রে লবণ পুরবার ভঙ্গী দেখালে লবণ এসে হাজির হল। হোটেল ওয়ালারা না বুঝে হিন্দি না জানে ইংরেজী। তাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময়ের জন্য কোন ভাষাকেই মাধ্যম করতে পারলাম না। ইশারা ঈঙ্গিতে সব শুরু হল। ভাত মাছ তরকারী এনে দিল। তাড়াতাড়ি গ্রো-গ্রাসে সব গিলে ফেললাম। পয়সা যত আনল, সব আমাদের মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়াই দিলেন।

পুনরায় গাড়ীতে চাপলাম। গাড়ী আমাদিগকে কুক্ষিতে নিয়ে দৈত্য বেগে ছুটল এবং সাড়ে তিনটায় কুয়ালালামপুর এসে পৌছল।

শ্যাম দেশীয় যে বিহার থেকে আমরা সিঙ্গাপুর গিয়ে ছিলাম। সেই বিহারেই পুনরায় আশ্রয় নিলাম। আমাদের বাবু দেবপ্রিয় বড়ুয়া গেলেন- পাকিস্তানী এম্বেসীর লোক বন্ধু মোশারেফ হোসেন সাহেবকে ডেকে পাঠাবেন। ফোনে যোগাযোগ করবেন। তাঁর কাছে আমাদের তিন জনেরই পাসপোর্ট ছিল। তিনি আমাদের জন্য থাইল্যাণ্ড যাওয়ার ভিসা নিয়ে রাখবেন।

হোসেন সাহেব রাত্রি আটটায় আমাদের ভিসা পাসপোর্ট সব নিয়ে আসলেন। তাঁর সঙ্গে অকেক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমাদের থেকে বিদায় নিলেন। তিনি আমাদের মারফতে কিছুটা দ্রব্য বাড়ীতে পাঠালেন বৃদ্ধ পিতা পিতৃব্যের জন্য।

তখন রাত্রি এগারটা। অতঃপর জগতের সকল প্রাণীর প্রতি শুভেচ্ছা পোষণ করে শয্যা গ্রহণ করলাম।

রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। একটি তারকার চিহ্ন ও লক্ষ পড়েনি। মৃদু মৃদু বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত লাগতে রাত্রে গায়ে চীবর ব্যবহার

করতে হয়েছে। নচেৎ গরম ও মশার উপদ্রবে সারা রাত্রি বিনিদ্রই পোহাত। রাত্রে তন্দ্রাভিভুত অবস্থায় ঘন ঘন মেঘ গর্জন শুনা গিয়াছে। শেষ রাত্রে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

পনর

২৬শে এপ্রিল শনিবার। ভোরে উঠতেই তথাগতের পুন্যস্মৃতি স্মরণ করার সঙ্গে "সব্বে সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা বলে গাত্রোত্থান করলাম। অমনি মাননীয় মহাথেরো ঘুমের ঘোরে বলে উঠলেন, যান একজন একজন সেরে নিন, পায়খানা, স্নানাগার, প্রশ্রাবখানা সব মিলে একটি প্রকোষ্ট। এক সময় একাধিক লোক যাওয়ার সুযোগ নেই, এজন্য মহাথের বলছেন, যান, একজন একজন সেরে নিন।

আমি সকলের আগেই শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক যথারীতি প্রাতঃ কর্ম সেরে বন্দনাদি করলাম। আজ থাইল্যাণ্ড রওনা দিবার দিন। আয়ুস্মান বসু মিত্র এখন আমাদের সঙ্গে থাকলেও তাঁর উড়ো জাহাজের টিকিটের বিভ্রাটে তাঁকে আবার পিনাঙ্গ হয়ে যেতে হবে। তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। তিনি এসেছেন একা যাবেন ও একা। কাজেই বসু মিত্র পিনাঙ্গ হয়ে থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে আমাদের থেকে বিদায় নিলেন।

অতঃপর বিহারধ্যক্ষ মহাথের থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তাঁর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। তিনিও আমাদের প্রতি শুভেচ্ছা পোষণ করে বিদায় দিলেন।

গাড়ী এসে বিহারে পৌঁছলে আমরা নিজ নিজ পুঁটুলি-পাটলি নিয়ে গাড়ীতে চাপলাম। ক্ষুধা পেয়েছে, খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল, সমাদর ও কম করেনি। কিন্ত সন্দেহ যদি খেয়ে যাই, যদি বিমান বন্দর পাসপোর্ট টিকেট প্রভৃতি টুকটাক কাজে বিলম্ব হয়,--তবে তো মুস্কিল। বস্তুতঃ কার্য্যে ক্ষেত্রে মটল তার বিপরীত অর্থাৎ বিমান ছাড়বার অনেক আগেই আমরা বিমানবন্দরে পৌছলাম। তথায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। ইত্যবসরে বিমান বন্দরের স্টলে কেউ কেউ টিফিন করলেন। আমার উদ্দেশ্য বিমান ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে খাবার আরোহিদের পরিবেশন করে তাই তো যথেষ্ট। আধা ঘন্টার জন্য এখানে পয়সা দিয়ে খেয়ে লাভ কি? এ জন্য আমি আর টিফিন করলাম না। আসলে বিমানের প্রকৃত ব্যবস্থা আমার ধারণার বাহিরে। বিমানে যে টিফিন-টাইমে টিফিন, ভোজন টাইমে ভোজনের ব্যবস্থা--এই ধারণা আমার ছিল না। আমি মনে করলাম,--সব সময়ই বিমানে প্রচুর খানার ব্যবস্থা করা হয়।

বিমানে আরোহনের ঘোষণা হলে আমি আসন থেকে উত্থিত হয়ে মালয়েশিয়ার দৃষ্ট মঠ মন্দির লক্ষ্য করে তগাগতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এবং মালয়েশিয়ার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক বিমান প্রাঙ্গণের দিকে রওনা দিলাম।

বিমানে আরোহনের কিয়ৎক্ষণ পরেই বিমান তো ভৈরব রবে গর্জন করে আলোড়িত হয়ে উঠল। তখন আমিও তথাগতের পবিত্র নাম স্মরণ পূর্বক "সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা" বলে উঠলাম। বিমান ক্রমশঃ আকাশে আরোহনকরলে কিছুক্ষণ পরেই পরিচারকেরা খানা নিয়ে আসল, আজ যে খানা পরিবেশন করল--আমার ঘনীভূত ক্ষুধার খোরাকের পরিমাণে তা তো কিছুই না। আমার লোভের পুরা দস্তুর ব্যর্থতাই ঘটল, যে ভরসায় ষ্টলে কিছু খেলাম না। অবশেষে ক্ষুধা ও লোভের চরিতার্থতার ব্যাঘাত মনোক্ষুন্নতাই ডেকে আনল। অনন্ত নীলাকাশের বক্ষ ভেদ করে ভীম বেগে উড়ে বিমানে যখন ব্যাঙ্কক বিমান বন্দরে অবতরণ করল,--তখন বেলা দশটা। বিমান থেকে আমিও মাননীয় মহোথেরো প্রাঙ্গণে গিয়ে বসলাম। মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া আমাদের পাসপোর্ট প্রভৃতি প্রদর্শনকরলেন এবং আয়ুষ্মান ধর্মপাল ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় টুকটাক কাজ সেরে দিলেন। এখান থেকে আয়ুষ্মান ধর্মপাল কলকাতার উদ্দেশ্যে আমাদের থেকে বিদায় নিলেন। বেশ কিছুদিনের সহ অবস্থিতির বিচ্ছেদে মনে একটু লেগে ছিল বই কি? বিদায়ের প্রাক্কালে প্রত্যেকের অন্তরে একটা করুণস্মৃতি জেগে উঠা অস্বাভাবিক নয়।

আমরা তিনজন বিমান বন্দর থেকে প্রাইভেট গাড়ী করে মার্বেল টেম্পলে গিয়ে পৌঁছলাম। একজন তরুণ ভিক্ষু আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাল এবং তাড়াতাড়ি ভোজনালয়ে নিয়ে গেল। খাওয়ার সময় বেশী ছিল না। ভোজন করছি এবং আড়ে আড়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। বিরাট ভোজনালয়, দুই শতের কাছে ভিক্ষু শ্রমন খাচ্ছেন। শুধু চামচের কিন্‌কিনী শব্দ ছাড়া দুই শত লোকের টু শব্দ নেই। স্থবির মহাস্থবির এখানে কেউ নেই। এখানে সব যুবক ভিক্ষু ও কিশোর শ্রামণগণ। কিছু বলবার প্রয়োজন হলে মাইকে বলেন। মাইক সর্বক্ষণের জন্য ভোজনালয়ের বিশিষ্ট ভোজন টেবিলে ফিট করা হয়েছে।

পাকিস্তানী (বর্তমান বাংলাদেশ) অপর একজন ভিক্ষু সোমানন্দ ধর্ম বিনয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই মার্বেল টেম্পলে অবস্থান করেন। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে পাকিস্তান থেকে তিনি শ্রামণ রূপে এসে থাইল্যান্ডের ভিক্ষুত্ব বরণ করছেন। তিনি আজ বিহারে উপস্থিত নেই। তিনি নবম বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়ার গমন করেন। সম্মেলন সমাপ্তির পর সিঙ্গাপুর ভ্রমণে যান। সেখানে আমাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলে ও তিনি আমাদের সাথে ফিরেননি। তিনি বলছেন সিঙ্গাপুর আরো কিছুদিন বেড়াবেন। এ যাবৎ কোন খবর এসে পৌছেনি যে তিনি কোন সময় তাঁর শিক্ষা কেন্দ্রে এসে পৌছবেন। শিক্ষা কামী হিসাবে থাইল্যাণ্ডে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং ধর্ম বিনয়েও বড় শ্রদ্ধাশীল ও শীলবান। তাঁর ব্যবহার মধুর ও অমায়িক।

ওয়াট বেঞ্চম বো পিতার-থাই ভাষার 'ওয়াট' শব্দের অর্থ ভিক্ষুগণের আবাসিক

সঙ্ঘারাম বা বিহার যেখানে বহু ভিক্ষু শ্রামণ বাস করেন। এই বেঞ্চম বো পিতার একটি প্রাচীন মন্দির। ইহার ইংরেজী নাম হচ্ছে Marble Temple বা শ্বেত পাথরের মন্দির। একথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত যে এই মন্দির কি থাইল্যাণ্ডের রাজধানী প্রাচীন অযোধ্যায় থাকাকালীন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-না-বর্তমান রাজধানী ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় রামের রাজত্ব কালে রাজা দ্বিতীয় রামের পাঁচ পুত্র এই মন্দির পুনরায় নূতনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এইজন্য ইহার নাম বেঞ্চম বো পিতার অর্থাৎ পাঁচজন রাজ কুমারের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে চুললংকর্ণ নামে রাজা পঞ্চম রাম যখন কয়েকটি মন্দিরের ভিত্তির উপর রাজ প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন,--তখন তাঁকে পুরাতন মন্দিরের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কতগুলো নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। রাজকীয় এরূপ প্রথানুযায়ী ওয়াট বেঞ্চমবো পিতার--মন্দিরটিও তখন নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। তখন থেকে ইহার নাম হয় ওয়াট বেঞ্চম বো পিতার অর্থাৎ পঞ্চ রাজ কুমার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দির।

এই মনির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল চারটি উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ তাঁর জীবনের স্মারক চিহ্ন সংরক্ষণ। দ্বিতীয়ত: ধর্ম সম্পর্কিত আধুনিক থাই স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্থাপন। তৃতীয়তঃ তথাগত বুদ্ধের মনোরম মূর্তি প্রদর্শনী এবং চতুর্থত: বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা কেন্দ্র স্বরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। কথিত আছে--রাজা চুললং কর্ণ তাঁর ছোট ভাই প্রসিদ্ধ শিল্পী কুমার 'নরিসচলুবত্তি বৎসকে আদেশ করে এই সঙ্ঘারামের নক্সা প্রস্তুত করিয়ে ছিলেন।

মার্বেল মন্দিরটি ইটালি থেকে সংগৃহীত মার্বেল পাথরে থাইনমুনা নির্মিত, ইহা থাইল্যান্ডের মধ্যে সর্বাধিক মনোরম মন্দির। আশ্চর্য্যজনক ইহার গঠন প্রণালী। আকারে বিরাট স্থান। ইহার অভ্যন্তরে ফ্র বুদ্ধ জিন রাজ নামে মনোহর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহের পাদ পীঠের নীচে প্রতিষ্ঠাতা রাজা চুললং কর্ণ পঞ্চম রামের চিতা ভস্ম তারই অভিপ্রায়ে রক্ষিত হয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে আরো চিত্তাকর্ষক বস্তু হল--দেওয়াল চিত্র। চিত্রগুলো বুদ্ধের ধাতু স্তুপের শোভা বর্ধন করছে। গণনায় ইহারা আটটি। দরজা জানালার উপরে ফিট করা যে চতুষ্কোণী কাচের মনোজ্ঞ ফলব--তা দেখতে অতিশয় নয়নমুগ্ধকর। এগুলো নাকি থাই শিল্পীর নক্সায় ও নির্দেশে ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে প্রস্তুত। প্রধান দ্বারের প্রবেশ পথে দুই পাশে দুই সিংহ মূর্তি। এগুলোও মার্বেল পাথরের তৈরী। ভাস্কর্য্য বিদ্যার অপূর্ব নিদর্শন।

ফ্র ধর্মচক্র নামে প্রধান মন্দিরের পিছনে চন্দ্রাতপ তলে একটি দাঁড়ান বুদ্ধ মূর্তি আছেন অতি প্রকাণ্ড। মূর্তির করতলে ধর্মচক্র চিহ্ন রয়েছে--যে ধর্মচক্রের সাধনায়, বৌদ্ধ ধর্মের চরম উদ্দেশ্য পরম শান্তি নির্বানে বহনকরে। ফ্র শাক্য সিংহ নামে মার বিজয়ী ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় পদ্মাসনে আসীন এক অতিশয় ভারী নিকেটে মূর্তি দেখলাম।

মূর্তিটি আয়ত চক্ষু ওষ্ঠাধর খুব মোটা গোলাকৃতির মুখ দেখতে অতিশয় গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক। ফ্র লীলা--নামে এক গমন শীল মূর্তি দেখলাম, যাহা সর্বাধিক উদ্দীপক। দর্শকের অন্তরে প্রেরণা যোগাতে এর সঙ্গে অপর কোন মূর্তি জুড়ি হয় না।

তা ছাড়া বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের চতুঃপার্শ্বের অলিন্দে প্রতিষ্ঠিত বহু বিগ্রহের শ্রেণীবদ্ধ প্রদর্শনী। হাজার বৎসর আগের থেকে কত কত শ্রদ্ধাশীল দাতা এই বিগ্রহ রাশি দান করে আসছেন। রোজ হাজার হাজার দর্শক দর্শন করে তৃপ্তি লাভ করেন একটি বোধি বৃক্ষ ও দেখতে পেয়েছি। বুদ্ধ গয়া যে বোধি বৃক্ষের মূলে তথাগত বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন,--তারই বংশধর এই বৃক্ষটি।

থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘ একক নিকায়ের একেক জন সঙ্ঘ-রাজ কর্তৃক পরিচালিত। সঙ্ঘ-রাজ অর্থ সঙ্ঘের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, গুণী শ্রেষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ভিক্ষু সঙ্ঘের অধিনায়করূপে রাজা বা রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত। বর্তমান মার্বেল টেম্পল বা সঙ্ঘ রামের যিনি অধ্যক্ষ তিনি সঙ্ঘ রাজ ও বটে তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহণ করেন এবং ১২ বৎসরের কিশোর বয়সে বিহারে আসেন। বিশ বৎসর পূর্ণ হলে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষার পূর্বেই বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষায় তিনি উচ্চতম ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। থাই ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় যে এ খ্যাতি ও সম্মানসূচক উচ্চতম ডিগ্রি লাভ মাত্র এ যাবৎ চারজন যুবক পুরস্কৃত হয়ে এসেছেন। তন্মধ্যে বর্তমান মার্বেল টেম্পলের অধ্যক্ষ অন্যতম। তাঁর উপ-সম্পদা কর্মরাজা চুললং কর্ণ পঞ্চম রায়ের অর্থ সাহায্যেই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়।

আরেকটি দর্শনীয় বস্তু হল--ফ্র কীর্তিবান বিলডিং শিক্ষা দানের ক্লাশ কামরার মধ্যে অন্যতম এই প্রাসাদটি। বর্তমানে বিহারধ্যক্ষের সৌজন্য ও ত্যাগে নির্মিত। মার্বেল টেম্পল থাইল্যাণ্ডে ভিক্ষুদের উচ্চাঙ্গের ধর্ম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। ইহার বর্তমান শিক্ষা কামীর সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। এতদ্ব্যতীত সঙ্ঘরাজ স্বয়ং নব দীক্ষিত ভিক্ষুগণকে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক নীতিগুলো শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

ফ্র বিহার সোমদেজ--নামে জাতীয় যাদুঘরের একটা বৃহৎ অংশ। এখানে বহুবিধ মনোরম বুদ্ধি মূর্তি ও বৌদ্ধ ধর্মের বিবিধ নিদর্শন রয়েছে। এই বিল্ডিং রাজা পঞ্চম রামের পাট রাণীর শ্রদ্ধা ও অর্থানুকূল্যে নির্মিত।

শোং পনুয়ট বিল্ডিং-নামে যে রাজ প্রাসাদ দেখতে পাওয়া গেল তা হচ্ছে রাজা চুললং কর্ণ প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব শিবির। তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তখন এই প্রাসাদে বাস করেছিলেন। বর্তমানে এই প্রাসাদ ভিক্ষুদের আবাস ও মাঝের প্রাঙ্গণটি ভোজনালয় রূপে ব্যবহৃত হয়।

বুয়ট নাক-অর্থাৎ প্রব্রজ্যা উৎসব। থাইল্যাণ্ডে প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে সংসারে ঢুকবার পূর্বে একবার ভিক্ষুত্ব বরণ করতে হয়। বিশ বৎসর বয়সের পূর্ণতায় প্রত্যেককে

ভিক্ষু হতেই হবে অন্ততঃ তিন মাসের জন্য,--ইহাই থাই জাতির বাধ্যতামূলক নীতি তিন মাস পরে তিনি ইচ্ছা করলে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে সংসারী সাজতে পারেন অথবা সারা জীবন ভিক্ষু ব্রতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। আর আমাদের দেশে সাত দিনের জন্য শ্রামন হওয়া তো দায়। বিবাহ ঠিক করে, দিন তারিখ নির্ধারিণ করে আসবে শ্রামন হতে একদিন কি এক রাত্রির জন্য। তাও আবারকত ঝামেলা কত ঝঞ্ঝাট। এতে না যায় গায়ের থেকে বাড়ীর গন্ধ না আছে উদ্দেশ্যের বিন্দু বিসর্গ লাভ। আর ভিক্ষোচিৎ সংস্কার লাভ কোথায়? থাইল্যাণ্ডে বড় বড় সরকারী চাকুরীর জন্য প্রার্থীকে নির্বাচন করার বেলায় জিজ্ঞাসা করা হয়--কত বৎসর ভিক্ষু ছিল? এতে যে যত বেশী ভিক্ষু জীবনে ব্যয়িত কাল দেখাতে পারে আর তার দাবীই অগ্রগণ্য। ধর্ম ক্ষেত্র ছাড়াও সাধারণ চাকুরী জীবন বা সংসার জীবনে অন্যান্য মাননীয় গুণের সঙ্গে সংযম সাধনাকে তারা এত বড় করে দেখে থাকেন। বস্তুত একটি লোকের যৌবনের প্রারম্ভেই যদি সংযম সাধনার অনুশীলন হয়--তার সংসার বা বে-সংসারে যেদিক যাবে যাক--তার সারাটি জীবনই সুন্দর সংযত ও সুখময় হয়ে থাকে।

সোৎ ধর্ম্ম হল-নামে যে ত্রিকোনাকার প্রকাণ্ড প্রাসাদ তাহা বর্তমান রাজা কুমিফোন অদুল দেজ এর পিতামহীর ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। প্রাসাদের উত্তরাংশে দেখা যায় রাজ কুমার সিদ্ধার্থ তাঁর স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করেছেন আর অশ্বটি ভাল করে তার জন্য অপেক্ষমান। প্রাসাদের দক্ষিণাংশে সিদ্ধার্থ অনোমা নদীর তীরে প্রব্রজিত হওয়ার জন্য তলোয়ার দ্বারা মাথায় কেশ গুচ্ছ কর্ত্তন করছেন। হলে ঢুকলেই সব এক নজরে চোখে পড়ে যায়। চোখে ধাঁ-ধাঁ মহা ত্রিভিনিষ্কমন রূপ বর্তমানে প্রাসাদটি ধর্মামাত্যদিগর মন্ত্রণালয় রূপে ব্যবহৃত হয়।

বো ভোর ভোং-বেইল টাওয়ার-নামে যে ঘন্টা টাংগান ইমারত তা আকারে ছোট হলেও অতিশয় উচ্চ। শব্দ চারদিকে সম্প্রসারণের পক্ষে উচ্চে ঘন্টা রক্ষা করাই যথোপযুক্ত কৌশল। ঘন্টা দেখেই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল। আকারে এত বড় যে শব্দ এত উচ্চ ও বিকট। মনে হয় ফ্রান্সের ইঞ্জিনের শব্দ হতেও বড়। কক্সবাজার লামার পাড়ার মন্দিরে রক্ষিত ঘন্টাগুলোর মধ্যে থাইল্যাণ্ডের ঘন্টার কিছু নমুনা আছে। আমাদের দেশের স্কুল কলেজে ঘণ্টার প্রয়োজন যতখানি থাইল্যাণ্ডে প্রত্যেক বিহারে সজ্ঘরামে ঘন্টার প্রয়োজন ততোধিক। সমবেত বন্দনায় ঘন্টা, আহারের সময় ঘণ্টা, শিক্ষা কামিদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা কালে ঘণ্টা, ভিক্ষুদের পিণ্ডপাত আচরণ বেলা হলে ঘণ্টা, সুদূর প্রসারী ঘণ্টা ধ্বনি ব্যতীত বিহার বা সজ্ঘরামে এত বড় আবাসিক জনসংখ্যায় নিত্য নৈমিত্তিক কর্মসম্পাদন অসম্ভব। তাই থাইল্যাণ্ডে প্রত্যেক সজ্ঘরামে জাঁকজমকভাবে ঘণ্টা প্রতিষ্ঠা একটি অপরিহার্য কর্তব্য।

ঘন্টাপেক্ষা মাইকের প্রয়োজন অধিকতর বন্দনাগারে, ভোজনালয়ে, উপোসনাগারে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা কালে মাইক ছাড়া কোন কাজ হয় না। আমরা

মাইকের ব্যবস্থা করি জনসভায়। থাইল্যাণ্ডে একটি বিহারের আবাসিক ভিক্ষু শ্রামনের সংখ্যাও আমাদের সভা সমিতির জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই মাইক ছাড়া উপায় কি?

মধ্যাহ্ন আহারের পর আমাদেরকে ছাত্রদের দ্বিতল হোটেলের একটা কামরায় নিয়ে গেল। ছোট হলেও কামরাটি বেশ মনোরম। তবে একখানি চৌকি। চৌকির উপর মাননীয় মহাথেরো রইলেন আর আমি নীচে রইলাম। মাইকের আওয়াজ কানে আসছে। মনে বড় উৎসুক্য জাগছে। নীচে সভা সমিতি কিছু হচ্ছে। থাই ভাষার মাইক। কিছু বোঝবার তো জো নেই। তথাপি উৎসাহের উদ্বেগ আর থামান গেল না। আমি নীচে এসে দেখি,--শতাধিক শিক্ষা কামী ভিক্ষু শ্রামনের একটা ক্লাশ চলছে। একজন মিলেটারী পোষাকে পরিহিত পুরুষ বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমি বিনীত ছাত্রের ন্যায় ক্লাশের এক প্রান্তে গিয়ে খালি একটা চেয়ারে বসে গেলাম। বক্তা আমার প্রতি চোখ পড়তেই মুচকি হেসে উঠলেন। ভাষা তো বুঝি না, তথাপি আমার অন্তরে অনির্বচনীয় আনন্দ। ক্লাশ চলেছিল ঘন্টার উপরে। দেবপ্রিয় বড়ুয়া তাঁর থাকা খাওয়ার স্থান নির্বাচন করার জন্য সুরিয়া হোটেলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আসছেন আমাদের হালচাল তদন্ত করার জন্য। তিনি মাননীয় মহাথেরের সঙ্গে আমাকে না পেয়ে বিহারের বহু জায়গায় খুঁজেছেন, কিন্তু পাননি। ভুল আমিই করেছি। মহাথের ঘুমিয়ে ছিলেন বলে আমি বলে যাইনি। বিদেশে সঙ্গ ত্যাগ করে কোথাও যেতে হলে সঙ্গীকে বলে যেতে হয়। বিহারটিও যে এত সমৃদ্ধ ও জনবহুল অনির্দিষ্ট ভাবে একজনকে খুঁজে বের করা সুকঠিন। মিঃ বড়ুয়া ক্লাশ রুমের পাশ কেটে যেতেই আমার চোখ পড়ল। অমনি আমি ক্লাশ থেকে বের হয়ে আসলাম। ক্লাশ শেষ হয়ে গেল। তিনি আমাদের সুখ সুবিধা দেখে শুনে চলে গেলেন। আমি একাকী সমগ্র মার্বেল টেম্পল ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ইহা বিরাটকায় মহান প্রতিষ্ঠান। বিস্তীর্ণ ঐ এলাকা জুড়ে এই সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও কত যে অট্টালিকা রয়েছে তার হিসাব নেই। পরম পূজ্য অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ, আচার্য্য, উপ-আচার্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন বিহার। একেকটি রাজ প্রাসাদ তুল্য। শিক্ষা কামিদের হোস্টেলগুলো সব দ্বিতল প্রাসাদ। প্রাসাদের সারির পর সারি। সব একই পদ্ধতিতে প্রস্তুত। রোল নম্বর ও কামরা নম্বর জানা না থাকলে কাউকেও খোজ করে বের করা নবাগতের পক্ষে কঠিন।

মাঝে মাঝে শ্রেণীবদ্ধ ফল বৃক্ষ। মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। অপরূপ শোভায় শোভিত পত্র বাহার বৃক্ষগুলো। সড়কগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সরলসিদা। চোখ ঠেকে না। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক নজরে পড়ে যায়। মাঝে মাঝে চার পার বাঁধানো পরিখা। পরিখায় বিচরণ শীল মৎস্য কচ্ছপের অভয় কেলি। ধর্মপ্রাণ লোকেরা পরিখায় এসব প্রাণীদের ছেড়ে দিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে সবুজ

শ্যামল তৃণ দুর্বাচ্ছাদিত মনোরম ময়দান। ময়দানে কিশোর-কিশোরীদের যুবক যুবতীদের খেলা করতে দেখলাম এই মার্বেল টেম্পল দর্শন করে আমার মনে প্রাচীন স্মৃতি জেগে উঠল। বৌদ্ধ যুগে আমাদের পাক-ভারতের প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা, জগদ্দল, কনকস্তুপ পণ্ডিত বিহার প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেরূপ ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে দেশ ও জাতির সার্বভৌম উন্নতি সাধন করেছিল, থাইল্যাণ্ডের বর্তমান ওয়াট বা সঙ্ঘারাম কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেরূপ দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি সাধক প্রতিষ্ঠান। নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ নামে নির্জীব আকারগুলো দেখেছি, এদের সজীবরূপটি আমাদের কল্পনার বস্তু মাত্র। কিন্তু এ যাত্রায় থাইল্যাণ্ড ভ্রমণ করতে এসে নালন্দা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জীবিতাকার দর্শন করলাম। আর দেখলাম মনয়ামতির শালবন বিহারের সক্রিয় স্বরূপ। প্রায় বিহারেই মধ্যস্তুপ, চতুর্দিকে ভিক্ষুদের বাস গৃহ আর সম্মুখে বারেন্দা তাতে শ্রেণীবদ্ধ প্রদর্শনী থাইল্যাণ্ডের আদর্শে কর্ম প্রবনতার উৎসাহ উদ্যমে প্রাচীন পাক-ভারতেই অনুপ্রাণ না বহন করে চলছে। নালন্দা, তক্ষশীলার ন্যায় জগত বক্ষে তাঁরা যে অভিবন ইতিহাস রচনা করেছেন, তাও নয়, কিছু করেছেন, সব প্রাচীন পাক-ভারতেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে করেছেন।

বৌদ্ধ যুগে পাক-ভারতের জনগণের ধর্মবোধ, কর্ম প্রেরণা ও ত্যাগ চেতনার খবর আমরা পেয়েছি বই পুস্তকে। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ আমাদের সমাজ কিংবা জীবনের কর্মসূচীতে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। শুধু আস্ফালন নামে আত্ম চেতনার প্রাণীহীনমরা পুতুলটি নিয়েই আজীবন কৌতুক করে এসেছি। এ যাত্রায় থাইল্যাণ্ডের জাতীয় জীবন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি। তাঁদের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে ধর্মবোধ। আদর্শ নিষ্ঠা প্রতোদ দণ্ডের ন্যায় একদম খাড়াভাবে উত্তোলিত হয়ে আছে। সমগ্র এশিয়া খণ্ডে তাঁরাই থাই বা স্বাধীন।

থাইল্যাণ্ড বলতে স্বাধীন রাষ্ট্র। এশিয়া খণ্ডে থাইল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্র নেই--যে রাষ্ট্র পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতিগুলোর প্রকৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠাই সব কিছুর মূল কারণ। প্রকৃত ধর্ম প্রবনতা ও মানবত্ববোধ তাঁদেরকে চিরকাল স্বাধীন করে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পূর্বে সূর্য্য অস্তমিত হল সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। সন্ধ্যার পরে এই সঙ্ঘারামের উপ-আচার্য্যের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আমরা যথাসময় উপ-আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। প্রথম দর্শনেই মনে হল তিনি যেন একজন দেব পুত্র। অনিন্দ্য সুন্দর চেহারা তার। ধর্ম ও জ্ঞানের প্রভা তাঁর চোখে মুখে লেগে আছে। কমল কান্তি জ্যোর্তিময়ী দেহ। বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্রে তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে মুস্কিলে পড়লাম। তিনি থাই ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না। পালি বললে তিনিকিছুটা বোঝেন কিন্তু নিজে বলতে পারেন না।

যা হোক একজন নব দীক্ষিত ইংরেজী শিক্ষিত ভিক্ষুর মারফতে কিছুটা ভাব বিনিময় হল। আমরা যেই প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছি তারই পার্শ্বে অবস্থানকারী একজন বয়স্ক ভিক্ষুকে ডেকে এনে তিনি আমাদের সুখ সুবিধা তত্বাবধানের জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আমরা যখন ফিরে আসি, তখন রাত্রি দশটা। কিছুক্ষণ পরে আমরা 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত্তা' বলে শয্যা গ্রহণকরলাম।

দুইজন মহাস্থবিরের পক্ষে কামরাটি একটু ছোট হলেও আমার পক্ষেকোন অসুবিধা হয়নি। রাত্রিতে বেমালুম ঘুম হল। এরূপ সুনিন্দ্রা এ যাত্রায় বিদেশে বের হওয়া অবধি হয়নি।

সকালে প্রাতঃরাশ গ্রহণকালে একইজন যুবক ভিক্ষু তাঁর কামরায় আমরা ছিলাম। তিনি এসে খবর দিলেন যে অদ্য (রবিবার) মার্বেল টেম্পল থেকে দুইটি বাস দুইটার সময় ভিক্ষু শ্রামন নিয়ে নগর পত্তন যাবে। আপনারা ইচ্ছা করলে যেতে পারেন। এই খবরে আমার আর আনন্দ ধরে না। নিজেই নগর পত্তন যাওয়ার ভাবনায় আছি। সুযোগ খুঁজছি। এযাবৎ কোন সন্ধান করতে পারিনি। এখন সুযোগ যখন নিজেই আগমনকরল-তাকে স্বাগতম জানিয়ে এবং আপন সুকৃতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

দুপুর যত ঘনিয়ে আসছে আমার উৎসাহ তত বেড়ে চলছে। মধ্যাহ্ন ভোজন-কৃত্য সারা হয়ে গেল। আমি মনে মনে শুধু এই ভাবনায় অপেক্ষা করছি 'কোন্ সময় রওনা হবো' হঠাৎ ডাক পড়ল--'বাস প্রস্তুত' আপনারা তৈরী হউন।

মাননীয় মহাথের নগর পত্তন যাবেন না। তাঁর শরীর বিশেষ ভাল ছিল না। বিশেষতঃ তিনি ইহা পূর্বে দেখেছেন। আমি চীবর পরিহিত হয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়লাম। রাস্তায় গিয়ে দেখি দুইটি প্রকাণ্ড প্রবাণ্ড বাস। বাসে তিল ধারণের ফাঁক নেই। লালে লাল চীবর পরিহিত সব সাধু সন্যাসীর দল। সংখ্যায় দুই শতাধিক। আমার জন্য সিট নেই। একজন স্থবির নাম তার জ্যোতিমন্ত তিনি আমাকে ডেকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে দিলেন। আয়ুস্মান জ্যোতিমন্ত যে সিটে ছিলেন--তার থেকে আমি বেশী দূরে নহি, পাশাপাশি। জ্যোতিমন্ত দিব্যি চেহারা ও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী তিনি শাস্ত্রজ্ঞা, পণ্ডিত একটা সেকশানের আচার্য্য। পালিতে কথা বলতে পারেন অনর্গল। বয়সে ও ভিক্ষু বর্ষা গণনায় আমার ছোট। তার সাক্ষাৎ এতদিন অন্তরের গুমরিত ভাব-ব্যক্ত করতে লাগলাম। এতদিন আর প্রাণ খোলা ভাব ভাষায় কোন বিদেশীর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।

আমাদের বাসের ইঞ্জিনে কিছুটা বিভ্রাট থাকায় ইহা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লেগে গেল। অপর বাসটি নির্দিষ্ট সময় ছেড়ে গেল। আমাদের বাস যখন ঠিক হল তখন বাস তার বিরাট কুক্ষিতে সন্যাসীর দলকে নিয়ে দানব গতিতে ছুটল আমি

তথাগতের পুণ্য স্মৃতির সহিত সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা বলে দৃষ্টি প্রসারণ করলাম। রাজপথের দুধারে দৃষ্টি যত দূর যায় কত বিহার, কত চৈত্য, কত স্তূপ চোখে পড়ল তার ইয়ত্তা নেই। আয়ুস্মান জ্যোতিমন্তু অফুরন্ত ভাবে অনর্গল কথা বলে চলেছেন। মাঝে মাঝে আজে বাজে কথাও কম হচ্ছে না। হাস্য-রহস্যও চলল নির্মল প্রেম-প্রীতির সহিত।

নগর পত্তন--ব্যাঙ্কক মহানগরী থেকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ৭৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। প্রাচীন ভারতের সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচার কল্পে যে ভিক্ষু সঙ্ঘ সুবর্ণ ভূমিতে পাঠিয়ে ছিলেন,--যেই সঙ্ঘের নায়ক ছিলেন সোন ও উত্তর নামক দু'জন প্রাজ্ঞ স্থবির। তাঁদের সঙ্গে আরো অন্তত ৩/৪ জন স্থবির যারা অনুগামী ছিলেন তাঁদের নাম পিটক ও অনুপিটকের কোথাও পাওয়া যায়নি। সোন ও উত্তর স্থবিরগণ শ্যাম দেশের যে স্থানে বা নগরে উপবিষ্ট হয়ে তথাকার জনগণকে সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করে ছিলেন--তার নাম হচ্ছে নগর পত্তন। শ্যাম দেশবাসী সোন ও উত্তর স্থবিরের নামও তাঁদের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ঘটনাকে চির স্মরণীয় করার উদ্দেশ্য--এই স্থানে যে স্তূপ প্রতিষ্ঠা করলেন তা জগৎ বিখ্যাত। এই স্তূপের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে একমাত্র রেঙ্গুনের সোয়েডাগণ প্যাগোডা। যার দু'টাই দেখছেন তারা বলেন--সোয়ে ডাগন প্যাগোডা থেকে আকারে নগর পত্তন প্যাগোডা বৃহত্তর। তবে সোয়াডাগন প্যাগোডা যেরূপ কারুকার্য্য খচিত ও বিভূষিত নগর পত্তন প্যাগোডা সেরূপ নহে।

বাস অনেক দূরে থাকতেই নগর পত্তন প্যাগোডা চোখে পড়ে যায়। বাস যত সামনে এগুচ্ছে প্যাগোডার আকার তত বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। প্যাগোডার প্রাঙ্গণে আসার পর আমরা বাস থেকে অবতরণ করলাম। প্যাগোডার বিশাল দেহে চোখ পড়তেই আমি হতবাক হয়ে যাই। দু'শত ভিক্ষু শ্রামনের সহিত প্যাগোডার দিকে যত অগ্রসর হচ্ছি আমার দেহ মন তত রোমাঞ্চকর প্রীতিতে ভরে উঠতে লাগল। সমীপবর্ত্তী হতেই একজন ভিক্ষু আমাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন এবং চিত্র বিচিত্র অতি মনোহর কাজের উপর ফুল্লিত চাদর পাতা আসনে বসালেন। পাশে বিজলী পাখা বাতাস করতে লাগল। গরম পড়েছিল খুব বেশী তৃষ্ণাও পেয়েছিল। বরফ ঢাকা অরেঞ্জ পানীয় পান করতে দিলেন। পান করলাম ইচ্ছামত এরূপ আবাসিক ভিক্ষু যেভাবে তাদের আপ্যায়ন করলেন তাতে আমি মুগ্ধ হলাম।

অতঃপর দু'শত ভিক্ষু শ্রামনের সহিত এক বিরাট পূজা মণ্ডপে সম্মিলিত হলাম। এই মণ্ডপে বসেই পূজারী লোকেরা তথাগতের উদ্দেশ্যে পূজা করে থাকেন। আমরা প্রথমতঃ সমবেত বন্দনা কার্য সেরে ধূপ ধুন পুষ্প বাতি প্রভৃতি পূজোপকরণ হস্তে নগ্নপদে প্যাগোডা প্রদক্ষিণ করতে গেলাম। আয়ুস্মান জ্যোতিঃমন্ত নির্দেশ দিলেন তিনবার প্যাগোডা প্রদক্ষিণ করতে হবে। কিন্তু উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে

বিশালকায় প্যাগোডার চারদিক একবার ঘুরে এসেই সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ছোট ছোট শ্রামনের দল সংখ্যায় ছিল ভারী। তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে জ্যোতিঃ মন্ত আর অগ্রসর হলেন না। প্রদক্ষিণ বন্ধ করে দিলেন।

পুনরায় এসে পূজা মণ্ডপের সুবাসিত ধুপ ধুনা, সুগোল সুঠাম উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের মোমবাতি মনোজ্ঞ পুষ্পে ও সুগন্ধি দ্রব্যে তথাগতের উদ্দেশ্যে অর্ঘ নিবেদন করলাম। তাঁর অনন্ত গুণসাগরকে স্মৃতি পটে বারবার স্মরণ করলাম প্রার্থনা করলাম আমি যেন এ পূজার প্রভাবে জীবন দুঃখের অবসান ঘটাতে পারি এবং তাঁর অধিগত শান্তি প্রাপ্ত হই।

পূজান্তে আয়ুস্মান জ্যোতিঃমন্ত সহ আমি প্যাগোডার মূল প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে এসে বহিঃপ্রাঙ্গণ ধরে বেড়াতে শুরু করি। বাক্যালাপের সহিত কিছুক্ষণ চলার পর আমরা প্রধান তোরণে উপনীত হলাম। আমরা প্রথমে যে দ্বার দিয়ে ঢুকেছিলাম--তা ছিল প্রাইভেট দ্বার। প্রধান তোরণ হল প্যাগোড়ার উত্তর দিকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চোখে পড়ল এক প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্তি অভয় মুদ্রায় দন্ডায়মান দ্বার দেশে পাতা দোকান থেকে আয়ুস্মাণ জ্যোতিমন্ত আমাকে প্যাগোডা ও প্যাগোড়া প্রাঙ্গণের অন্তবর্তী বিহারের ও প্রতিমার ৫ কপি ফটো কিনে দিলেন। চারদিক ঘুরে দেখলাম প্যাগোড়াকে কেন্দ্র করে আরো মঠ মন্দির, বিহার, চৈত্য, সীমা-গৃহ স্তুপ গড়ে উঠেছে।

সব দেখে শুনে আবার বাসে চাপলাম। তখন বেলা সাড়ে চারটা কি পাঁচটা। বাস ছুটল ত্বরিত বেগে। পথের আশপাশে যেসব মঠ মন্দির দেখলাম, দূর থেকেই ইহাদের সৌন্দর্য ও বিরাটত্ব বেশ অনুমিত হয়েছে। দু'ধারে এসব মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে আবার মার্বেল্ টেম্পলে পৌছলাম।

ষোল

অদ্য ২৮শে এপ্রিল সোমবার। সকাল বেলা অন্য কোনো প্রোগ্রাম নেই। আমি প্রাতঃরাশের পর লাইব্রেরী দেখতে গেলাম। লাইব্রেরীতে ঢুকে দেখি প্রকাণ্ড গৃহ-গ্যালারী, এক এক গ্যালারীতে হাজারহাজার গ্রন্থ। গ্রন্থের সংখ্যা যে কত তা জিজ্ঞেস করলে সম্ভবতঃ গ্রন্থগারিক ও হঠাৎ বলতে পারবেন না। অধিকাংশগ্রন্থ শ্যামী ভাষায় লিখিত। বুদ্ধ তথাগত ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় কোন দেশ কিংবা কালের ভাষা বিশেষকে মাধ্যম করে যায়নি যখন যে দেশে যে ভাষা প্রচলিত সে ভাষায়ই ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এই নীতির মর্মানুযায়ী থাইল্যাণ্ডে তাঁদের নিজস্ব মাতৃভাষায় ধর্ম বিষয় শিক্ষার কার্য বহুলভাবে সম্পাদিত হয়। তাঁরা মাতৃভাষায়ই শাস্ত্র শিক্ষার জোর দিয়া থাকেন। সে জন্যই তাঁদের মধ্যে ধর্ম ও শাস্ত্রগত প্রচুর পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও পালি বা সংস্কৃত ভাষার চর্চা বড় একটা নেই। বিদেশ থেকে তাঁদের দেশে ধর্ম বিনয় শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে গেলে প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে থাই ভাষা

শিখতে হয়। এরূপ শর্ত নিয়ে তাঁদের দেশের সরকার বিদেশী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান পূর্বক শিক্ষার সুযোগ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ একটি লোকে জীবনে তাঁর মাতৃভাষায় যে কোন বিষয় বস্তু যেরূপ সহসা ও সহজে শিখতে পারা যায় অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে সেরূপ শিক্ষা করা যায় না। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার পাঠ্য গ্রন্থ হলেই সকলের পক্ষে সর্বতোভাবে সুবিধা।

আমাদের মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া ও আয়ুস্মাণ বসুমিত্র এসে আমাকে ও মাননীয় মহাথেরকে মার্বেল টেম্পল থেকে রাজফাতিকারামে নিয়ে গেলেন। সেই সজ্ঘারামে আয়ুস্মাণ বসুমিত্র থাকেন। প্রিয় ভাজন বসুমিত্র আমাদের দুইজনকে দুই বিল্ডিং এর দোতালায় একক কামরায় স্থান করে দিলেন। আমরা আহারে বিহারে দিব্যি আরামে রইলাম। মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া সুরিয়া হোটেলেই রইলেন। সন্ধ্যা সাতটায় আমার ও মাননীয় মহাথেরের রাজফাতিকারামের অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা। মাননীয় মহাথের আয়ুস্মাণ বসুমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমি যেতে পারলাম না। আমার দুর্ভাগ্য। আমার মাথা-ব্যথা আমাকে অস্থির করে তুলল। বসুমিত্রের প্রদত্ত দু'তিনটি টেবলেট প্রয়োগে রাত্রি দশটায় মাথা-ব্যথার উপশম হয়।

ওয়াট রাজ ফাতিকারাম ব্যাঙ্কক মহানগরীর অন্তর্গত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। শিক্ষা কেন্দ্ররূপে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক। ইহা ব্যাঙ্কক সমকালীন চতুর্থ রাজার আমলে গঠিত এবং সতর একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই সজ্ঘারামের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ইহাদের বিভিন্ন বিভাগ। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলোঃ-

একটি বোট ইহাতে চার হাত উঁচু অষ্টধাতু নির্মিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট একটি মনোরম বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহার সম্মুখে বিরাটায়তন উপাসনালয় চত্বর। ইহাতে এক সঙ্গে পাঁচ শতাধিক ভিক্ষু শ্রামন সমবেত বন্দনায় অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম।

ধর্মীয় সভাগৃহ--এই সভাগৃহের এক পার্শ্বে তিনহাত উঁচু একটি অষ্ট ধাতু নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্টিত। প্রতিমার সম্মুখে ভিক্ষু সঙ্ঘের বসবার স্বতন্ত্র স্থান। তাছাড়া উপোসথ দিবসে শত শত উপাসক উপাসিকার সমাগম হয় এবং উপোসথ শীল গ্রহণ, ধর্ম শ্রবনাদি ধর্মানুষ্ঠান হয় এই সভাগৃহে। ইহাতে বিজলী পাখা, বিদ্যুৎ আলোক প্রভৃতি সুবিধাজনক ব্যবস্থা রয়েছে।

এই সজ্ঘারামে শ্বেত রংয়ে রঞ্জিত অন্ততঃ ২০০ হাত উচ্চ একটি বুদ্ধ মন্দির দেখলাম। ইহা দেখতে বড়ই নয়নাভিরাম। এরূপ নিরেট মন্দির বার্মিজ বিহারে, আসামের থাই ও ফাকিয়াল বস্তীর বিহারে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

থাই ভাষার মহাবিদ্যালয়--এই মহাবিদ্যালয়ে থাই সরকারের বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে থাই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার কাল হল দু'বৎসর। দু'বৎসর

থাই সরকার ব্যয়ভার বহন করেন। ইহার ক্লাশ বসে রাত্রে। শিক্ষকদের মধ্যে ভিক্ষু-গৃহী উভয়ই আছেন। পাকিস্তানে, সিংহল, বার্মা, চীন, জাপান প্রভৃতি বিদেশাগত বিদ্যার্থীগণ এসে এক্ষেত্রে ভিড় করে।

বড় আনন্দের বিষয় যে আমাদের পাকিস্তানী ভিক্ষু বসুমিত্র এই বিভাগের মধ্যম ক্লাশের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়াতে থাই সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। এই মহাবিদ্যালয়টি দেখতে বড় মনোরম। ইহা দ্বিতল প্রাসাদ।

পালি কলেজ বলতে যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাতে থাই ভাষার মাধ্যমে পালি ভাষা, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ধর্ম বিনয় শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যাপক ও অধ্যয়ন কারী ভিক্ষু শ্রামন। ইহাতে ছাত্র সংখ্যা ৩২১ জন। প্রাসাদটি দ্বিতল। দেখতে খুবই নয়নাভিরাম।

গ্রন্থাগার--থাই, পালি, ইংরেজী, ভিয়েতনামী, হিন্দি ও সংস্কৃতি ভাষার সর্বমোট ২৫০০ হাজার পুস্তক আছে। বিভিন্ন ভাষার ত্রিপিটক আছে। প্রাচীন তাল পত্রের পুঁথিও পরিদৃষ্ট হয়। ইহাও দ্বিতল প্রাসাদ।

এই বিহারের অন্তর্গত একটি সাধারণ জুনিয়ার হাই স্কুল আছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ১৪৬৩ জন।

অফিস গৃহ--ইহার নাম হচ্ছে নাকধামাসারা থাইল্যাণ্ডে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা এই নাকধামের অধীন হয়ে থাকে। এই প্রকাণ্ড শিক্ষা কেন্দ্রের যিনি সার্বিক নায়ক প্রসিদ্ধ মহাস্থবির তিনিই হচ্ছেন ধর্মীয় শিক্ষার মন্ত্রী।

বিদেশী ভিক্ষু ভবন--ইহা একটি মনোরম দ্বিতল প্রাসাদ। উপরে নীচে ১৪টি প্রকোষ্ঠ। আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত এই প্রাসাদ অপূর্ব আরামদায়ক। দেশী বিদেশী আগন্তুক ভিক্ষুগণ এই প্রাসাদে অবস্থান করেন। এখানে আমি সর্বাধিক সুখ সুবিধার সহিত তিন দিন অবস্থান করেছি।

এই মহান প্রতিষ্ঠানের একটি বিষয় লক্ষ্য করার যোগ্য যে এই সব দালান কোঠার ফাঁকে ফাঁকে ফুলের বাগান। অসংখ্য প্রকার ফুল প্রস্ফুটিত এসব বাগানে সারা থাইল্যাণ্ডে ক্ষুদ্র বৃহৎ খ্যাত অখ্যাত যত সঙ্ঘারাম আছে সবগুলো প্রায় একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ থাই শিল্প রুচি অনুসারে প্রস্তুত। কিন্তু এখানকার দালান কোঠায় থাই শিল্পের নিদর্শন বড় একটা নেই। প্রায়গুলোই আধুনিক রুচিসম্মত আধুনিক কোলাহল শূন্য। শান্ত সমাহিত ইহার পরিবেশ। জীবন গঠনের সর্ববিধ আনুকুল্যে প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান।

এতদ্ব্যতীত এই সঙ্ঘারামে একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়, একটি নবোপ সম্পন্ন ভিক্ষুদের ট্রেনিং সেন্টার, একটি রবি বাসরীয় শিশু বিদ্যালয় (Kinder garden) ও একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে।

সতের

অদ্য ২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার ভোর ৫টায় শয্যা ত্যাগ করলাম। অদ্য থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানী অবোধ্যা দর্শনে যাব। প্রাতরাশ গ্রহণের পরই আয়ুস্মাণ বসুমিত্র আমাকে নিয়ে চললেন, সুরিয়া হোটেলে--যেখানে আমাদের মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া থাকেন। মাননীয় মহাথের অযোধ্যা যাবেন না। যেহেতু একে তো গরমের দিন, যাতায়াত তেমন সুখকর নহে। কথা হল আমি ও দেবপ্রিয় বাবু যাব।

আমাদের গাড়ী কয়েক মিনিট পরেই সুরিয়া হোটেলের সামনে গিয়ে থামল। আমার সঙ্গে মিঃ বড়ুয়া দোতালা থেকে নেমে আসলেন। তিনি আগের থেকে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সহাস্য বদনে গাড়ীতে চেপে বসলে গাড়ী ত্বরিত বেগে ছুটল। কয়েক মিনিট পরে আমরা বাস স্টেশনে পৌছলাম। আয়ুস্মাণ বসুমিত্র আমাদেরকে মটর স্টেশনে পৌছে দিয়েই বন্ধুর দায়িত্ব এড়িয়ে ফিরে বিহারে চলে গেলেন। দেবপ্রিয় বাবু আমাদের দু'জনের জন্যই দু'খানি টিকেট কিনলেন আট বাথ্ করে ষোল বাথে। এখানে একটুখানি ভুল হয়ে গেল। আমার টিকেট না কিনলেও পারতেন। থাইল্যাণ্ডে সরকারী বাস বা ট্রেনে ভিক্ষুদের ভাড়া নেই। ভিক্ষুদের বসবার সিট আলাদা। যেমন আমাদের দেশে যান বাহনে মেয়েদের সিট স্বতন্ত্র। যানবাহনে আমাদের দেশে মেয়েদের আর থাইল্যাণ্ডের ভিক্ষুদের অধিকার সমতুল্য। তবে উদ্দেশ্যের কিছুটা পার্থক্য আছে।

এই মটর স্টেশনেও দেখলাম পুরুষ মেয়ে সমান তালে কাজ করে যায়। এসব কর্মক্ষেত্রে পুরুষ মেয়েদের ঘেঁষা ঘেঁষিতে ভিক্ষুদের পক্ষে অবাধ চলাফেরায় অসুবিধা হলেও সাধারণের পক্ষে তো আমোদই।

আমাদের বাস ছাড়তে ৯টা বেজে গেল। প্রায় ২ ঘন্টা চলার পর ১১ টায় আমরা অযোধ্যা নগরীতে পৌছলাম। এখন ভিক্ষুদের আহারের সময়। আহার না করে অন্য দিকে মন দেওয়া যায় না। কাজেই এক হোটেলে আহার কৃত্য সম্পন্ন করে নিলাম।

জনৈক টেক্সিগাড়ীর মালিক বিদেশী বলে বিশেষ করে একজন ভিক্ষু হিসাবে যথেষ্ট নম্রতা ভদ্রতা প্রদর্শন করল। তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত হল যে সে আমাদেরকে অযোধ্যা নগরীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান, মঠ মন্দির বা অন্য দর্শনীয় বস্তু দেখাবে পয়সা নিবে না। সে আগ্রহের সহিত নিজেই প্রস্তাব দিল ও স্বীকৃতি জানাল। প্রথম মনে করলাম--বৌদ্ধ রাষ্ট্র, আমি একজন বিদেশাগত মহাস্থবির। আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই তার অভিপ্রায় হতে পারে। আমার কিন্তু গাড়ী ওয়ালার শ্রদ্ধার উপর থেকে সন্দেহ ঘুচল না।

অযোধ্যা একটি প্রাচীন নগরী। ৪১৭ বৎসর যাবৎ থাইল্যাণ্ডের রাজধানী রূপে ব্যবহৃত হয়। এই অযোধ্যায় বিভিন্ন বংশের ৩৩জন রাজা রাজত্ব করেন। ১৭৬৭

খৃস্টাব্দে বার্মিজ আক্রমণকারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সমগ্র অযোধ্যা নগরী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই জন্য রাজা তফসিল বার্মিজ আক্রমণকারীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ছিলেন। রাজা তফসিল অযোধ্যা থেকে রাজধানী ধনবুড়ীতে স্থানান্তরিত করেন। তফসিলের পরে রাজা বুদ্ধ বোদ্‌ফ কর্তৃক রাজধানী ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হয়। রাজা বুদ্ধ যোদ্‌ফই বর্তমান চক্রি রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

অযোধ্যা গরীর চতুর্দিকে বহু প্রসিদ্ধ ভগ্নাবশেষ বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে রয়েছে। অযোধ্যার ধ্বংস প্রাপ্ত বহু দালান কোটা স্থাপত্য শিল্পের মনোরম নিদর্শন বিরাট, বিরাট প্যাগোডা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে অযোধ্যা চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে ইন্দোচীন উপদ্বীপে সমৃদ্ধ নগর সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল। এই সময়ে বিদেশীদের সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মে-বিয়া নদীর মোহনায় দুইটি রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার সহিত পর্তুগীজ উপনিবেশ ছিল। ওয়াট-পেলন চাঙ্গত্য এর দক্ষিণে ডাচ ও ইংলিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। রাজা নরইর বিশেষ অনুগ্রহ লাভে ফরাসীরা নগরের সমীপবর্ত্তী একটি উপনিবেশ স্থাপন এবং অযোধ্যা নগরের উত্তরাংশে একটি গির্জ্জা প্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করেছিলেন। ইহাও জানা যায় যে রাজা নরইর রাজত্ব কালে কানেষ্টনটিল কৌলকন নামে জনৈক গ্রীক বনিক অযোধ্যায় বাণিজ্য আরম্ভ করেছিলেন এবং তিনি রাজ্য সরকারের অধীনে উচ্চ কর্মচারী রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কৌনকলের বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যশীলতার অন্যান্য থাই কর্মচারীগণের তুলনায় রাজকীয় কার্য্যাবলী বড়ই উত্তমরূপে নির্বাহতি হয়েছিল, অবশেষে তিনি থাইল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ সরকারী পদবী 'চাও ফয় বিছয়েন্দ্র' লাভে সক্ষম হন। বর্তমান অযোধ্যা থাইল্যাণ্ডের ৭১টি প্রদেশের অন্যতম। ইহা মিউনিসিপালিটির শাসনাভুক্ত। মিউনিসিপালিটির এরিয়া ১৩০৮ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৫ বর্গ মাইল। ইহার লোকসংখ্যা ৫২৬৫৯৮ জন।

কতগুলো প্রধান ভগ্নারশেষ, গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বিহার এবং কৌতুহল জনক মনোরম স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিতহল। আমরা একে একে সব কয়টি দৃশ্যই দেখলাম।

১। গাড়ীর ড্রাইভার আমাদের সর্বপ্রথম নিয়ে গেল 'ওয়াট নহ প্রমন' নামে একটি প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন রাজ প্রাসাদের পাশেই অবস্থিত এখানে আনন্দদায়ক দৃশ্য হলো মন্দিরের ভিতরে প্রধান বুদ্ধ মূর্তিটি রাজ সজ্জায় সজ্জিত এর অপর একটি প্রধান মূর্তি সবুজ পাথরের নির্মিত ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট। ইহা দ্বারবতী রাজত্ব কালে প্রস্তুত।

২। প্রাচীন রাজ প্রাসাদ সমূহ বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন রাজা দ্বারা নির্মিত হয়। সর্ব প্রাচীন রাজ প্রাসাদটি রাজা রাম-তিবদি কর্তৃক নির্মিত হয় এবং ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা নগরী শ্যাম দেশের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৭ সনে বার্মা দেশীয়

আক্রমণের ফলে অযোধ্যার পতন হওয়ায় প্রায় সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শুধু অবশিষ্ট ছিল অট্টালিকাগুলোর ভিত্তি, বারেন্দা ও দেওয়ালগুলো।

৩। ওয়াট লুগ্য সুত--এই বিহারের মধ্যে সিংহ শয্যায় শায়িত বিরাটকায় বুদ্ধি মূর্তি। মূর্তিটি ২৮ মিটার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ প্রায় ৬২ হাত লম্বা। এখানে তখন বিহারের কোন নিদর্শন নেই। মূর্তিটি একটি রাজপথ ধারে মুক্ত প্রান্তরে শায়িত।

৪.। ওয়াট রাজ বুরণ এই বিহারটি ওয়াট মহা-ধতের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ইহা অযোধ্যার সপ্তম রাজা দ্বিতীয় বোরাম রাজাধিকরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে রাজার দুই ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে ছিল। ১৯৫৮ সনে এই বিহারের ভগ্নাবশেষ খনন আরম্ভ হলে এখানে বহু মূল্যবান ধাতু, পাথর, সুবর্ণ, মনিময় ও স্বর্ণময় বহু অলংকার, সুবর্ণময় বুদ্ধ মূর্তি ও বিভিন্ন আকারের হাজার বুদ্ধ মূর্তি আবিস্কৃত হয়। এই সব আবিস্কৃত দ্রব্য সমূহ ন্যাশন্যাল মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। দর্শকেরা যে কোন সময় দেখে নয়নের তৃপ্তি লাভ করতে পারেন।

৫। রাণী শ্রী সুরিলো থাইর স্মারক প্যগোডা--রাণী ১৫৬৩ সনে অযোধ্যার উত্তর শহরতলীতে বার্মিজ আক্রমণকালে রাজা মহা চক্রপাতের জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রাণীর মৃত্যুর পর রাজা মহা চক্রপাত রাণীর চিতাভস্ম রক্ষা করেছিলেন। রাণীর অসীম সাহসিকতা ও মহান ত্যাগের আদর্শ রক্ষা ও প্রচারকল্পের তাঁর চিতাভস্ম নিধন পূর্বক রাজা চিতার উপর একটি আকাশচুম্বী স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করে তাঁকে চিরস্মরণীয়া করে রেখেছেন।

৬। ওয়াট ফুকও থোং--অর্থাৎ সোনালী পাহাড়ের বিহার চৈত্য। ইহা অযোধ্যা নগরীর উত্তর বর্হিভাগে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৮০ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১৭৫ হাত। ১৫৬৯ সনে সর্বপ্রথম আক্রমণের বিজয় নিদর্শন স্বরূপ ব্রহ্মরাজ বুরোঙ্গ নোং বার্মিজ পদ্ধতিতে এই প্যগোডা নির্মাণ করেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা পরে সুমান অযোধ্যাকে পুনরুদ্ধার ও স্বাধীন করে এই প্যগোডা থাই পদ্ধতি অনুযায়ী সংস্কার করেন। ১৯৫৬ সনে বৌদ্ধ ধর্মের পঁচিশ শত সংবৎসরের পরিপূরণে অযোধ্যা যখন সংস্কৃত হচ্ছিল তখনসরকার ২৫০০ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় তিন সের ওজনের একটি সুবর্ণ গোলক প্যগোডার শীর্ষে স্থাপন করেন।

৭। হাতীর খেদা-হাতীর খেদাকে শ্যাম দেশীয় ভাষায় বলে--'পানিয়াদ'। প্রাচীন কালে বন্য হাতী ধরার উদ্দেশ্যে এইরূপ খেদা ব্যবহৃত হত। বড় বড় বৃক্ষ গুড়ি নির্মিত বৃক্ষবাগুর। ১৯৬২ সনে রাজা পুমিপুন তাঁর রাজকীয় অতিথিগণকে প্রদর্শনের জন্য এই খেদা প্রস্তুত করেন। ইহা দেখতে বড় সুন্দর। অন্তরে বেশ আনন্দের সঞ্চার হয়।

৮। অযোধ্যা শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনী কেন্দ্র--ইহা আকর্ষণীয় দৃশ্য। অযোধ্যার শিল্পকলা ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনী বিদেশীর পক্ষে ইহা একটি দর্শনীয় বিষয়ই বটে। প্রতি শনিবার ও রবিবার দিনের ৯-৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

৯। ওয়াট বুধ থাই সবন--এই প্যাগোডা অতিশয় উচ্চ। অনেকদূর থেকে ইহার চূড়া পথিক পর্যটকের চোখে পড়ে। ইহাকে সুবর্ণ প্যাগোডা বলাহয়। ইহা বার্মা দেশীয় লোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

১০। বিহার ফ্র মোঙ্কল বোপিত--ফ্র মোঙ্কল বোপিত নামে থাইল্যাণ্ডের মধ্যে বৃহত্তম ব্রোঞ্চ নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি। ইহা বহুবার ধ্বংস প্রাপ্ত ও বহুবার সংস্কৃত হয়। ১৯৫৬ সনে মূল আকৃতি সম্পন্ন করে পুনরায় নির্মিত হয়। পর্যটকদের লক্ষ্য করার বিষয় যে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাবলী। মাঝখানে ইহা কি করে নিখুঁত রইলো। এই বিহারের বহু দ্রব্য মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যায়।

১১। ওয়াট ফ্র শ্রী সনফেত্--এই বিহারটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহা রাজ প্রাসাদের এরিয়ার মধ্যে ব্যাঙ্ককের ইমারেন্ত বুদ্ধ মন্দিরের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। ইহার ভিতরে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে দণ্ডায়মান এক প্রতিমা প্রস্তুত হয় যাহা দৈর্ঘ্য ১৬ মিটার অর্থাৎ ৩৪ হাতের উপরে। প্রতিমার সমগ্র দেহ ২৬৩ কিলোগ্রাম অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক সাত মণ ওজনের স্বর্ণে আবৃত ছিল। ১৭৬৭ সনে বার্মিজ আক্রমণের সময় এই মূর্তিতে আগুন সংলগ্ন করে নিয়ে যায়। ইহা ব্যতীত এখানে অপর কোন দর্শনীয় বস্তু কিছুই নেই।

১২। ওয়াট ফ্র সহা ধত্--এই বিহারখানি প্রাচীন রাজ প্রাসাদের পূর্ব দিকে চর্তুদ্দশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত। ১৩৭৪ সনে রাজা প্রথম বোরোম রাজাধিরাজ কর্তৃক নির্মিত হয়। ৬০ বৎসর পূর্বে রাজা চুললং কর্ণের রাজত্ব কালে ইহার অগ্রভাগ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। ১৯৫৬ সনের খনন কার্য্য কালে সুবর্ণময় কাস্কেটের ভিতর বুদ্ধের ধাতু, বিভিন্ন আকারের স্বর্ণময় বুদ্ধ মূর্তি। আরো অনেক প্রকার স্বর্ণময় পদ্মারাগ, মনিময় ও স্ফটিক মিশ্রিত দ্রব্য সম্ভার পাওয়া গিয়াছে। এই দ্রব্যসমূহ এখন অযোধ্যা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

১৩। অযোধ্যা জাতীয় মিউজিয়াম--ইহা অযোধ্যা নগরীর বক্ষস্থলে প্রশাসনিক অফিস সমূহের পাশে প্রতিষ্টিত। দেখতে অতি মনোহর। অযোধ্যা বিরাট এলাকা ব্যাপী ভগ্নাবশেষ যত গুরুত্বপূর্ণ মহামূল্য দ্রব্য সম্ভার পাওয়া গেছে, তারই সমাবেশে এই অযোধ্যার জাতীয় মিউজিয়ামটি অতিশয় সমৃদ্ধ হয়েছে। তারা অতীতকে অর্থাৎ অতীতের গম্ভীর্য্য গৌরব, কীর্তি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে বন্দী করে রেখেছে এই চার দেওয়াল বিশিষ্ট যাদুঘরে। দর্শকের জন্য যাদুঘর সপ্তাহে বুধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিদেশী বিশিষ্ট দর্শকের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব নহে।

১৪। রাম পার্ক--ইহা অযোধ্যা মিউনিসিপ্যালিটির একটি সুসজ্জিত কুঞ্জবন। যেমন স্থাপত্য ভাস্কর্য বিদ্যার কারু কার্য তেমনি বনজ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সম্মিলন এই রাম পার্ক। ১১০ একর বিস্তীর্ণ ভূমি ভাগে এই নিকুঞ্জ উদ্যান। চার পাড় বাঁধানো। ক্ষুদ্র জলাশয়। তীরে অসংখ্য রকমের মনোজ্ঞ ফুল প্রস্ফুটিত। মাঝে মাঝে

ফল বৃক্ষ ফল ভারে নমিত। সারা পার্ক সবুজ শ্যামল ঘন তৃণাচ্ছাদিত। যেন বেশ রঙ্গহীন শীতল কারপেট পেতে রেখেছে। তাতে শ্রান্ত কলেবরে শোবার আকাংখা জাগে ইহা দর্শক মাত্রেরই চোখ তৃপ্ত হয় ও মন প্রমোহিত হয়।

এখানে একটি বিষয় অনুধাবন করে প্রয়োজন যে শ্যাম দেশ বৌদ্ধ রাষ্ট্র। এখানে বর্তমানে অন্য ধর্মের সন্নিধান বা অন্য ধর্মাবলম্বীর বাস নেই বললেই হয়। অথচ হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ রামায়নে উদ্ধৃত করা দশরথের রাজধানী অযোধ্যার এবং দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রজা বৎসল নরপতি রামচন্দ্রের নামের সাথে শ্যাম দেশের ও রাজার নামের সাথে হুবহু সামঞ্জস্য। রাজধানীর নাম অযোধ্যা। রাজার নাম রাম-১, রাম-২, রাম-৩, রাম-৪, রাম-৫ প্রভৃতি।

ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য হলো এই--এক সময় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রামায়ন মহাভারতের প্রভাব যুব বিস্তার লাভ করে ছিল। ইহাতে শ্যাম দেশীয় রাজবংশ এত আদর্শ নিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলে যে তাঁরা ইচ্ছা করলেন তাঁদের দেশে অযোধ্যার ন্যায় শান্তিময় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন। আদর্শ নৃপতি রাজা রামের প্রজা বৎসল্য, ন্যায়পরাণয়তা, আদর্শ নিষ্ঠার অনুকরণ করবেন এবং সতী সীতার পরম সতীত্বের অনুপ্রাণিত হবেন। তাই পরম আদর ও গৌরবের সহিত প্রাচীন ভারতীয় অযোধ্যা ও রাজা রামের নামানুসারে তাঁদের রাজধানী ও রাজন্য বর্গেরনামকরণ করা হয়েছিল।

এখানে আর একটু চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে-রামায়নে উদ্ধৃত প্রজা বৎসল নরপতি ধর্মাবতার রামচন্দ্র আর বৌদ্ধ জাতকে উদ্ধৃত পরম ধার্মিক আদর্শ রাজা বোধিসত্ত্ব রাম পণ্ডিত এই দু'জনের জীবন কাহিনী জীবনাদর্শ হুবহু এক। এমন কি এই দুজনের পিতা, ভ্রাতা ভৃগনী কিংবা পত্নী ও নিজের নামে ধামে সব এক। রাম পণ্ডিত ধার্মিক রাজা বোধিসত্ত্বরূপে বৌদ্ধ শাস্ত্রে যেমন স্বীকৃত, রামচন্দ্র ধার্মিক নরপতি ধর্মাবতাররূপে সনাতন শাস্ত্রে তেমনি স্বীকৃত। পণ্ডিতেরা বলেন প্রাচীন ভারতীয় রাজ বংশ ও গোত্র বিচারে রাম চন্দ্র ও বুদ্ধ একই বংশোদ্ভুত দুই বিভিন্ন কালের দুইজন মহাপুরুষ। রাম পণ্ডিত ও রামচন্দ্র উভয়ই বুদ্ধের কালের পূর্ববর্তী। কাজেই আমার মনে হয় একই পুরুষকে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন শাস্ত্র দুই ভিন্নরূপে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য ঐতিহাসিক প্রমান না থাকলে হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধানে অবস্থিত দুইজন পুরুষকে এক বলাও মহা সমস্যা। একটি বিষয় উল্লেখ করতে খেয়াল ছিল না। আমাদের ড্রাইভারের ভদ্রতা ও উদার্য্যের প্রতি যে আমার সন্দেহ ঘুচেনি তা পূর্বেও বলেছি। সে বলছে আমাদের থেকে ভাড়া নিবে না। কিন্তু 'ওয়াট রাজ বুরণ' দর্শনকরার সময় সে ভাল ইংরেজী জানে না বলে তথাকার তত্ত্বাবধায়কের মারফতে দেবপ্রিয় বাবুর কাছে অনুরোধ জানাল যে সে পয়সা তো নিবে না। তবে কিছু পেট্রোলের খরচ চায়। পেট্রোল এজেন্সীতে নিয়ে তার গাড়ীকে পেট্রোল খাবাল ৬০ বাথের। পাকিস্তানী মুদ্রায় ২৩০ টাকার মত। ভাড়া নিল না বটে; কিন্তু কৌশলে ভাড়ার থেকে বেশী নিল। তবে তার সৌজন্য প্রকাশ পেল এখানে যে সে অযোধ্যা নগরীর যত দৃশ্য

আছে তার কোনটা বাদ দিল না। দীর্ঘ চার ঘন্টা যাবৎ ঘুরে ঘুরে সব দেখাল। তার ইচ্ছা আমাদেরকে আরো ঘুরায়। দুপুর বেলা ভীষণ গরম। আমাদের দেহ মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ ফিরবার সময় হয়ে আসছে। কাজেই অন্তরে আরো দেখার উৎসাহ থাকলেও নিরস্ত হয়ে গেলাম।

আমরা এসব দৃশ্য দেখে পরমানন্দ লাভ করলাম। অবশেষে ড্রাইভার আমাদেরকে এক বাজারের মধ্যে দিয়ে সেই রাজপথে নিয়ে গেল, যেখানে থেকে আমরা ভ্রমণ আরম্ভ করেছিলাম। অতপর ড্রাইভারকে নিয়ে চা পান করলাম। তাকে অশেষ ধন্যবাদ, দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলে সেও আমাদেরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক ব্যাঙ্ককের বাসে উঠিয়ে দিল। বাস তীর বেগে অযোধ্যা থেকে ব্যাঙ্ককের দিকে ছুটল। আগেও বলেছি সরকারী যানবাহনে ভিক্ষুদের ভাড়া দিতে হয় না। তাই আমার থেকে ভাড়া নিল না। বড়ুয়া মহাশয়কে ভাড়া দিতে হল। বাসে সাধারণতঃ ভিক্ষুদের সিট থাকে গাড়ীর পিছনের দিকে। তাতে আমার আগে একজন ভিক্ষু বসা ছিলেন। বাসে উঠেই আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। পরস্পর প্রিয় দর্শন হল। তাঁর সঙ্গে বাচনিক সম্পর্ক পাড়তে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু কোন রকমেই পারা গেল না। কোন ভাষাকে মাধ্যম করতে পারলাম না। আমি যে বিদেশী একথা বুঝতে তার পক্ষে বিলম্ব হল না। তিনি আমাকে সিগারেট দান করতে চেয়েছেন। আমি তাঁর দান গ্রহণ করতে পারলাম না। তাঁর সঙ্গে এমনি একটা নির্বাক নিঃশব্দ আত্মীয়তা গড়ে উঠল। অর্ধ পথে নেমে যেতে তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে হস্ত মর্দন করলেন। মনে হল তিনি বুড়ো বয়সে প্রব্রজিত। প্রকৃত বয়সে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও ভিক্ষু বর্ষ গণনায় কনিষ্ঠ হবেন।

দুপুর বেলা প্রখর রোদে অযোধ্যার দৃশ্যগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে যা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম--তা প্রকাশ করার ভাষা নেই। নবপ্রাণ লাভ করলাম বাসে উঠে। দক্ষিণগামী বাস। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের নির্মল মুক্ত হওয়া। হাওয়ার সুশীতল তরঙ্গ। মাতে দেহ জুড়িয়ে যায়। মাঠের মাঝখানটায় আসতে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসল। কাল বর্ণ মেঘে সূর্য্য ঢাকা পড়ে তার তেজঃবীর্য্য ব্যাহত করে ফেলল। দেখতে দেখতে বিচ্ছিন্ন দমকা বায়ু আরম্ভ হয় এবং মুষলধরে বেশ এক ফসলা বৃষ্টি হয়ে যায়। তাতে মন প্রাণ একবারে স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

বাস পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করে যথাসময়ে ব্যাঙ্কক মটর স্টেশনে পৌঁছলে আমরা প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করে সুরিয়া হোটেলে পৌঁছলাম। এখানে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলার পরে আমি রাজফাতিকারামে এসে পৌঁছি।

রাত্রি ৮টার সময় আমি, মাননীয় মহাথের ও আয়ুষ্মান বসুমিত্র সজ্ঘরাজ বিহারে সজ্ঘরাজের সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়ে নীচে দ্বারদেশে অপেক্ষা করছি। মহামান্য রজ্ঘরাজ অবকাশ করে অনুমতি না দিলে আমরা সরাসরি উপরে উঠতে

পারি না। সঙ্ঘরাজের আবাস গৃহটি দ্বিতল কাষ্ঠময় প্রাসাদ। ইষৎ লাল বর্ণের কাঠ। বিদ্যুৎ আলোক কাঠের উপর পতিত হওয়ায় দর্পনের ন্যায় মানুষের ছবি প্রতিফলিত হয়। শুনেছি রাশিয়ায় আশি বৎসর বয়স্ক মেহগনি বৃক্ষের কাষ্ঠে মানুষের অবয়ব প্রতিফলিত হয়। এই কাঠগুলি সেই মেহগনি বৃক্ষের নাকি?

কিছুক্ষণ পরে মহামান্য সঙ্ঘরাজের সহ-বিহারী এসে আমাদেরকেই খবর দিলেন। আমরা ধীর-স্থির বিনীত ভাবে উপরে উঠে দেখি--সঙ্ঘরাজের আবাস বিহারখানি নানা দ্রব্য সম্ভারে সুসজ্জিত স্বর্গীয় বিমান তুল্য মনোরম। সমগ্র বিহার চিত্র বিচিত্র বিদ্যুতালোকে আলোকিত হয়ে জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রিমার আলোককে নিস্প্রভ ও ম্লান করে রেখেছে। আমরা তাকে ভক্তিভরে প্রনিপাত পূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করলাম এবং তাঁর প্রতি নিরীক্ষণ করতে লাগলাম, --অশীতিপর বৃদ্ধ, অটুট স্বাস্থ্য, দৈহিক বর্ণ বৈশিষ্ট্যে কনক কান্তি সদৃশ। আজীবন ব্রক্ষ্মচর্য্যের বিমল প্রভা তাঁর চোখে মুখে ভেসে আছে। তাঁর মুখ মন্ডল থেকে জ্ঞান প্রতিভা সারল্য, লাবন্য ও কমনীয়তার অনিন্দ্য শোভা উপচে পড়েছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখ পানে। এদিকে আমাদের সঙ্গে যে পাকিস্তানেবৌদ্ধ ধর্ম ও থাইল্যাণ্ডে ধর্মের সাধনা সম্পর্কে অনেক কথা বলাবলি হচ্ছে--তাতে আমার বড় একটা খেয়ালও নেই। তিনি পালি ভাষায় ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু পালিতে কথা বলতে পারেন না। তিনি দো ভাষীর সাহায্যে আমাকে বললেন,--'আমি পালিতে কথাবলতে না পারলেও কেউ বললে আমি বুঝি। তুমি বল আমার বুঝতে কোন অসুবিধা নেই।' আমরা পরম পুজ্য সঙ্ঘরাজকে পাকিস্তানে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি আনন্দের সহিত গ্রহণ করলেন এবং মন্তব্য করলেন যে, 'আমন্ত্রণটি সরকারী অনুমোদনে হলে উত্তম হবে। আমি আসতে পারব।'

থাই ও বাংলা ভাষায় দো ভাষীর কাজ করলেন--আয়ুস্মারণ বসুমিত্র। অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নীচে নেমে এলাম। ঘুরে ফিরে তাঁর বিহারখানি দর্শন করতে লাগলাম। বিহারের এক ধারে বেশ কতটুকু স্থান ব্যাপী শত শত কাঠের বাক্স সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করে রাখা। প্রত্যেক বাক্সের দেহে নাম ধাম লেখা রয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এই বাক্সগুলোর মধ্যে মৃত দেহ রক্ষিত। মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয় স্বজন মৃতদেহটি বাক্সবদ্ধ করে বিহারে এনে জমা রাখে। সময় সুযোগ বুঝে আত্মীয় স্বজনেরা পরে এই মৃত দেহ মহাসমারোহের সহিত দাহ করে। দাহ করার এমন কোন নির্দিষ্ট কাল কিংবা তিথি লগ্নের বাধ্যবাধকতা নেই। মহামান্য সঙ্ঘরাজের সহ-বিহারী সেবক ভিক্ষু আমাদের সঙ্গে সহ গমন করছেন। কোথায় কি আছে দেখাচ্ছেন। দেখতে আরো অগ্রসর হয়ে দেখি বিহার প্রাঙ্গণে মরা পোড়ার বিরাট ব্যবস্থা। একটি দেখলাম পাথুরে কয়লার চুলা, আর একটি বিদ্যুৎ চালিত চুলা (Crimatorieu)। সামর্থ্যানুযায়ী কেউ কয়লার চুলায়, কেউ বিজলী চুলায় মরা পোড়ায়। আমরা যে দিন দর্শন করলাম আমাদের উপস্থিতির পূর্ব পর্যন্ত

১৯জন মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি বোর্ডে মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা দেখলাম। তন্মধ্যে একজনের নাম ভারতীয় শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের নাম বলেই অনুমান করলাম। দু'তিনটি প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দু'তিনটি মৃত দেহ শায়িত করে রেখেছে। আর কত স্থবির মহাস্থবির জগতের অনিত্য দুঃখ অসাত্মমূলক মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বিহার প্রাঙ্গণ ও আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছেনঃ-

'অনিচ্ছা বত সঙ্খারা উপ্পাদ বয় ধম্মিনো,
উপ্পজ্জিত্বা নিরুবজ্ঝান্তি তেসং বূপসম-সুখো'
'সব্বে সত্তা মরন্তি চ মরিংসু চ মরিস্‌সরে
তথেবাহং মরিস্‌সামি নত্থি মে এত্থ সংসয়ো'তি'

অর্থাৎ জাগতিক সর্ব সংস্কার জড় চেতন সকল পদার্থ--অনিত্য, দুঃখ পূর্ণ ও নিঃসার। সকল পদার্থ উৎপত্তি ও ব্যয়শীল, ক্ষয়শীল, মরণশীল। উৎপত্তি ও নিরোধ ইহাই সকল পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম। এই ধর্মের উপশমই সুখ। এই ধর্মের অকাট্য বিধানানুযায়ী জগতের প্রাণী মাত্রই মরছে। মরেছিল ও মরবে। একদিন আমিও মরব। আমার প্রিয় অপ্রিয় সবাই মরবে। এই মর জগতে কেউ থাকবে না। জগতের এই অমোঘ বিধানে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অনিত্য দুঃখের এরূপ অমোঘ বাণীর মধুর আবৃত্তি শুনতে শুনতে মহামান্য সঙ্ঘরাজের সহ-বিহারী ভিক্ষু থেকে আমরা বিদায় নিলাম। বিহার থেকে বের হতেই চোখ পড়ল সম্মুখস্থ মাঠের উপর। বিস্তীর্ণ মাঠ। রং বেরঙের অসংখ্য যানবাহন শ্রেণীবদ্ধভাবে রক্ষিত। অন্তৌষ্টিক্রিয়া, ধর্মালোচনা ধর্ম শ্রবন ও সন্ধ্যা বন্দনায় যারা যোগ দিয়েছেন তাদেরই এ সব গাড়ী। গাড়ীর সংখ্যা দেখেই অবাক হলাম এবং ভাবলাম--কত বড় সরকারী অনুষ্ঠান হলে এক স্থানে এতগুলো গাড়ী সন্নিবেশিত হয়।

অতপর রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা রাজফাতিকারামে পৌঁছলাম। শরীর ও ক্লান্ত। শয্যা গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন কাজের কল্পনা নেই। কাজেই 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা' বলে শয্যা গ্রহণ করলাম।

আঠার

আজ ৩০শে এপ্রিল, বুধবার। ভোর ৫টায় শয্যা ত্যাগ করলাম। আজ সকাল প্রাতরাশের কাজ সেরে মাননীয় মহাথের ও মিঃ বড়ুয়া, প্রিয় ভাজন বসুমিত্র আর আমি এই চারজন পাকিস্তানী এম্বেসীতে গেলাম। তথায় দূতাবাসের কাউন্সিলার জনাব চৌধুরী অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। চা পানে আপ্যায়িত করলেন এবং থাইল্যাণ্ডের অনেক বিষয়ের শুভ দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেন যে থাইল্যাণ্ড ও বৌদ্ধ দেশ বার্ম্মাও বৌদ্ধ দেশ। অথচ থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানী অযোধ্য ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণের ফলে বর্তমানে একটা বিরাট ধ্বংসস্তপে পরিণত হয়েছে।

তারপর চৌধুরী সাহেব নিজস্ব গাড়ীর ড্রাইভারকে নির্দ্দেশ দিলেন যেন ড্রাইভার আমাদেরকে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সজ্ঘের সদর দপ্তরে (41 Phra Athit street, Bangkok, Thailand) পৌঁছিয়ে দেয়। তথায় আমরা যারা পাকিস্তানী প্রতিনিধি ছিলাম-আমাদের নিমন্ত্রণ। আয়ুষ্মান ভিক্ষু বসুমিত্র আমাদের সহ-গমন করলেন। নিমন্ত্রণ করেছেন, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সজ্ঘের প্রেসিডেন্ট রাজকুমারী পুন পিসমাই দিসকুল ও সাধারণ-সম্পাদক এইম্ সজ্ঘবাসী।

দূতাবাস থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা হলাম। গাড়ী আমাদেরকে নিয়ে ছুটল ঠিক ভাবেই, কিন্তু ড্রাইভার কখন ঠিক পথে, কখন ভুল পথে গাড়ী চালাতে শুরু করে কিছু সময় অনর্থক ব্যয় করল। যাহোক অবশেষে আমদেরকে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরে পৌছাল। আমাদেরকে অর্ভ্যথনা করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট রাজকুমারী পুন ও সেক্রেটারী সজ্ঘবাসী সহ আরো বহু গণ্যমাণ্য লোক পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করছিলেন।

আমরা উপস্থিত হলে অতীব ভক্তি ভরে অভ্যর্থনা করলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত ভোজনাসনে নিয়ে বসতে দিলেন।

আহার কৃত্য সমাপন করে ভুক্তানুমোদনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট রাজকুমারী পুন ভিক্ষুদিগকে একটি করে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সজ্ঘের প্রতীক চিহ্নিত মনোরম থলে দান করলেন। অতঃপর কিছু সময় তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলাম যে আমরা ছোট শ্রামন শ্রী নিরোধ পাল থাইল্যাণ্ড গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষা করবে, ভিক্ষুত্ব বরণ করবে-এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। দেশে গিয়ে তার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আলোচনা প্রসঙ্গে অবগত হয়ে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া যেই কয়দিন সুরিয়া হোটেলে ছিলেন, সেই কয়দিনের যত খরচ এসেছে-সবই বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিফ বহন করবেন। এটাই প্রেসিডেন্ট রাজকুমারী পুনের সিদ্ধান্ত। মিঃ বড়ুয়ার ধারণা হোটেলের খরচ আসবে প্রায় ৮/৯ শত বাথ অর্থাৎ আমাদের পাকিস্তানী মুদ্রায় দু'শ কি আড়াই শত টাকা। এতে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সজ্ঘের সভানেত্রী রাজকুমারী পুনের প্রকাশ পেয়েছে পাকিস্তানী প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সম্মান সম্বর্ধনা ও মিঃ বড়ুয়ার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি অসীম স্নেহ ও মমত্ববোধ। পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের অন্তরে যে কত দরদ কত সহানুভুতি ও গৌরব তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের আরো বিভিন্ন কাজে। ১৯৬৭ সনে রাজকুমারী পুন ও সাধারণ-সম্পাদক সংঘবাসী পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে থাই ভাষায় এক পুস্তক বের করেছেন- তার এক কপি করে আমাদের উপহার দিলেন। থাই ভাষা তো আমাদের অনধিগম্য। আমরা ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফটোগুলো দেখতে পেয়েছি মাত্র।

অতঃপর কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারী ও অন্যান্য ভক্ত দায়কগণ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম 'ওয়াট ফ্র জেতবনে' সাধারণতঃ এই সংঘরাম সংক্ষেপে 'ওয়াট পো' নামে সর্বজন পরিচিত। ইহা অতি প্রাচীন। ইহা অযোধ্যায় রাজধানী থাকাকালীন অর্থ্যাৎ বর্তমান রাজধানী ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। তখন ইহার নাম ছিল 'বোধ রাম'। রাজা প্রথম রামের রাজত্ব কালে ইহার পুনশ্চঃ সংস্কার করা হয় এবং ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। পরবর্তী কালে রাজা তৃতীয় রামের রাজত্বকালে এই সংঘারামের দেওয়াল গাত্রে রাজানুমোদিত চিকিৎসা শাস্ত্রে উদ্ধৃত রোগীর ব্যবস্থা পত্র উৎকীর্ণ হয়েছে। এখনও এগুলো পরিস্কার উজ্জ্বল। এই সময় এখানে প্রায় ৫৪ গজ দীর্ঘ ও ১৩ গজ প্রস্থ পরিনির্ব্বান শয্যায় শায়িত বুদ্ধের বিরাট বিগ্রহ দর্শকের দৃষ্টি গোচর আসে। ইহার গঠন কর্ম্ম সম্পাদিত হয় ইট পাটকেলে। তদুপরি আস্তর কর্ম করে স্বর্ণপত্র দ্বারা ইহার সর্বাঙ্গ আবৃত করা হয়। 'ওয়াট পের মণ্ডপ ও স্তুপগুলো অতিশয় মনোরম পদ্ধতিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক স্তুপ ও মন্ডপের গম্বুজগুলো চীনা মাটির বর্ত্তন টুকরায় খণ্ড খণ্ডকারে প্রস্তুত। প্রথমতঃ ওয়াট পো'র প্রবেশ পথে ঢুকলেই দর্শকের চোখে পড়ে উভয় পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত দুই দানব মূর্ত্তি। দেখলে অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়।

সময়ের অভাবে এই বিরাটায়তন সঙ্ঘারামের সকল অংশ দেখতে পারলাম না। তাড়াহুড়ার মাধ্যমে যত দুর সম্ভব দেখে শুনে আসলাম।

অতঃপর গেলাম স্বর্ণ মন্দির দর্শনে। স্বর্ণ-মন্দির অভ্র-ভেদী পর্বত তুল্য। ক্রমশঃহ্রস্বায়মান হয়ে অন্তরীক্ষের দিকে চলে গেছে। মাঝে মাঝে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। উপরে উঠার সিঁড়ি মন্দিরের চতুপার্শ্ব বেড় দিয়ে সর্পের ন্যায় পড়ে আছে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠলাম। মন্দিরটি বর্ণ সৌন্দর্যে সোনালী। ইহার সমগ্রাংশে সোনার মোটাপাত বসানো। মন্দিরের দৃশ্য দর্শন করে ইহার শিখর থেকে ব্যাঙ্কক মহানগরীর যে দৃশ্য এক নজরে দেখলাম তা আপেক্ষাকৃত মনোমুগ্ধকর। মন্দিরের এক কোণে অল্প কতটুকু অংশে একটা খুঁত লক্ষ্য করলাম। এই অংশ থেকে কে যেন স্বর্ণ উৎপাটন করে নিয়ে গেছে। জিজ্ঞাসিত হয়ে জারা বলল কতিপয় বৎসর পূর্বে অবৌদ্ধ কেহ এই স্থান থেকে স্বর্ণ চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি পুনঃ জিজ্ঞেস্ করলাম তোমরা কি জান যে চোর অবৌদ্ধ? তারা কেউ কোন জবাব দিলনা। মন্দিরের ক্ষত স্থানটি আর পূর্ণ করে মেরামত করা হয় নি। খুঁতই রয়ে গেল।

স্বর্ণ মন্দির দর্শন করে তারই পাশে এক বিরাট শ্মশান, তা দেখতে গেলাম এই শ্মশান কেওবাতলা, নিমতলা কিংবা আমাদের নদীর পাড়ের শ্মশান নহে। ইহাতে মরাপোড়ার পদ্ধতি বিদুৎ চালিত। মরা পোড়ার যে মান তা হচ্ছে রাজকীয় জাঁক-জমক ও মর্যাদা সম্পন্ন। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে বহু ভিক্ষু আমন্ত্রণ পূর্বক মন্ত্রপুত করার জন্য, আত্মীয় স্বজন সমবেত হওয়ার জন্য, কিংবা শোক সভা অনুষ্ঠানের

জন্য, মুক্ত হাওয়ায় বিশ্রামের জন্য শোক সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন-ইহা সেরূপ প্রতিষ্ঠান। তা ছাড়া ইহার সংলগ্নে মঠ মন্দির প্রভৃতি মিলে ইহা একটি বিরাট সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইহার সহিত তুলনীয় হতে পারে এক গভর্ণর হাউস। আরেক হতে পারে রাজার রাজ বাড়ী।

শ্মশানটি একটি বিরাটায়তন বিহার বিশেষ। বিহারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা। জাগতিক দুঃখ অনিত্যতায় বিলক্ষণ অনুপ্রাণনা, শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা। একদিকে সংসার কাম ক্রোধাদি বহু বিঘ্নে পরিপূর্ণ। তাতে আবদ্ধ হয়ে মানুষ জীবন দুঃখ ভোগ করে। তার থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে মুক্তির সন্ধানে সংসার ত্যাগ পূর্বক মানুষ বিহারবাসী হয়। বিহার যদি কায় বিবেক (জন সংসর্গ পত্যিাগ করে নির্জ্জন বাস) ও চিত্ত বিবেকের (কাম ক্রোধাদি দোষ মুক্ত চিন্তাশীলতা থেকে চিত্তের বিমুক্তি) আদর্শ বিরোধী হয় তবে বিহার লোক সমাজে প্রিয়তা ও গৌরব অর্জ্জন করতে পারেনা। তাতে জন কল্যাণ সাধিতও হয় না। সত্য কথা বলতে কি আজকাল অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিহারগুলো নিম্ন বহুল, উচ্ছৃঙ্খল, লোক কোলাহলপূর্ণ ও সামাজিক দলাদলির কেন্দ্র স্থল। আমরা গ্রাম্য আভ্যন্তরীণ নোংরামি বিহারে এনে ইহার পবিত্রতা নষ্ট করি, ইহার আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাহত করি। কাজেই সে ক্ষেত্রে হয় সার্ব্বজনীন অমঙ্গল সাধিত মহাপুণ্যের স্থলে মহাপাপ। তাই বলছি লোক সংসর্গ হেতু বিহারে সাধনার পথে অনেক অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। উচ্চাঙ্গ সাধনার সুযোগ অনেক সময় হয় না।

কিন্তু শ্মশানের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও শিক্ষা বিহারের ন্যায় হুবহু এক হলেও শ্মশানে অন্তরায়ের উপদ্রব নেই বল্লেও হয়। প্রথমতঃ শ্মশানে কায় বিবেক বা নির্জ্জন নিবাস বিহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ চিত্ত বিবেক বা দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও দোষমুক্ত মানসিকতা থেকে চিত্তকে মুক্ত রেখে বৈরাগ্যভাবে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাধন মার্গে অগ্রসর করার সম্ভাবনাই সমধিক। শ্মশানবাসীর জীবন আদর্শ-ভ্রষ্ট হতে বড় একটা দেখা যায় নি। স্থান ও মাহত্ম্যেই তাঁকে পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে। শ্মশানের শিক্ষা মানুষের জীবন যেরূপ প্রত্যক্ষ, পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পন্থা যেরূপ প্রকৃষ্ট সেরূপ স্থান বৈশিষ্ট্য জগতে বিরল। কায় বিবেক ও চিত্ত বিবেক এই দুই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম। এ দুয়ের উপর ভিত্তি করেই তথাগত ভিক্ষুদের প্রতি বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলছেন - 'জ্ঞান চাও তো ছাড়, জন-সংসর্গ ছাড় লোক কোলাহল, ধর নির্জ্জন নিবাস, চলে যাও শ্মশান মহাশান বন বনান্তর। ত্যাগ কর কুচিন্তা-দুশ্চিন্তা কাম ক্রোধাদি ক্লেশের আবর্ত্তনে পড়ে না। কামনা বাসনার তাড়নায় দৌড়ো না। সাধনা কর চিত্তৈকাগ্রতা প্রজ্ঞা ভাবনা। অবিরাম রত ছাড় সৎ চিন্তায়, সৎ কর্ম্মে, ও সৎ উদ্যমে।"

স্বর্ণ মন্দিরের অভুত পূর্ব দৃশ্য দেখতে চোখে পড়ল একটি মৃত দেহ সম্মুখে করে ভিক্ষুরা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।, আরেকটি মৃতদেহ ধীত করে নব বস্ত্র পরিধান

করাচ্ছেন। ইত্যবসরে দেব তুল্য এক বিরাট বপু সৌম্য মূর্ত্তি ভিক্ষু আমাদের সামনে এসে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করলেন এবং এক মনোরম আসনে বসালেন। তাঁর চীবরের রং আর গায়ের রং এক বরাবর। তাঁর আকৃতি লাবণ্যময় ও সপ্রতিভ। অটুট স্বাস্থ্য দেহ খানি থেকে জ্যোতিঃ নির্গত হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে প্রয়োগ করলেন - বিশুদ্ধ উচ্চারণের পালি ভাষা। আমরা যে বিদেশী তাঁর এতটুকু বুঝবার বাকী রইল না। থাইল্যাণ্ডে তাঁর মুখেই বিশুদ্ধ পালি উচ্চারণ শুনতে পেলাম। তাঁর পরিচয়ে জানতে পারলাম - তিনি স্থানীয় এক বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। আমাদের পাকিস্তানী ভিক্ষুদের কথা দূরেথাক থাইল্যাণ্ডেও এমনটি আর দেখিনি। তিনি যে ভিক্ষু কুল গৌরব, তিনি যে বংশ মর্যাদায় ও পাণ্ডিত্যে সম্ভ্রান্ত হওয়া একান্ত সম্ভব-তা তাঁর প্রথমতঃ বাহ্যিক লক্ষণই সব বুঝা গেছে।

হঠাৎ নজরে পড়ল বিরাট হল গৃহের এক কোণে সুসজ্জিত কতগুলো অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যে। আয়ুষ্মাণ বসুমিত্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এগুলি নাকি থাইল্যাণ্ডের পৌরানিক যুগের বাদ্য যন্ত্র। আকারে ঠিক যেন একটি চক্রের তিন চতুর্থাংশ। মস্তকে সংলগ্ন যুগল মহিষ শিংয়ের আকার। আকরে কিন্তু নেহাৎ ছোট নয়। মন্ত্রীগণ এগুলো সামনে করে বসে আছেন। এই বাদ্যযন্ত্রগুলো অযোধ্যা আমল থেকে কতেক আমোদ উৎসবের সুমধুর বাদ্য লহরীরূপে, বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পূজোপকরণ বাদিত্র রূপে ও মৃত্যু বাসরে শোক বাজনা রূপে ব্যবহৃত হয় আসছে। এখনও এগুলো থাইল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ-গানে বিশিষ্ট শিল্পরূপে ব্যবহৃত হয়।

কিছুক্ষণ পরেই তাদের বাদ্য আরম্ভ হল। বাজনার নিপুন সুর লহরী কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করা মাত্রই চোখের জল আপনা-আপনি নির্গত হয়ে আসল। হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে শুনে রইলাম-যাকে বলে নিদারুণ শোক বাজনা। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করার সময় ছিল না। এই শোক বাজনা শুনতে শুনতে আমরা শ্মশান থেকে বের হয়ে আসলাম।

ব্যাঙ্কক মহানগরী বক্ষে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি মহা মহিমাময় সঙ্ঘারাম যা অরুণ রাজ বরারাম নামে বিখ্যাত। প্রধান মন্দিরটির নাম হচ্ছে ফ্র প্রেং। ইহা ছাওয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহার সোজা সম্মুখে রয়েছে-মহান রাজ প্রাসাদ বর্তমান রাজবংশের রাজা দ্বিতীয় রাম ও রাজা তৃতীয় রামের রাজত্ব কালে রাজধানী যখন ধন বুড়ীতে ছিল - তখন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক গঠনের জীর্ণ সংস্কার ও উন্নয়ন কার্য্য চলে আসছে। রাজা তৃতীয় রামের রাজত্ব কালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান মন্দির ও অপ্রধান মন্দিরগুলোর অংশ বিশেষ পরিবর্তন করে ইহাদের গায় চীনা মাটির কারুকার্য্য খচিত বর্তমান ভাঙ্গা বসানো হয়েছে। বর্তমানে ভাঙ্গাগুলো দিবসে সূর্য্যের কিরণে ও রাত্রে চন্দ্রের কিরণে প্রতিফলিত হয়ে চকচক ঝকঝক করতে থাকে। দেড় শত হাত উঁচু প্রধান মন্দিরের চারিদিকে যখন দিনের বেলায় কেহ ঘুরতে ও মন্দির প্রদক্ষিণ করতে থাকেন, তখন মন্দির গাত্রে পতিত কিরণ বিকিরিত হয়ে নানা বর্ণের

নানা রঙে তাঁর চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যায়। এক ধারে রাজ বাড়ী, এক ধারে স্বচ্ছ সলিলা স্রোতা প্রবাহিকা বিরাট নদী, তারই মনোরম তীরে এই অরুণ রাজ বরারাম। সংঘারামটি স্বর্গের নন্দন-কানন এবং এই ফ্র প্রেং মন্দিরটি স্বর্গীয় বিলাম সদৃশ প্রতিমান হয়। ইহা দর্শকের বড় নয়নাভিরাম ও পরম আনন্দদায়ক।

সারা দিন ঘুরে ফিরে যখন আমরা রাজফাতিকারামে পৌঁছি তখন বেলা প্রায় শেষ। সেখানে গিয়ে দেখি-ভিক্ষুরা সবাই পরস্পর ক্ষৌর কর্ম্ম করছেন। থাইল্যাণ্ডে সব ভিক্ষুরা এক দিন চুল কাটেন। প্রতি মাসে সর্বশেষ তারিখ। আমারো চুল কাটা প্রয়োজন। আমি চীবরাদি খুলে ভিক্ষুরা যেখানে চুল কাটছেন-সেখানে গিয়ে বসে গেলাম। তাঁদের একজন আমাকে যত্নের সহিত মাথা কামিয়ে দিলেন। আমার মুখ কামাবার জন্য একটা দর্পনের প্রয়োজন মনে করলাম। পালি, ইংরেজী কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে কিছুতেই দর্পনের প্রয়োজন বোধ তাঁর অন্তরে পৌঁছাতে পারলাম না। অবশেষে একজন ইংরেজী শিক্ষিত যুবক হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হওয়ায় সমস্যাটির সমাধান ঘটল।

আমার মাথা মুণ্ডনের পর ভিক্ষু আমার চোখের ভ্রু কাটতে আসলে আমি নিষেধ করলাম। ব্যাপারটা তাঁদের নিকট আশ্চর্য্য বলে ঠেকল। তাঁরা সকলে হাসলেন। আমার নিষেধটা তাঁদের কাছে একান্ত নূতন। করণ থাইল্যান্ডে ভিক্ষুরা মাথা মুণ্ডনের পর ভ্রু ও কেটে ফেলেন, এ হচ্ছে-তাঁদের নিয়ম। তা ছাড়া আমাদের থেকে আরো কতেক পার্থক্য আছে। তাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। থাইল্যাণ্ডে ভিক্ষুরা চীবর পারুপন করেন ডাইন দিকে, আমাদের বিপরীত। আমরা করি বাম দিকে। আমাদের পরমারাধ্য আচার্য্য কডৈয়ানগর নিবাসী আর্য্যবংশ মহাস্থবির চীবর থাইল্যাণ্ডের অনুকরণে রুম করতেন। তদ্দর্শনে আমার মনে প্রশ্ন জাগত। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতাম না। আমার অন্তরে গুমরিত বহু কালের প্রশ্নের জবাব মিলল এবার থাইল্যাণ্ডে।

থাইল্যাণ্ডে বায়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুর বন্দনা কালে বায়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুও অঞ্জলি বদ্ধ হন। বিশিষ্ট দায়কের বন্দনা কালেও ভিক্ষুকে হাত জোড় করে থাকতে দেখেছি। কাজেই দেখা যায় কোন ক্ষেত্রেই হাত জোড় না করাটা নিয়ম নহে; নিয়ম হচ্ছে হাত জোড় করা। আমরা অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ঠ ভিক্ষু কিংবা সম্ভ্রান্ত লোকের বন্দনা কাজে যতটা মনোযোগ দেই, সাধারণের বন্দনা কালে ততটা মনোযোগ দেই না। এটা আমাদের খেয়াল। আমাদের দেশে ভিক্ষুরা বয়োকনিষ্ঠের বা দায়কের বন্দনার সময় হাত জোড় বা প্রতি বন্দনা করেন না। সাধারণ লোক সমাজে ভদ্র লোকদের পরস্পর প্রণাম বিনিময় করা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। থাইল্যাণ্ডে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর হাত জোড় করে থাকার অর্থ কি শুভেচ্ছা পোষণ-না প্রতি বন্দনা? না-তাঁদের খেয়াল?

এই নমস্কার পদ্ধতি জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন

প্রকার। অন্যের কথা বাদ দিলেও শুধু বৌদ্ধ প্রধান দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় - বিভিন্ন দেশের বিনয় নম্রতা ভক্তি বা শুভেচছা পোষণের পদ্ধতি নানাবিধ। কেউ ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে প্রণতি জানায়, কেউ দক্ষিণ হস্তোত্তোলন পূর্বক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, কেউ হাত জোড় করে, মস্তক নোয়ায়, কেউ শরীরকে অর্ধনমিত করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণতি করে। এ জন্যেই বলি নমস্কারের বহুল পার্থক্য তা ছাড়া নেপালের মধ্যে নাকি এক সম্প্রদায় বিশেষের লোক আছেন, তাঁদের পারস্পরিক নমস্কার সম্মান প্রদর্শন কিংবা শুভেচ্ছার পদ্ধতি হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে জিহবা প্রদর্শন।

রীতি পদ্ধতি যেখানে যেরূপ হোক না কেন, সকল রীতি পদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্তরের প্রীতি, বিনয়-বিনম্রতা, সম্মান ও শুভেচছা পোষণ করা। কোন রূপ মান অভিমানের আকাংখা আরোপ করা বা পোষণ করা বা বিনয় তথা শিষ্ঠাচার বিরোধী। ভিক্ষু জীবনের প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছে বিনয়। বিনয়ের অভাব হলে সকল গুণের অভাব দেখা দেয়। ভিক্ষু কেন, সকল শিক্ষা কামীর জীবনেই এই গুণটির সমান প্রয়োজন। অবিনয় ও আত্মাভিমান এই মতাবস্থাতেই জগতে যত সব গোলযোগের সৃষ্টি।

আগামীকল্য ১লা মে, বৃহস্পতিবার। বিকাল চারটায় ঢাকাগামী বিমান পি-আইএ। সবাই দেশে ফিরব। কিন্তু বড়ুয়া বাবু আমাকে বারবার বলতে লাগলেন আমি যেন অন্ততঃ আরো একটি মাস থাইল্যাণ্ডে থেকে যাই। থাইল্যাণ্ডের অন্যান্য বাকী দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে নেই। থাইল্যাণ্ড সম্পর্কে আরো কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করি। এদিকে পাসপোর্ট ভিসার কোন বিভ্রাট নেই। বিদেশ হলেও বিদেশের মত নয়। যেহেতু দেশের অনেক বন্ধু-বান্ধব এখানে রয়েছেন। অসুবিধার কোন কারণ নেই; কিন্তু যতসব গেলে আমার অন্তরেই, অন্তরে বরাবর দোটানাভাবে। বিদেশাগমনের প্রাক্কালে যেমন ছিল নানা সমস্যার বাধা বিঘ্নতা এখন বিদেশ থেকে ফিরবার কালেও ঐ একই জাতীয় সমস্যার উদ্ভব।

এখন ভাবনা হচ্ছে-যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছে, এগুলোর কর্তৃপক্ষের সাথে আসবার বেলায় কোনরূপ বোঝাপড়া করে আসতে পারিনি। হঠাৎ রওনা হয়ে এসেছি। বিশেষকরে প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী একটি বৎসরের সংরক্ষণ ও পরিচালনা এ মামটির উপর নির্ভর। আর্থিক সংবৎসরের সর্ব্ব শেষ মাস বলে ইহার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সমধিক। মানুষের অসুখ-বিসুখ কত কিছু আছে। যদি কোন কারণে বিলম্ব হয়। যদি কোন বিভ্রাট লেগে বসে; তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর আর কোন উপায় থাকবেনা। এরূপে দায়িত্ব খেলাপের আশংকায় আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। না হয়, আরো কিছু দিন এখানে সেখানে ভ্রমণ করে যাব, অনেক কিছু নূতন দেখতে পাব, আনন্দোল্লাস উপভোগ করব। কিন্তু দেশে গিয়ে যদি দায়িত্বহীনতার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়,তবেএ ভ্রমণের স্বার্থকাতা কি? এতক্ষণ আশা নিরাশার

দোলনায় দুলতে থাকলেও এখন কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। যে বিদেশে আর বিলম্ব করা যাবে না শুধু তিন সপ্তাহের বিদেশ ভ্রমণ। এই স্বল্প পরিসর ভ্রমণে আবার বিস্তর তাড়াহুড়া। এভাবে না হয় কোন দেশের তত্ত্ব তথ্যের প্রকৃত সন্ধান, না পায় মনের পুরোপুরি আমোদ-আহ্লাদ। তথাপি আমার ন্যায় সন্বিত শূণ্য ভিক্ষুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এতে আমি নিজেকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করছি। বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘ একটি মহা সমুদ্র তুল্য। জগতের যত সব খাল-বিল, নদ-নদী, সরিৎ সাগর যেরূপ আপন আপন অস্তিত্ব বিলোপ করে মহা সমুদ্রে একত্রে সঙ্গমে বিলীন হয়ে যায়, তদ্রুপ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বর্ণের লোক, ধর্মের ধারক বাহক, জগদ্বিখ্যাত স্থবির, মহাস্থবির, মহামান্য নানা সঙ্ঘ প্রভৃতি পবিত্র জীবন সাধু একই যোগবেদীতে একত্র সন্নিবেশিত হয়ে যে মহা মিলনোৎসব সৃষ্টি করলেন, বিশ্বের জীবন ধারা শত সহস্র দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে যে একই শরণাগতির মহা সমুদ্রে একই ধর্মরস যুক্ত হয়ে গেলেন, তাতে যে আন্তর্জাতিক মানব মহা সমুদ্রে মহা সঙ্গম সাধিত হল-তদ্দর্শনেই আমার জীবন ধন্য। মহা সিন্ধুর ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে পবিত্র সঙ্ঘের সুমধুর সাহচর্য্য লাভে আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান বোধ করছি। কত মহৎ লোকের সাথে মিলেছি, তাঁদের প্রীতি-সম্ভাষণ লাভ করেছি, তাঁদের মহান উদারতার সুখ স্পর্শে গিয়ে মহৎ চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। আন্তর্জতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু ব্যক্তির বিরাট ব্যক্তিত্বের ও মহত্বের খবর পেয়েছি। তাতেও আমি ধন্য। কিন্তু আমার যোগ্যতার অভাবে আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইনি। কারণ মানুষকে বুঝতে হলে, জানতে হলে তার মানসিকতাকে জানতে হয়। তাতে আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। মানুষের মানসিকতা বা মন যে সবচেয়ে দুর্বোধ্য দুর্জ্ঞেয়। এক পণ্ডিতের গম্ভীরতাকে জানতে হলে আরেক পণ্ডিতের গম্ভীরতার প্রয়োজন আমার সেই যোগ্যতা কোথায়? কাজেই চাক্ষুষিক দর্শন ও সাধারণ জানাও আমার পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়।

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যাণ্ডের কত প্রসিদ্ধ দৃশ্য দর্শন করলাম। প্রাসাদে প্রাসাদে ভ্রমণ করলাম, কত পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে মহা মহিমাময়ের প্রতিমার সামনে জীবনাহুতি নিবেদন করলাম। আবার যেখানে গিয়েছি সেখানেই পরম আন্তরিকতার সহিত সম্বর্ধিত হয়েছি এবং অকৃত্রিম সেবা যত্নে ও অপূর্ব সাহচর্য্যে আপ্যায়িত হয়েছি। এজন্য হাজারো বার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘের সম্মেলনে বিদেশ থেকে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন- তাঁদের প্রত্যেকেই আপন আপন দেশের সরকার কর্তৃক প্রেরিত, সাহায্য প্রাপ্ত। তাঁরা সরকার প্রেরিত প্রতিনিধি। আমরাও আমাদের সরকার প্রেরিত প্রতিনিধি। এখানে যা কিছু লাভ সৎকার, মান-সম্মান সব কিছুর মূল্যে রয়েছে সরকারী কৃপা। এখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কোন বালাই নেই। নচেৎ আমার ন্যায় বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন ব্যক্তির পক্ষে কি এত বড় সুযোগ লাভ সম্ভব হত? আর এখন, একবার এখান থেকে দেশে পৌঁছলে আমার ন্যায় অর্থহীন ধনাঢ্য দায়ক-হীন ভিক্ষুর পক্ষে কি পুনরায় বিদেশে আগমন সম্ভব হবে? সেই সৌভাগ্য কি আর লাভ করব? তজ্জন্য আমাদের সরকারের

প্রতি আমার অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আগামীকল্য শ্যাম দেশ ত্যাগ করব। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধানে এসেও যদি কোন দেশে মৌলিক বৌদ্ধ ধর্ম অবিকৃতরূপে জীবিত থাকেতবে সে দেশ হচ্ছে - এ শ্যাম দেশ। শ্যামের শ্যামল সুন্দর বক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সজীব মূর্ত্তিখানি চির সমুজ্জল হয়ে আছে। অবিরাম প্রবাহিত হচ্ছে মানুষের জীবনধারায় বৌদ্ধ ধর্মের অকৃত্রিম নৈতিক ধারা, যে ধারা এককালে পাক ভারতের পূণ্যতীর্থ হতে উৎসারিত হয়েছিল।

কবি রবিন্দ্রনাথ যখন শ্যাম দেশ পরিভ্রমণে এসেছিলেন, তখন বুদ্ধের জন্ম ভূমি ভারতবর্ষে যে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত প্রায়, বৌদ্ধ ধর্ম যে ভগ্ন-স্তূপে শিলা-পাথরে, ইট পাটকেলে, মরিচা-মলিন তাম্র শাসনে নিৰ্জ্জীব মুক বধিররূপে ভারতের সর্বত্র বিরাজমান; বৌদ্ধ ধর্ম যে মূর্ত্তিকা গর্ভে সমাহিত-তিনি আক্ষেপের সহিত তা প্রকাশ করলেন। পক্ষান্তরে, শ্যাম দেশে বৌদ্ধ ধর্মে প্রবল প্রতিপত্তি ও সুদুর প্রতিষ্ঠা, তা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করে কবি গুরু তাঁর হর্ষ বিষাদ পূর্ণ ভাবটুকু ব্যক্ত করতে গিয়ে সেদিন ছন্দোবদ্ধভাবে এরূপ নিবেদন করলেন।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্ন স্তুপে
বুদ্ধের বচনে-রুদ্ধ দীর্ণ-কীর্ণ মূক শিলারূপে
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধ-রি
বিস্ত্রিতির কুয়াশা
ভক্তির বিজয় স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সেই অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্ত্তিখানি,
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজ আমি তারে দেখি লব;
ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গন-সীমা।
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থ জলে করি যাব স্নান
তোমার জীবন ধারা স্রোতে
যে নদী এনেছে বহি ভারতের পূণ্য বর্গ হতে
যে যুগের গিরি শৃঙ্গ পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গল দিবা-কর।

এসব ভাবতে ভাবতে রাত্রি এগারটা বেজে গেল। তখন শয্যা গ্রহণের সময়। শয্যোপরি গিয়ে বার কতেক সব্ব সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা বলে দেহ খানি শয্যায় শায়িত করলাম।

উনিশ

অদ্য ১লা মে, বৃহস্পতিবার। সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করলাম এবং বন্দনার পর প্রাতঃরাশও গ্রহণ করলাম।

আজ উপোসথ দিবস। পূর্ণিমার চর্তুদ্দশী। চার দিক থেকে উপাসক উপসিকাগণ তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক উপোসথ দিবসের ধর্ম্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপন মানসে সকাল থেকেই দলে দলে বিহার সমবেত হচ্ছেন। আটটায় যখন বিরাট হল মন্দিরে বিহারবাসী সকল ভিক্ষু শ্রামন ও সমাগত উপাসক উপাসিকা বৃন্দ সমবেত বন্দনার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হলেন, তখন আমরাও তাঁদের সঙ্গে সমবেত বন্দনায় অংশ গ্রহণ করলাম। বন্দনার পর একই ভোজনালয়ে বসে এগারটায় সকলে মিলে তৃপ্তির সহিত আহার করলাম। সকাল থেকে এযাবৎ একজন এম,বি, বি, এস, ডাক্তারী ডিগ্রিধারী ভিক্ষুর সহিত কত প্রীতি আলাপ যে চলল তার সীমা সংখ্যা নেই। তথাপি সকাল থেকে অন্তরটা আমার একটা অব্যক্ত বেদনার চাপে ভারী হয়ে রলো। আজ শ্যাম দেশ ছেড়ে যাব। দেশে রওনা হওয়ার সময় যত নিকটবর্তী হয়ে আসছে, মনটা যেন তত অসীম ভাবনার অতল দেশে আঁকু পাঁকু খাচ্ছে। বস্তুতঃ ক্ষণেকের তরে মনের অবস্থা যাই হোক বিদেশের আনন্দ যত বিপুল হোক, তত সমৃদ্ধ হোক জীবনের মান, সমারোহ পূর্ণ মহোৎসবের অভিনন্দন, পুষ্পমাল্য গ্রহণ কিংবা রাজকীয় সম্বর্ধনা যা কিছু হোক না কেন দেশের যে একটা অনিবার্য্য টান, তার প্রভাবে অন্য সব শিথিল হয়ে যাব। বিদেশের সকল সৌন্দর্য্য, সকল চাকচিক্য, বিপুল জাঁক-জমক অন্তরে তখন মলিন হয়ে উঠে। আপন পূর্ণ কটিরটা তখন আপনার কাছে একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্র বলে মাতা শত নীচা হীনা হলেও যার জননী তার কাছে সাক্ষাৎ দেবতা।

এজন্য বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন ঃ

যত বড় হোক ইন্দ্র ধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা,
আমি ভালবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

বেলা দুটার সময় রাজফাতিকারাম থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে মহামান্য বিহারাধ্যক্ষ ব্রহ্মমুনি মহাথের স্বয়ং এবং বিহারবাসী সকল ভিক্ষু শ্রামন উপস্থিত থেকে আমাদিগকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। তখন বিদায়ী ও বিদায়কারী

উভয়ের মধ্যে একটা সকরুণ দৃশ্য ফুটে উঠল। মনের আবেগকে কোন রকমে সংযমিত করে আমরা গাড়ীতে চাপলাম। গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মৃদু স্বরে তথাগতের অনন্ত গুণাবলী স্মরণ পূর্বক 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা' বলতে আরম্ভ করলাম। আমাদের সঙ্গে চললেন আয়ুস্মাণ বসু মিত্র বিমান বন্দরে। দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে চললেন আয়ুস্মাণ বসু মিত্র বিমান বন্দরে। দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলাম। তথায় পাসপোর্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র প্রদর্শনের পর আমাদিগকে অর্ধ ঘন্টা কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। কি কারণে জানিনা বিমান ছাড়তে অর্ধ ঘন্টা দেরী হয়ে গেল। বিশ্রামাগারে বসে থাকতে থাকতে যখন কর্ণ-কুহরে বিমান ছাড়বার ঘোষণা এসে পৌঁছল, তখন আমি থাইল্যাণ্ডে পরিদৃষ্ট সমগ্র বিহার চৈত্য স্মৃতিপটে আনয়ন করে তথাগতের প্রতি সর্বশেষ আন্তরিক প্রণতি এবং থাইল্যাণ্ডের প্রতি অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাই বলে দুমিনিট কাল নীবর থাকি, অনন্তর বন্ধুবর বসুমিত্রকে প্রীতি সম্ভাষণ ও আলিঙ্গণ পূর্ব্বক তাঁর থেকে বিদায় নিলাম।

বিশ্রামাগার থেকে বাসে,বসে থেকে বিমানে আরোহন করার সঙ্গে সঙ্গে বিমান ভৈরব রবে আকাশতল ত্যাগ করে গগন মণ্ডলে উঠতে লাগল। হঠাৎ বিমানের গবাক্ষ পথে দৃষ্টি পড়তেই দেখি-বন্ধু বর বসু মিত্র রাতুল হস্ত গ্যালারীর উপর থেকে নড়ছে আর নড়ছে। এতে তার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে-"ভূলোনা আমায়, ভুলোনা আমায়।"

প্রায় তিন ঘন্টায় নয় শত চুয়ান্ন মাইল ব্যবধান অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বিমান রাত্রি সাড়ে সাতটায় এসে ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছল। আজ আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, কিছুক্ষণ পূর্বে ঢাকার বক্ষে প্রবল বারি বর্ষণ হয়ে গেছে। তাই দমকা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে।

আমাদিগকে অভ্যর্থনা করার জন্য বন্ধু-বর উঃ জানিতা মহাথেরো, প্রিয় ভাজন ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ ও কতিপয় শুভানুধ্যায়ী লোকজন বিমান বন্দর উপস্থিত হয়েছেন। আমরা গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় একটি প্রাচীন কবিতার ক্ষুদ্র স্তবকের অনুরূপ ভাবের ছন্দোবদ্ধ ভাষায় অন্তরে প্রতিঃধ্বনিত হতে লাগল-

মলয় দ্বীপ শ্যাম দেশ
ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত তীর্থ হেরিলাম
কিন্তু সর্ব তীর্থ সার-
তাই মা তোমার মাঝে
এসেছি আবার।

- সমাপ্ত -

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। কর্মতত্ত্ব
২। পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি (চ.বি. পালি বিভাগে পাঠ্য)
৩। মালয়েশিয়া ভ্রমণ
৪। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে
৫। বোধি চর্য্যাবতার (চ.বি. পালি বিভাগে আংশিক পাঠ্য)
৬। সাধনার অন্তরায়
৭। বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা
৮। সাম্য সৌম্যই শান্তির উৎস
৯। প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ (চ.বি. পালি বিভাগে পাঠ্য)
১০। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন
১১। ব্রহ্মবিহার
১২। চর্য্যাপদ (চ.বি. বাংলা বিভাগে পাঠ্য)
১৩। বুদ্ধের জীবন ও বাণী
১৪। গুরুদেব গুণালংকার মহাস্থবিরের জীবনী
১৫। রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি
১৬। বৌদ্ধ ধর্মের ক্রম বিকাশ ও পঞ্চ বুদ্ধ
১৭। ভক্তি-শতকম্
১৮। তত্ত্ব তথ্য নিবন্ধাবলী
১৯। পালি অভিধান (সম্পাদনা)

Ani Printing & Publication
Anderkilla, Ctg. 018-310615